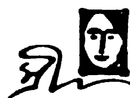
শব্দ-নৈঃশব্দের চিত্র

প্রিয়ম্বদা দেবীর নির্বাচিত রচনা

তথ্যপঞ্জী ও ভূমিকা সম্বলিত

ভূমিকা : সুমিতা চক্রবর্তী



স্ত্রী ॥ কলকাতা ৭০০ ০২৬



প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)
রবীন্দ্র ভবন, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

Shabda-Naishabder Chitra
(Selected Writings of Priyambada Devi), first published by Stree, 1996

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

শব্দগ্রন্থন
পেজমেকার্স
২৩/বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রণ
ওয়েব ইমপ্রেশন
৩৪/২ বিডন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রকাশক
স্ত্রী
মন্দিরা সেন
১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৬

প্রকাশকের কথা

প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রথম রচনা সংকলন, *শব্দ-নৈঃশব্দের চিত্র*, প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি। যাঁদের আন্তরিক প্রয়াস ছাড়া এই সংকলন প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতী অলকানন্দা গুহ'র নাম উল্লেখ করতে হয়। সংকলনের পরিকল্পনা এবং সম্পাদনায় সক্রিয় অবদানের জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

জাপানের হাইবনশা প্রকাশনা তাঁদের *Collected English Writings of Okakura Kakuzo, 3*-তে প্রকাশিত প্রিয়ম্বদা দেবীর পত্রাবলী এবং একটি নোটবই পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। বিশ্বভারতী রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ, শ্রী দিলীপ সিংহ, রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথ-প্রিয়ম্বদা দেবীর পত্রাবলী এই সংকলনের অন্তর্গত করবার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁকে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই অনুমতি পাবার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ, শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় আমাদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম। এছাড়া, বিশ্বভারতী রবীন্দ্র ভবনের কর্মী শ্রী দিলীপ হাজরা প্রিয়ম্বদা দেবীর মূল নোটবইটি এবং প্রিয়ম্বদাকে লেখা ওকাকুরা কাকুজোর পত্রাবলী দেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, এবং শ্রী গৌর সাহা প্রিয়ম্বদা দেবীর ছবি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। এঁদের আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রিয়ম্বদা দেবী সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী এবং অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী। অধ্যাপক চৌধুরী আমাদের কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমতী চক্রবর্তী এই সংকলনের ভূমিকাটি লিখে দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। শ্রীমতী গৌরী আইয়ুব এবং অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ এই সংকলনের জন্য তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের বাধিত করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সহায়তা ছাড়া এই সংকলন প্রস্তুত করা যেতো না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর শ্রীমতী পারমিতা গোস্বামী ও শ্রী শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রী সমররঞ্জন দে এবং যাদবপুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরির শ্রী অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নাম।

এছাড়া আরো নানাভাবে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অবদান *শব্দ-নৈঃশব্দের চিত্র* -এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। শ্রী শঙ্কর সেন, শ্রী ভাস্কর ঘোষ, শ্রী অমিতজ্যোতি সেন, শ্রী অমিতাভ চৌধুরী, শ্রীমতী চৈতালী মুখোপাধ্যায়, শ্রী হাবীবুর রহমান, শ্রী সমন্ত্যক দাস প্রমুখদের আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে বলতে হবে পেজমেকার্স-এর কর্মীদের কথা, যাঁরা শব্দগ্রন্থনের দায়িত্বে ছিলেন। অসাধারণ বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে তাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই *শব্দ-নৈঃশব্দের চিত্র* প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

আর একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, সম্পাদনার রীতি হিসেবে আমরা প্রিয়ম্বদা দেবীর ভাষা এবং বানান অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি।

জানুয়ারি ১৯৯৬

সূচি

প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

কবিতা

রেণু। প্রথম প্রকাশ : ১৯০০। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯১৫ [১৩২২ বঙ্গাব্দ]। পৃ. ৬৯।

তারা। প্রথম প্রকাশ : ১৯০৭। [আখ্যাপত্রে লেখিকার নাম ছিল না। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রসন্নময়ী দেবীর *তারাচরিত* নামক বইয়ে 'শোকাশ্রু'—এই পরিবর্তিত নামে পুনর্মুদ্রিত]। পৃ. ৩৪।

পত্রলেখা। প্রথম প্রকাশ : [১৯১১ ?]। পৃ. ১৫৮।

অংশু। প্রথম প্রকাশ : ১৯২৭ [শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ]। পৃ. ১২৫।

চম্পা ও পাটল। প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৯ [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত ভূমিকা সহ। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিচিত্র সংযোজিত]। পৃ. ৩৮।

অনুবাদ

ঝিলে জঙ্গলে শিকার। [কুমুদনাথ চৌধুরী-লিখিত *Sports in Jheels and Jungles*-এর বাংলা অনুবাদ]। প্রথম প্রকাশ : ১৯২৪। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৩৯। পৃ. ৯৮।

কিশোরপাঠ্য

অনাথ। প্রথম প্রকাশ : [১৯১৫]। দ্বিতীয় সংস্করণ : [১৯২০]। পৃ. ১৭৩।

কথা ও উপকথা। প্রথম প্রকাশ : [১৯২৩]। পৃ. ১৮০।

পঞ্চুলাল। প্রথম প্রকাশ : [১৯২৩]। পৃ. ৯৯।

ভূমিকা

প্রিয়ম্বদার কথা

জীবন : দহনে মধুরে দীপ্ত

'আজ যাঁর জীবনে অনেক সুখ, ভবিষ্যতে অনেক আশা তিনি তো জীবনের রাজা, কিন্তু যাঁর জীবনে একটি বৃহৎ সুখের স্মৃতি আছে তাঁকেও দরিদ্র বলা যায় না।' (কণিকা, *ভারতী,* পৌষ ১৩১২)।—জীবন সম্পর্কে এই উপলব্ধি যাঁর, তিনি আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামীকে হারিয়েছিলেন। তার এগারো বছর পরে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হারিয়েছিলেন একমাত্র সন্তান— বালক পুত্র তারাকুমারকে। তবু নিজের মনের বিশেষ ক্ষমতাবলে এই নারী জীবন থেকে আহরণ করে নিয়েছিলেন চরিতার্থতার স্বাদ। তিনি—প্রিয়ম্বদা দেবী—দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলা সাহিত্যের আসরে অতীব সক্ষম কিন্তু নম্র লেখনী হাতে নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথম চার দশকের কিছু বেশি সময় ব্যাপী ছিল তাঁর সাহিত্যিক উপস্থিতি। প্রধানত ছিলেন কবি ও শিশুদের জন্য রচিত কথাসাহিত্যের লেখক। এছাড়াও বিচিত্র ধরনের লিখনকর্মে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি দেখা যায়। তাঁর জীবনও ছিল এক সজল অথচ দ্যুতিমান বর্ণমালায় লেখা আখ্যান।

প্রিয়ম্বদার জন্ম হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে যশোরে। যদিও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত *বঙ্গের মহিলা কবি* (সংস্করণ ১৯৫৩) গ্রন্থে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান' প্রবন্ধে (*বিশ্বভারতী পত্রিকা,* বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) তাঁর জন্মস্থান 'গুনাইগাছা' বলে উল্লেখ করেছেন—এবং তারপর থেকে এই ভ্রান্ত তথ্যটিই প্রিয়ম্বদার যাবতীয় পরিচয়-পঞ্জীতে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই ভুলের কারণ ছিল এই যে, প্রিয়ম্বদার পিতা কৃষ্ণকুমার বাগচী ছিলেন গুণাইগাছার সম্পন্ন জমিদার ও কুলীন বংশের সন্তান। কিন্তু কলকাতা শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত, সুশিক্ষিত, মর্যাদাবান, নাগরিকতার আভিজাত্যমণ্ডিত চৌধুরী পরিবারের কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হলেও স্বামীগৃহ তথা শ্বশুরালয় গুণাইগাছাতে বাস করতেন না। প্রসন্নময়ীর পিতা, প্রিয়ম্বদার মাতামহ দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি প্রশাসন-কর্মী। প্রসন্নময়ী পিতার সঙ্গেই তাঁর বিভিন্ন কর্মস্থলে ঘুরে বেড়াতেন। বিবাহের পরেও তার অন্যথা ঘটেনি। দুর্গাদাস যখন যশোরে ডেপুটির পদে ছিলেন তখন সেখানেই প্রিয়ম্বদার

জন্ম হয়েছিল—একথা প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর আত্মস্মৃতি *পূর্ব্বকথা*-তে স্পষ্টই লিখে গেছেন। 'পিতৃদেব যশোহর বদলী হইয়া যান ও সেইখানে এই তিনজনের এবং প্রিয়রও জন্ম হইয়াছিল।' (সংস্করণ ১৯১৭, পৃ ৭২)। 'এই তিনজন' হলেন দুর্গাদাসের সর্বশেষ তিন সন্তান সুহৃদনাথ, অমিয়নাথ ও মৃণালিনী।

প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতুল পরিবারে ছিল বিদ্যা ও বুদ্ধিচর্চার পরিশীলিত ঐতিহ্য। মাতামহ দুর্গাদাস চৌধুরী ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও মুক্তমন। ছেলেদের বিলেতে পাঠিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, সমাজে প্রায়শ্চিত্তের দাবি উঠলে তা অগ্রাহ্য করেছিলেন জোরের সঙ্গে। প্রসন্নময়ীর লেখা থেকে একটি সুন্দর তথ্য জানা যায়—'পিতৃদেব ছুতার মিস্ত্রী দ্বারা বার স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ খোদিত করিয়া অক্ষর পরিচয় করাইয়াছিলেন।' (*পূর্ব্বকথা*, ১৯১৭, পৃ. ৪৪)। আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে যে-পিতা এই পদ্ধতিতে সন্তানদের বর্ণ-পরিচয় করান—তাঁর সন্তানদের রক্তে থাকবে বিদ্যানুরাগ—বলা বাহুল্য। প্রিয়ম্বদার মানসে মিলিত হয়েছিল দুই প্রজন্মের মনন-সমৃদ্ধি। তাঁর মা প্রসন্নময়ী ছিলেন তৎকালে প্রতিষ্ঠিত কবি। বড়মামা আশুতোষ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার হওয়া ছাড়াও ছিলেন কলকাতার সারস্বত সমাজের ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব ; রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, বিবাহসূত্রে ঠাকুর-পরিবারের নিকটাত্মীয়। তাঁর ছোটভাই প্রমথ চৌধুরীর আসন বাংলা সাহিত্যে স্থায়িত্ব পেয়েছে। বিখ্যাত *সবুজপত্র* পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন তিনি। তাঁদের আরো দুই ভাই যোগেশচন্দ্র ও কুমুদনাথ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করবার পরেও কিছু-না-কিছু লেখা ও সম্পাদনার কাজ করেছেন। ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন প্রিয়ম্বদা। সাহিত্যচর্চার প্রেরণা তাঁর প্রায় সহজাত ছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু ১৩০২ বঙ্গাব্দে *মুকুল* পত্রিকা প্রকাশিত হবার আগে তাঁর মুদ্রিত রচনা দুটি— 'ফুল' (*বামাবোধিনী*, আশ্বিন ১২৯২) আর 'গান' (*ভারতী ও বালক*, কার্ত্তিক ১২৯৩)। দুটিই বিশেষভাবে 'বালিকার রচনা' বলে উল্লেখিত ছিল। তাঁর বয়স তখন চোদ্দ ও পনেরো।

প্রিয়ম্বদা লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। একেবারে ছোট বয়সে কৃষ্ণনগরে কিছুকাল পড়বার পর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে এগারো বছর বয়সে কলকাতায় বেথুন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেন। ১৮৯২ সালে তাঁর বিবাহ হয় আইনজীবী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তারাদাস ছিলেন প্রসন্নময়ীর ছোট বোন মৃণালিনীর স্বামী, ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ। প্রিয়ম্বদার স্বামীগৃহ ছিল মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে। সেখানে, বিবাহের তিন বছর পরেই ১৮৯৫ সালে ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয় তারাদাসের। এক বছরের শিশুপুত্র তারাকুমারকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন প্রিয়ম্বদা। শোকার্ত জীবনের অবলম্বন রূপেই তিনি এরপর লিখতে শুরু করেন। দুটি ধারায় প্রধানত উৎসারিত হয়েছিল তাঁর সাহিত্য— প্রথমত, কবিতা। সেই কবিতা কখনো বিষাদকরুণ, কখনো ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের, কখনো যে-কোনো সূক্ষ্ম উপলব্ধিময় এবং অনেকগুলিই রোমান্টিক প্রেমের। দ্বিতীয়ত—ছোটদের

জন্য লেখা। বালকমনের উপযোগী বহু গদ্য ও কবিতা তিনি রেখে গেছেন যার সমুচ্চ মান এবং বিশিষ্টতা কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। অন্যান্য ধরনের লেখাও তিনি লিখেছেন, সেগুলিও যথেষ্ট আকর্ষক।

বহুবিধ সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন প্রিয়ম্বদা, মেলামেশা করেছেন বহু মানুষের সঙ্গে। সেই যুগের শিক্ষিত, অভিজাত সমাজেরই একজন ছিলেন তিনি। সমকালীন মনীষী ও বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য পেয়েছেন সহজেই। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নিজস্ব সুখের সংসার গড়ে উঠতে পারেনি কোনোদিন। পুত্র তারাকুমারকে পড়তে পাঠানো হয়েছিল কাশীর সেনট্রাল স্কুলে। সেখানে বারো বছর বয়সে কলেরায় তার মৃত্যু হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। তার শেষ শয্যায় প্রিয়ম্বদা গিয়ে পৌঁছতেও পারেননি। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ। প্রিয়ম্বদা জীবিত ছিলেন তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত। ১৯৩৫ সালে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। রেখে যান এক স্মরণযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাহিত্য-সম্ভার। সেই সঙ্গেই তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বও আমরা ভুলতে পারি না। শোক-সংবৃত, আত্মস্থ, শান্ত মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করে নেওয়া এই নারী আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

জগৎ জুড়িয়া কত কাজ আছে

একমাত্র সন্তান তারাকুমারের মৃত্যু হল। নিজেকে সেই শোকে গৃহবন্ধ রাখলেন না প্রিয়ম্বদা। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে ও সভাসমিতিতে যোগ দিতেন তিনি। তখন সরলা দেবী চৌধুরাণী বিভিন্ন সামাজিক ও স্বাদেশিক কাজকর্মের জন্য বিখ্যাত, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও তাঁর রূপ, বিদ্যা, সঙ্গীত-প্রতিভা ও সাহিত্য-প্রতিভার কারণে যথেষ্ট পরিচিত। তাঁদের মতো ততটা পরিচিতি ঠিক সেই সময়েই ছিল না প্রিয়ম্বদার। কিন্তু কর্মদক্ষতায় ও কর্তব্য সম্পাদনে তিনি খুবই পারঙ্গম ছিলেন। লোকহিতকর কাজের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তাঁর। যখনই কোনো কাজের ভার নিয়েছেন, বিনা কোলাহলে, সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী মেয়েদের মানসিক চর্যা ও কিছুটা আর্থিক স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে সখিসমিতি স্থাপন করেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা দুজনেই তার সদস্য ছিলেন। ১৯০৬ সালে স্বর্ণকুমারীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা করলেন বিধবা শিল্পাশ্রম, পরে যার নাম হয় মহিলা শিল্পাশ্রম। সেখানেও নিজেকে কিছুটা নিযুক্ত রাখতেন প্রিয়ম্বদা। ১৯১০-এ ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল স্থাপনকল্পে সরলা দেবী এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের অধিবেশনে ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন। *ভারতী* পত্রিকার চৈত্র ১৩১৭ সংখ্যায় তার প্রিয়ম্বদা-কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে প্রিয়ম্বদা যুক্ত ছিলেন জন্মলগ্ন থেকেই। একটা সময়ে একা হাতে মহিলা শিল্পাশ্রম ও ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের মতো দুটি কর্মকেন্দ্র পরিচালনা করেছেন

তিনি। *মাতৃমন্দির*, আষাঢ় ১৩৩০ সংখ্যায় একটি ঘোষণা ছিল, 'মহিলা শিল্পাশ্রম, ৫৫ নং গরিয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন মহিলা শিল্পাশ্রমের সমস্ত ভার শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর হাতে দিয়া তাঁহাকে যুক্ত সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইল। ১লা আষাঢ় হইতে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী গ্রীষ্মাবকাশের পর নব উদ্যোগে মহিলা শিল্পাশ্রমের সংলগ্ন বিধবাশ্রম ও ছাত্রীনিবাস খুলিতেছেন।' ঘোষণাটিতে যোগাযোগের ঠিকানা দেওয়া আছে "তারাবাস, ৪৬নং ঝাউতলা রোড, পোঃ আঃ বালীগঞ্জ, কলিকাতা।" এই বাড়িতেই বাস করতেন প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা।

একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ আছে *মাতৃমন্দির*, মাঘ ১৩৩৩ সংখ্যায় 'নানাকথা' বিভাগে। —'গত ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে বর্তমানের উপযোগী স্ত্রীশিক্ষার ধারা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মহিলাদের একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল।' সেই সভায় সভানেত্রী ছিলেন 'ময়ূরভঞ্জের মহারাণী কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবী', উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ। —'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী সরলাদেবী, শ্রীমতী লতিকা রায় পুণার মহিলা সভায় বাংলার পক্ষের প্রতিনিধিরূপে গমন প্রস্তাব হয়।' —এই প্রস্তাব কার্যকর হয়েছিল কিনা তার সন্ধান করে উঠতে পারিনি। প্রিয়ম্বদার যে কয়েকটি জীবন-পঞ্জী পাওয়া যায় তাতে উক্ত উদ্দেশ্যে পুনা যাবার কোনো উল্লেখ নেই। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার চৈত্র, ১৩৪১ সংখ্যায় 'সাময়িকী' বিভাগে প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যুতে যে শোক-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেখান থেকে জানা যায় আরো একটি তথ্য যা অন্যত্র কোথাও দেখিনি। সেরপুরের (ময়মনসিংহ) পরহিতব্রতী জমিদার গোপালদাস চৌধুরী অনাথা বিধবাদের জন্য নিজের পিতার নামে *গোবিন্দকুমার হোম* প্রতিষ্ঠা করলে প্রিয়ম্বদা সেই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মেও প্রভূত সহায়তা দান করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়ম্বদা কিছুদিন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছিলেন।

প্রসন্নময়ী-প্রিয়ম্বদার গৃহে তাঁদের উভয়েরই পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের বহু ছাত্র প্রতিপালিত হত, নানা কারণে আশ্রয় পেতেন অনেকেই।

চৌধুরী-পরিবারে দেশপ্রীতির একটি ঐতিহ্য ছিল। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সরাসরি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিবিধ কর্ম-প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন পরিচালনা করতেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সরসী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। আশুতোষ চৌধুরী গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন বলে শোনা যায়। তাঁর সানি পার্ক-এর বাড়িতে ১৯১৮/১৯ সাল নাগাদ একবার দেশাত্মবোধক যাত্রাগান করতে আসেন চারণকবি মুকুন্দদাস। তাঁর দেশানুরাগ ও গান আকৃষ্ট করেছিল প্রিয়ম্বদাকে। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বয়সে সাত বছরের ছোট মুকুন্দদাস প্রিয়ম্বদাকে মাতৃসম্বোধন করতেন। মুকুন্দদাসের পত্নীবিয়োগ হয় অকালে। আর, মুকুন্দদাসকে যখন তখন কারারুদ্ধ করতেন ব্রিটিশ শাসকেরা। তাঁর কিশোরী কন্যা সুলভা এমতাবস্থায়

কোথায় থাকবে তা নিয়ে বিব্রত ছিলেন মুকুন্দদাস। এই সময়ে প্রিয়ম্বদা আশ্রয় দিয়েছিলেন সুলভাকে। এই কাজটি ব্রিটিশ শাসকের কাছে প্রীতিকর ছিল না। কিন্তু প্রিয়ম্বদা ভয় করেননি। এইভাবেই নিজের জীবনকে বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন প্রিয়ম্বদা। নিজের শোককে একান্ত ও প্রধান করে তুলে সমাজ ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি।

দিয়েছো সুখ দিয়েছো দুখ

জীবনের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিগত বৃত্তটুকুতে প্রিয়ম্বদা দেবী ছিলেন অনেকখানি একা তা আমরা আগে দেখেছি। স্বামী ও সন্তানের মৃত্যু ঘটেছিল শোচনীয়ভাবে। সেই নিঃসঙ্গতা বিদূরিত হবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু নিজেকে তিনি একাকিত্বে আবদ্ধ রাখেননি— তা-ও আমরা দেখতে পাই। স্বামীর পরিবারের সঙ্গে খুব নিকট কোনো সম্পর্ক ছিল না তাঁর, পিত্রালয়ের স্থানও তাঁর জীবনে ছিল অ-প্রশস্ত। জন্মাবধি তাঁর জীবন কেটেছিল মাতুল-পরিবারে। মাতামহ দুর্গাদাস চৌধুরী ও পরে তাঁর মামাদের স্নেহচ্ছায়াতেই কলকাতায় বাস করেছিলেন তিনি। চৌধুরী-পরিবারের অনেকেই কলকাতার সমাজে সসম্মান প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন। আশুতোষ, যোগেশচন্দ্র, কুমুদনাথ, প্রমথ চৌধুরী— প্রত্যেকেই সুখ্যাত ছিলেন নিজের পরিচয়ে। এই পরিবারে প্রিয়ম্বদার স্নেহ-পরিচর্যা, নিরাপত্তা, সু-শিক্ষা ও সম্মানের কোনো অভাব কখনো ঘটেনি। সেই সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের নিকট সান্নিধ্য— স্বর্ণকুমারী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী সহ ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য কন্যা ও বধূরা ছিলেন প্রিয়ম্বদার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তৎকালীন নগর-কলকাতার সমাজে সম্মানে ও মর্যাদায় ভূষিত অপরাপর মহিলাদের সঙ্গেও ছিল তাঁর মেলামেশা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্রের দুই কন্যা সুনীতি ও সুচারু দেবী-- উভয়েই ছিলেন রাজা উপাধিধারী পরিবারের বধূ ; জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডি অবলা বসু ; রামানন্দ-কন্যা, সুলেখিকা সীতা দেবী ও শান্তা দেবী— এবং আরো অনেকেই। কাজেই সামাজিক নিঃসঙ্গতা প্রিয়ম্বদার ছিল না-ই বলা যায়।

মেলামেশার এই সাধারণ বৃত্তটি ছাড়িয়েও কিন্তু প্রিয়ম্বদা তাঁর বিদ্যা ও ব্যক্তিত্বগুণে সেই সময়ের একাধিক বিশিষ্ট প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে স্বতন্ত্র মানস-সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। নারী-পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের অবকাশ সেই যুগের সমাজে খুব সুলভ ছিল না। এই ধরনের সম্পর্ক কেউ ইচ্ছা করলেই স্থাপন করতেও পারে না। দুটি মানুষের পরিশীলিত ও সংবেদনশীল মনের সাযুজ্যে আপনা থেকেই এই মানস-সম্পর্ক ঠিক তারে বাঁধা হয়ে যায় এবং জীবনকে তা সমৃদ্ধ করে।

প্রিয়ম্বদার বন্ধুদের মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয়। কৃষ্ণনগরে দুর্গাদাস চৌধুরীর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম এসেছিলেন ১৮৮৬-তে। তখনই প্রিয়ম্বদা তাঁকে প্রথম দেখেন। ঐ বছরই আশুতোষের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভার বিবাহ।

ক্রমশ গাঢ়তর হল দুই পরিবারের যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথকে পরমশ্রদ্ধেয় গুরুজনের মতোই প্রিয়ম্বদা জেনেছিলেন সারাজীবন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে তাঁকে লিখেছিলেন, 'এ শুধু নিজের, নিজের পরিবারের, দেশের গৌরব নয়, এ যে সমগ্র আসিয়া মহাদেশের গৌরব। বিশ্বের সভায় বঙ্গ সাহিত্যের অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে।' রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়ম্বদার মধ্যে পত্রালাপ ছিল। তারাকুমারের মৃত্যুর পর কয়েকটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছেন ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। যে ভাষায় তিনি অনেককেই মৃত্যুশোকের সান্ত্বনা দিতেন তা ছাড়াও প্রিয়ম্বদাকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে একটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সুর লক্ষ করা যায়। 'আমার অনেকবার মনে হয়েছে প্রিয় বড় দুর্বলভাবে লালিত হয়ে এসেছে, সে কি নিজেকে মঙ্গলের উপরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে? আর তা যদি না পারে তা হলে ত কেবলি দুঃখ হতে দুঃখে দুর্ভিক্ষ হতে দুর্ভিক্ষেই সে যাত্রা করবে।' (২০ ফাল্গুন, ১৩১৪-এ লেখা চিঠি)। আর একটি পত্রে লিখেছেন, 'তুমি কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবনকে গড়ে তোলনি, এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে না পারলে ঈশ্বরের প্রেমের মধ্যে তোমার জীবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য হবে না।' (৩০ ফাল্গুন, ১৩১৪-এ লেখা চিঠি)। কিছুদিন পরের লেখা আর একটি চিঠি, '....তুমি যেন মাকড়ষার তন্তুর মত অতিসূক্ষ্ম বাধার জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে আছ তাই আপনার মধ্যে বেষ্টিত হয়ে আপনাকে ভুলতে পারচ না।' (২৫ ফাল্গুন, ১৩১৮)। প্রতিটি চিঠিতেই প্রিয়ম্বদার ঈষৎ আবৃত স্বভাব ও অন্তর্মুখিনতার ইঙ্গিত আছে। দুর্বল স্নেহভাজনকে নির্দেশ দেবার সুরে চিঠিগুলি লেখা। প্রিয়ম্বদা যে ধীরে ধীরে লেখা ও কাজের জগতে আত্ম-উন্মোচন করেছিলেন হয়তো তার কিছু শক্তি জুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রিয়ম্বদার লেখা নানা জায়গায় প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। ১৩১৮ সালের ২রা বৈশাখ লেখা চিঠিতে জানা যায় যে, প্রিয়ম্বদার একটি কবিতা তিনি *তত্ত্ববোধিনী*-তে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। আরো নানা সময়ে তিনি প্রিয়ম্বদার কবিতার সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, ভূমিকা লিখে দিয়েছেন প্রিয়ম্বদার *চম্পা ও পাটল* কাব্যগ্রন্থটির। প্রিয়ম্বদাও রবীন্দ্রনাথের *চৈতালি* কবিতাগ্রন্থের সপ্রশংস সমালোচনা লিখেছেন (*বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ* ১৩৩৯) এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছেন অন্তত পাঁচটি কবিতা।

দ্বিতীয় যে মহৎ প্রতিভার সংযোগ ঘটেছিল প্রিয়ম্বদার জীবনে তিনি ওকাকুরা কাকুজো। জাপানের এই প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী ছিলেন জাপানের জাতীয় জীবনে নবচেতনার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তাঁর জীবন ও মননের কেন্দ্রীয় বিন্দু ছিল প্রাচ্যভূমির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও উদ্বেলিত প্রীতি। ভারতীয় তরুণদের স্বদেশচেতনার উন্মেষলগ্নটি মহাকালের পটে ফুটে উঠেছিল যাঁদের স্পর্শে তাঁদের অন্যতম একজন ছিলেন ওকাকুরাও। তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, নিবেদিতার সঙ্গে। ওকাকুরা ও ভারতবর্ষ একটি পৃথক প্রবন্ধের বিষয়। কিন্তু এই প্রখর মনীষা ও ধী-সম্পন্ন মানুষটি ছিলেন অন্তরে নিঃসঙ্গ— সব প্রতিভাবান মানুষই যেমন নিজের সংসারে কিছুটা একা;

তার উপর তিনি ছিলেন গভীরভাবে আবেগপ্রবণ। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন দ্বিতীয় ভারতবর্ষে আসেন (প্রথমবার আসেন ১৯০১-এ) তখন তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। হয়তো তখনই চিত্তগভীরে শুনেছিলেন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি (মৃত্যু : ২ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩)। 'His brow was there, his smile was there but there was also an impalpable difference, as of some shadow fallen over him.' —লিখেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (*Visvabharati Quarterly*. Vol. ii, August 1936)। সেই ওকাকুরা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর চৌধুরীগৃহে এক নৈশভোজে প্রিয়ম্বদাকে প্রথম দেখেছিলেন। শান্ত ও বিষণ্ণ, কোমল ও মৃদুভাষিণী, স্বামীপুত্রহীনা নিঃসঙ্গ প্রিয়ম্বদাকে ওকাকুরার একটি সূক্ষ্মরেখ ও বিরলবর্ণ জাপানী ছবির মতোই মনে হয়েছিল। শোনা যায়, 'শ্বেতকমল' নামে তাঁর একটি ছবিও এঁকেছিলেন তিনি। সম্ভবত ছবিটি এখন জাপানে। ওকাকুরা ও প্রিয়ম্বদার মধ্যে নিয়মিত পত্রালাপ ছিল। *Visvabharati Quarterly*. Autumn, 1955 সংখ্যায় 'Letters to a Friend' নামে প্রিয়ম্বদাকে লেখা ওকাকুরার পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত। ১২ অক্টোবর, ১৯১২ থেকে ২১ অগাস্ট, ১৯১৩ পর্যন্ত নিয়মিত লেখা এই চিঠিগুলি থেকে অনুভব করা যায় প্রিয়ম্বদার প্রতি ওকাকুরার নিবিড় প্রীতিনিষিক্ত, স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গতার মনোভাব। তাঁদের দুজনেরই ছিল রোমান্টিক কবিহৃদয়, দুজনেরই মন সাড়া দিত মৃদুতম আবেগকম্পনে। প্রিয়ম্বদাও চিঠি লিখতেন ওকাকুরাকে। পরস্পরকে তাঁরা জানিয়েছেন তাঁদের জীবনযাপনের প্রাত্যহিক ব্যস্ততার কথা, সুখ-দুঃখ-অসুস্থতার কথা, শ্রান্তি ও স্বপ্নের কথাও। পরস্পরকে কবিতা লিখে পাঠাতেন তাঁরা। প্রিয়ম্বদার কবিতা অনুবাদ করে স্বরচিত গীতিপালায় ব্যবহার করেছেন ওকাকুরা। ওকাকুরা ও প্রিয়ম্বদার পত্রালাপের সামান্য পরিচয় থেকেই বোঝা যাবে তাঁদের চিঠিগুলির সাহিত্যসুরভি, প্রগাঢ় আন্তরিকতা। প্রীতিনিবিড় সম্পর্কের মধুর শোভন ভাষারূপ সেইসব পত্রে।

ওকাকুরার চিঠি— 'Please do not tell me that you are not the Jade-tree, I had hoped to have found the tree at last. Is it not there, half revealed in the glooming mist, enthroned in the immaculate snow of the Himalayas; bearing a prophecy of the eternal spring. If I am not allowed to pluck a petal, may I not bathe in its fragrance from a distance? Don't tell me you are not the Jade-tree.' (4th March, 1913-এ লেখা চিঠি)। ওকাকুরার চিঠিগুলিতে প্রিয়ম্বদার প্রতি আবেগনিষিক্ত এবং প্রায় প্রণয়-সম্ভাষণের সুর শোনা যায়। তার তুলনায় প্রিয়ম্বদার চিঠিগুলি অনেক বেশি আত্মস্থ এবং নিজেকে পুরোমাত্রায় নিয়ন্ত্রণে রেখে তিনি ওকাকুরার চিঠির উত্তর দিয়েছেন। অকারণ কোনো সংকোচ তাঁর চিঠিতে অনুভূত হয় না। কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভাবের চিহ্নমাত্র নেই। ওকাকুরাকে ঠিক যতটা কাছে আসতে দেবেন বলে তিনি মনে করেছেন ঠিক ততটাই নিজেকে তিনি উন্মোচিত করেছেন পত্রে। এতখানি আত্মবিশ্বাসী আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যে-কোনো যুগের নারীর কাছেই ইপ্সিত মনে হতে পারে।

'Please do not think of me as an impossible perfection– I am nothing of the kind. I am only a human being, with very disenchanting limitations, if I have some good qualities, I have very many faults too. I hardly have any claims to reverence. Don't please say that you approach me with reverence. It makes me feel so ashamed. I am only a woman, a human being, and that I think is dignity enough, don't you agree with me?

When I was in Mirga Pore I felt that you were compelling my thoughts in some mysterious way and as I then did not want it to be so, I wrote this poem.

> "Unknown stranger, why dost thou send
> unceasing thoughts, innumerable, like a
> swarm of rushing bees? seeking for the
> honey of lotus heart? The soft flower
> has long been enclosed in a crystal case.
> The initiated know that there lives not
> a hope for a drop of honey. Honey
> tempted delicate messengers, go back
> one and all go back home. Do clever
> diplomats ever waste life on a futile
> embassy?"

Comparing dates I find now, that it corresponds with the day you wrote your Jade tree poem. So you see, my belief in telepathy is not all wrong.' (4th June 1913-এ লেখা চিঠি)।

ওকাকুরা ও প্রিয়ম্বদার সম্পর্কের মাধুর্যটি আমরা ভুলতে পারি না। তাঁদের উভয়েরই নিঃসঙ্গতা অনেকখানি ভরে উঠেছিল পারস্পরিক মনোসান্নিধ্যে। ওকাকুরার বন্ধুত্ব নিঃসন্দেহেই প্রিয়ম্বদার জীবনের একটি প্রাপ্তি যা তিনি কখনো গোপন করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। জাপানের জীবন, সংস্কৃতি, লোক-ঐতিহ্য ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। ওকাকুরার কবিতার অনুবাদও তিনি করেছেন। *প্রবাসী*, কার্ত্তিক ১৩২৩-এ ওকাকুরা-র তিনটি ছোট কবিতার প্রিয়ম্বদাকৃত অনুবাদ আছে— 'কল্পতরু', 'কমল' ও 'অন্তিম ইচ্ছা'। *প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩২৮-এ আছে আর একটি অনুবাদ— 'অচিন পাখি'।

কিন্তু সমাজের কাছ থেকে প্রিয়ম্বদা সবসময়েই আনুকূল্য পাননি : বৈধব্য তাঁকে ও তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের

তাতে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। তার উপর তাঁরা নানা সামাজিক কাজ ও সাহিত্যরচনা উপলক্ষে বহু পুরুষের সঙ্গেও মেলামেশা করতেন। প্রসন্নময়ীকে লক্ষ করে বহু ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখা হয়েছিল। তার মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর *মডেল ভগিনী* (১ম-৪র্থ খণ্ড, ১৮৮৬-৮৮) বাংলা সাহিত্যে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রচন্দ্র *কৌতুক-কণা* নামে আর একটি হাস্যরসাত্মক নকশা-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে 'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা' নামে একটি রচনা আছে। প্রিয়ম্বদা নামে এক বিদেশী শিক্ষা ও আচারে অভ্যস্ত ডেপুটি-কন্যার এগারো বছরে বিবাহ হয়েছিল গ্রামে। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি তার পছন্দ হয়নি—এই ঘটনাটিই নকশাটিতে বিবৃত। প্রিয়ম্বদার জীবনের সঙ্গে এই কাহিনী মেলে না, মেলে প্রসন্নময়ীর সঙ্গেই। তবু তিনি নকশাটির নাম 'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা' রাখলেন কেন? অনুমান করি—প্রিয়ম্বদার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে আপত্তিকর কিছু তিনি খুঁজে পাননি অথচ এঁদের বিরুদ্ধে তাঁর বিরাগ ছিল দৃঢ়মূল। তাই বিষয় হিসেবে প্রসন্নময়ীর জীবন গ্রহণ করলেও প্রিয়ম্বদার নামটি ব্যবহার করে যোগেন্দ্রচন্দ্র কলকাতার পাঠকদের চোখ প্রিয়ম্বদার উপরও ফেলতে চেয়েছিলেন। কৌতুকরচনাটির ভাষা ও পরিকল্পনা আজকের সাহিত্য-পাঠকদের কাছে ঠিক কৌতুকজনক মনে হওয়া শক্ত, তার উপর প্রসন্নময়ীর আচরণের জন্য প্রিয়ম্বদাকে আঘাত করার মতো অরুচিকর কাজ যোগেন্দ্রচন্দ্র করেছিলেন। এ-ধরনের মনোভাবের মুখোমুখি নিশ্চয়ই প্রিয়ম্বদাকে জীবনে অনেকবারই হতে হয়েছে।

এইসব বিরোধের তুচ্ছতা কিন্তু প্রিয়ম্বদার মনের স্থৈর্য কোনোসময়েই বিঘ্নিত করতে পারেনি। সম্ভবত এই মনের জোরের অনেকখানি তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবীর কাছ থেকে।

প্রিয়ম্বদার জীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তি-সান্নিধ্যের প্রসঙ্গে তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবীর কথাও আমাদের প্রধানভাবেই মনে পড়ে।

প্রসন্নময়ীর জীবন ছিল প্রিয়ম্বদার চেয়ে আরো একটু বেশি দ্বন্দ্বময়। প্রিয়ম্বদার জীবনে শোকের আঘাত ছিল, কিন্তু প্রসন্নময়ীর ছিল পরিস্থিতিকে নিজের অভিলষিত পথে চালিত করবার শক্তি। দুর্গাদাস চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী (জন্ম ১৮৫৪) সেকালের পক্ষে অতীব সুশিক্ষিত ছিলেন। পিতা ও ভাইদের কাছে ভালো বাংলা ও মেম-শিক্ষয়িত্রীর কাছে শিখেছিলেন ইংরেজি। কৃষ্ণনগর ও কলকাতার নাগরিক পরিবেশে, সাহিত্যচর্চার পরিমণ্ডলে কাটিয়েছেন বাল্য ও কৈশোর। চৌধুরী-পরিবারে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত ছিল বলে মাত্র দশ বৎসর বয়সে গুণাইগাছা গ্রামের কুলীন পরিবারে কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু গ্রামীণ আচার আচরণের শ্বশুরবাড়িতে তিনি থাকতে পারেননি। উচ্চপদস্থ ও স্নেহশীল পিতা দুর্গাদাসও কন্যাকে স্বগৃহে রাখতে দ্বিধা করেননি। কুলীন কন্যার পিতৃগৃহে বসবাস কোনো নতুন ব্যাপার ছিল না। একমাত্র কন্যা প্রিয়ম্বদাকে নিয়ে প্রসন্নময়ী যথেষ্ট মর্যাদা ও কর্তৃত্বের সঙ্গেই বাস করতেন কলকাতায়। পিতার মৃত্যুর পরও তাঁকে ভাইদের আশ্রয় নিতে হয়নি। জমিদারির আয়

থেকে কন্যা ও দৌহিত্রীর সংস্থান করে গিয়েছিলেন দুর্গাদাস নিজেই।

বলা বাহুল্য যে প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা—মাতা ও কন্যা পরস্পরের খুবই কাছাকাছি ছিলেন কারণ দুজনেই ছিলেন স্বামীহীনা। একমাত্র সন্তান হারাবার পর জননীই ছিলেন প্রিয়ম্বদার নিকটতম স্বজন। প্রিয়ম্বদা ছাড়া আর কোনো সন্তান ছিল না প্রসন্নময়ীর।

কিন্তু প্রসন্নময়ী বা প্রিয়ম্বদা কারো সম্পর্কেই 'অসহায়া বিধবা'-র সমাজ প্রচলিত ধারণাটি খাটে না। স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিলেন প্রসন্নময়ী স্বেচ্ছায়। সুশিক্ষিতা বলে সমকালের বিদ্বৎ-সমাজে স্বর্ণকুমারীর সঙ্গেই ছিল তাঁরও প্রতিষ্ঠা। ষোল বছর বয়সে প্রথম কবিতাগ্রন্থ *আধ আধ ভাষিণী* (১৮৭০) পিতার আনুকূল্যে প্রকাশিত হবার পর তিনি *বনলতা* (১৮৮০) ও *নীহারিকা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮৩, ১৮৯৭) নামে কবিতা সংকলন, *পূর্ব্বকথা* (১৯১৭) নামে আত্মস্মৃতি, *আর্য্যাবর্ত্ত* (১৮৮৮) নামের ভ্রমণকথা এবং *অশোকা* (১৮৯০) নামের একটি উপন্যাস রেখে গেছেন। এছাড়াও গ্রন্থবদ্ধ হয়নি এমন বহু কবিতা, বেশ কিছু প্রবন্ধ, স্মৃতিমূলক ও ভ্রমণমূলক আরো কয়েকটি রচনা, অন্তত একটি খুবই স্বতন্ত্র ধরনের গল্প ('মাতাজি', *মানসী*, মাঘ, ১৩২১) এবং কিছু ছোটদের কবিতা ও গল্প বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁর। সমকালে তিনি লেখিকারূপে সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন।

এমন একটি হিন্দু পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন যাঁদের গৃহদেবতা শ্যামরায়, কৌলীন্যপ্রথা যেখানে প্রচলিত অথচ যাঁরা হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা মেনে চলতেন না। হিন্দুসমাজের স্বয়ংনিযুক্ত শাসকেরা তাঁদের আঘাত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু জ্ঞানে-গুণে-বিদ্যায়-সম্পত্তিতে সমুজ্জ্বল চৌধুরী-পরিবারের সদস্যরা তাতে বিচলিত হননি এতটুকু। পরিবারে কারো কারো মধ্যে বেশ সাহেবিয়ানাও ছিল।

প্রসন্নময়ী এইসব নীচমনা সমালোচনাকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বেশ কর্তৃত্বপরায়ণতা এবং ঈষৎ অহংকারমিশ্রিত একটি দাপট ছিল। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছোটভাইরা বড়দিদিকে মান্য করতেন যথেষ্ট। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *চলমান জীবন* গ্রন্থে প্রসন্নময়ীর একটি চরিত্র রূপরেখা দিয়েছেন। চৌধুরী-পরিবারে ছিল মাঝে মাঝে পারিবারিক সম্মেলনের রীতি। পাশ্চাত্য দিনপঞ্জি অনুসারে প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে আশুতোষ চৌধুরীর গৃহে সকলে মিলিত হতেন। সেখানে প্রসন্নময়ীর স্থান ছিল সকলের উপরে।

'সবার উপরে ত আছেন পিসিমা, সব কটা বাঘা বাঘা সাহেব ভাই যেভাবে তাঁর পায়ে মাথা কুটতে থাকবে, দেখলে মনে হবে এই দিদি-পূজাই হল মূল উৎসব। আর তিনিই ত চালাবেন সবার উপর কর্তৃত্ব,' (প্রথম পর্ব, ১৩৫৯, পৃ. ১৬৮)।

প্রসন্নময়ী দেবীর চরিত্রের এই সবলতা ও ব্যক্তিত্বের জোর পিতৃগৃহবঞ্চিত, স্বামীহীনা প্রিয়ম্বদাকে নিরাশ্রয় বা অসহায় বোধ করতে দেয়নি। প্রিয়ম্বদার মধ্যেও আমরা যে সহজ আত্মনির্ভরতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকাশ দেখি তা অনেকখানিই গড়ে উঠেছিল মায়ের সংস্পর্শে। প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয়েছিল বালিকা বয়সে, কুলীন পাত্রের সঙ্গে।

প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয় বি. এ. পাস করবার পর একুশ বছর বয়সে। তাঁর স্বামী তারাদাস, প্রিয়ম্বদার চেয়ে অনেকটাই বড় ছিলেন তিনি। মনে হয়, পালটি-ঘর সম্পর্কিত একটা সংস্কার চৌধুরী-পরিবারে তখনও কিছুটা ছিল। কিন্তু পরে যখন প্রিয়ম্বদা বিধবা হয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসেন তখন প্রসন্নময়ী কেবল যে সর্বতোভাবে তাঁর আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়, সমাজের নানা কর্মকাণ্ডে কন্যাকে সক্রিয় করে তোলার কাজে নিশ্চয়ই উৎসাহও দেখিয়েছিলেন তিনি। প্রিয়ম্বদার পুত্র তারাকুমারের মৃত্যু হলে সেই অসহ শোকের মধ্যেও কন্যাকে সাহিত্যচর্চার পথে নিয়ে আসার কাজেও যে প্রসন্নময়ীর ইচ্ছা ও প্রয়াস ছিল তা সহজেই অনুমেয়। দুঃখের আঘাতে অধীর হয়ে ওঠার স্বভাব মাতা ও কন্যা কারোরই ছিল না। সংযতভাবে শোক সহ্য করবার মানসিকতাই ছিল তাঁদের। কিন্তু প্রসন্নময়ী অকালপ্রয়াত জামাতার একটি জীবনচরিত প্রণয়ন করেছিলেন যত্নের সঙ্গে। এতে জামাতার প্রতি তাঁর স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধার স্বাক্ষর আছে। 'তারাচরিত' নামের এই জীবনীটি *মানসী* পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২০ থেকে আষাঢ় ১৩২১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তার আগে প্রিয়ম্বদার ভাসুরের মেয়ে তারামণির উনিশ বছর বয়সে মৃত্যু হলে প্রসন্নময়ী *মুকুল* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩১৯ সংখ্যায় 'তারামণি' নামে একটি ছোটদের উপযোগী জীবনকথা রচনা করে কন্যার শ্বশুরালয়ের সঙ্গে প্রীতি-সম্পর্কের প্রমাণ দিয়েছিলেন।

পুত্রের মৃত্যু হলে প্রিয়ম্বদার মনকে সাহিত্যকর্মের দিকে চালিত করবার চেষ্টার মূলেও প্রসন্নময়ীর সজাগ দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা ছিল মনে করা যেতে পারে। সমাজের নিন্দা-সমালোচনা উপেক্ষা করবার শিক্ষাও প্রিয়ম্বদা জননীর কাছেই পেয়েছিলেন। এক কথায় মাতা ও কন্যার সম্পর্কটি ছিল সাধারণ বাঙালি পরিবারে বিধবা মা ও মেয়ের সম্পর্কের তুলনায় খুবই অন্যরকম। নিষেধের ডোরে বা অতিরিক্ত স্নেহবন্ধনে আগলে না রেখে কন্যার নিজস্ব মর্যাদাসম্পন্ন অধিষ্ঠানভূমি গড়ে তোলবার কাজে সাহায্য করেছিলেন প্রসন্নময়ী। প্রিয়ম্বদার স্বাধীন ও আত্মস্থ ব্যক্তিত্বও জননীর আদর্শে ও সাহসে প্রাণিত ছিল এমন অনুমান খুবই সঙ্গত।

প্রসন্নময়ী দেবী সহ্য করেছিলেন পিতা, মাতা, প্রিয় ভ্রাতা আশুতোষ, জামাতা ও দৌহিত্রের মৃত্যু। কিন্তু তারপর তেষট্টি বছর ধরে যে কন্যা অনুক্ষণ তাঁর স্নেহের অবলম্বন ছিলেন তাঁরও মৃত্যু তাঁকে দেখতে হল আশি বছর বয়সে। ১৯৩৫ সালে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু হলে *ভারতবর্ষ* পত্রিকার সাময়িকীতে লেখা হয়েছিল—'ব্যর্থ জীবনে মাতা পুত্রীর সম্বন্ধ যেরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল তাহাতে কন্যার মৃত্যু যে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা জননী— শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর পক্ষে দুর্বিষহ দুঃখের কারণ তাহা বলাই বাহুল্য।' (চৈত্র, ১৩৪১)

আশি বছর বয়সে কোনো মা যদি তাঁর একমাত্র কন্যাকে হারান, তাঁর মনোবেদনার পরিমাপ করবার চেষ্টা, আমরা করব না। তবু এই কথাটি বলব যে প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা কেউই স্বামী, সন্তান হারিয়েও জীবনকে 'ব্যর্থ' মনে করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই

জীবনশিক্ষা প্রিয়ম্বদা প্রসন্নময়ীর জীবন থেকেই প্রধানত আহরণ করেছিলেন। এই দুই নারীর সম্পর্ক-বন্ধনের প্রধান সার্থকতা এখানেই। ব্যক্তিগত সংসার-বৃত্তটি কিছুটা ভেঙে গেলেও জীবনের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়াও সম্পর্কটি তাঁরা উভয়েই আজীবন অটুট রাখতে পেরেছিলেন— এক শতাব্দী আগের সমাজের কথা ভাবলে মনে হয় বাঙালি নারীর ক্ষেত্রে এই সত্যটির মূল্য অপরিসীম।

লেখার ভুবন

প্রিয়ম্বদার রচনাকর্মের বৈচিত্র্য ও বিস্তার বেশ বিস্মিত করে আমাদের। তিনি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ বিভায় প্রোজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিরাও প্রচুর লিখতেন এবং তৎকালে অনেকেই বিশিষ্ট কবি বলে পরিচিত। বাঙালি মহিলা কবিদেরও প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে প্রিয়ম্বদা কলম ধরবার আগেই। তবু প্রিয়ম্বদা দ্রুত স্থান করে নিলেন কবিসমাজে। মনের তারগুলি উপলব্ধির যে সূক্ষ্মতায় নিরন্তর বাঁধা থাকলে মৃদুতম স্পর্শেই সুরকম্পন জেগে ওঠে, যার ফলে সম্ভব হয় প্রকৃত গীতিকবিতার উৎসারণ, মনের ঠিক সেই গঠনই ছিল প্রিয়ম্বদা দেবীর। সেই যুগে জীবনবোধের একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতি ছিল। সাহিত্যিকদের ঈশ্বর-মহিমা, মানব-মহিমা, দেশানুরাগ, নিসর্গ প্রীতি ও হৃদয়ের প্রশান্ত, কোমল, প্রীতিস্নিগ্ধ অনুভবগুলিই প্রাধান্য পেত কবিতায়। বিচিত্র আঙ্গিকের পরীক্ষার যুগও আসেনি তেটা। জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে সকলেই কিছুটা রবীন্দ্রিক কবিতার অনুসরণ করতেন। ফলে প্রিয়ম্বদার কবিতাকে অত্যন্ত অভিনব কিছু বলা যাবে না। পুনরাবৃত্তিও আছে। কিন্তু সে-কথা তাঁর ঈষৎ পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) এবং প্রিয়ম্বদা এঁরা সকলেই কমবেশি সমমানের কবি ছিলেন। প্রিয়ম্বদার রোমান্টিক চেতনার মধুরতা ও সূক্ষ্মতা ছিল অনেকের চেয়েই বেশি। প্রাকরণিক দক্ষতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবিতা মার্জিত তৎসম শব্দের ব্যবহারে গভীর মধুর ধ্বনিময়, নির্ভুল ও গতিমান, অন্ত্যমিল স্বচ্ছন্দ ও সুমসৃণ, উপমা যথাযথ— কখনো কখনো প্রকৃত কবিমননের স্পর্শে স্পন্দিত।

ভ্রমক্রমে একবার রবীন্দ্র-রচনা বলে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল তাঁর লেখা। *লেখন* সংকলনে যে ছোট ছোট কবিতার সমাহার আছে সেই ধরনের ছোট কবিতা লেখায় বিশেষ সাবলীল ছিলেন প্রিয়ম্বদা। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর এই লেখাগুলি প্রকাশিত হত। অনেক সময়ে লেখার সঙ্গে কবির নামও থাকত না। সেই সময়ের পত্রিকার এটি একটি রীতি ছিল। নাম থাকত সূচীপত্রে। অনেক সময়ে তা-ও থাকত না, থাকত

একেবারে বার্ষিক সূচীতে। সূচীপত্রটি ছিঁড়ে গেলে কার কবিতা তা বোঝার উপায় থাকত না কোনো। *লেখন*-এর প্রথম সংস্করণে (১৯২৭) প্রিয়ম্বদা দেবীর পাঁচটি ছোট কবিতা সংকলিত হয়ে ,যায়।

সেই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায়ের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ১৩০৮ থেকে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে। কবিতার সঙ্গে নাম থাকত না সেখানেও। *লেখন* সংকলন করবার সময়ে রবীন্দ্র সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* থেকে প্রাপ্ত নামহীন ছোট কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের বলে ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সেগুলি পড়েছিলেন এবং নিজেরই লেখা বলে মনে করেছিলেন। *লেখন* প্রকাশিত হলে প্রিয়ম্বদা এ বিষয়ে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন *প্রবাসী*, কার্ত্তিক, ১৩৩৫-এ 'লেখন' নামের রচনায় সে ভুল স্বীকার করেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন যে ছোট কবিতাগুলি 'পড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল, মনে হল ভালোই লিখেছি।' *লেখন*-এর পরবর্তী সংস্করণ থেকে প্রিয়ম্বদার পাঁচটি কবিতা বর্জিত হয়। সেই কবিতাগুলির একটি এখানে তুলে নেওয়া গেল।

অভীষ্ট

তোমার ভুলিতে মোর হল নাক মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাহি কোন ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ধণী,
দেবতার অংশে তাও পাইবেন তিনি।

(*বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ, ১৩০৯)

বহুসংখ্যক কবিতা লিখেছেন প্রিয়ম্বদা দেবী। প্রায় কোনো লেখাই ন্যূনতম পাঠযোগ্যতা হারায়নি। অনেক কবিতাই বারবার পড়বার মতো। বিশেষত সনেট জাতীয় রচনায় তাঁর উপলব্ধি ঘন সংহতির মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। প্রিয়ম্বদার প্রেমের কবিতাগুলিতে একটি তপ্ত অনুভূতিও মাঝে মাঝে সঞ্চারিত হয় যা সেই কালের নারী-রচিত প্রেম-কবিতায় খুব সুলভ ছিল না। প্রেম ও পূজাকে সর্বত্রই তিনি একই অঙ্গে দেখেননি। রবীন্দ্র-উত্তর মানসিকতার প্রথম বিশিষ্ট পত্রিকা *কল্লোল* -এও (১৯২৩-৩০) তিনি কবিতা লিখেছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবি-পরিচিতি এখনও কিছুটা আছে। পূর্বোক্ত 'লেখন' নামের প্রবন্ধটিতে এবং *চম্পা ও পাটল* (১৯৩৯) কবিতা-গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর কবিতার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর অন্য দুটি কবিতা-গ্রন্থ— *রেণু* (১৯০০) এবং *অংশু* (১৯২৭) বেশ সুপরিচিত ছিল। প্রমথনাথ বিশী প্রিয়ম্বদার কবিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন *বিশ্বভারতী পত্রিকায়* (কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৭)। কিন্তু প্রিয়ম্বদার গদ্যরচনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। তাঁর অন্যান্য সাহিত্য-কর্মের খবরও আমরা তেমন রাখি না।

প্রিয়ম্বদার গদ্য লেখাগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে—বড়দের জন্য ও ছোটদের জন্য। বড়দের জন্য লেখাগুলি বই-আকারে প্রকাশিত হয়নি। কয়েকটি পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখিকা ছিলেন, যেমন— *মানসী, মাতৃমন্দির, তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা*। নানারকম লেখা পত্রিকাগুলির জন্য লিখেছেন, ছাপাও হয়েছে, কিন্তু এগুলির মধ্যে সবসময়ে কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না।

সংখ্যায় সর্বাধিক গদ্যরচনা 'কথিকা' জাতীয়। মনের একটি আবেগ বা চিন্তাকে অবলম্বন করে নাতিবৃহৎ ভাবাত্মক রচনার ধারা বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রচলিত ছিল। এখন কমে এলেও *কল্লোল কালিকলম* পর্যন্ত এই স্রোত ছিল বেশ জোরালো। রবীন্দ্রনাথের *শান্তিনিকেতন* গ্রন্থের অন্তর্গত ভাষণগুলি এবং *লিপিকা* এই শ্রেণীর রচনার নিদর্শন হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হয়েছে। প্রিয়ম্বদা এরকম অনেক লিখেছেন। *ভারতী*তে 'খেয়াল খাতা' বিভাগ খোলা হলে তাতে তাঁর এজাতীয় লেখা ছাপা হতে থাকে। পরেও অনেক লিখেছেন। তার কয়েকটি হল— বসন্তের কথা (*ভারতী*, চৈত্র, ১৩২১), আঁধারে আলোকে (*ভারতী*, আশ্বিন, ১৩২৪), ভরা বাদরে (*বিচিত্রা*, আশ্বিন, ১৩৩৯), মনের দিনের কথা (*বিচিত্রা*, বৈশাখ, ১৩৩৯)। একটি উদাহরণ— 'ভাল ছিদ্রহীন নৌকাখানি পারঘাটে বাঁধা থাকে, স্রোতের জল তার নীচ দিয়ে তর্ তর্ করে বহে যায়, ...এক পারে যাত্রীসব তারি উপর আরোহী হয়, অপর পারে তারি অপেক্ষায় বসে থাকে, আর ভাঙা ফুটো নৌকাখানি তার বুকের সবগুলি পাঁজর বার করে কাৎ হয়ে শুকনো ডাঙ্গার উপর পড়ে থাকে, তাকে কেউ ফিরেও পোঁছে না। অথচ সেই সম্পূর্ণ নৌকাখানি আপন সৌভাগ্য সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞান, ভগ্ন তরীখানিও আপন হতভাগ্য বিষয়ে ঠিক তেমনি অচেতন।' (*ভারতী*, চৈত্র, ১৩১২)। পড়লেই বোঝা যায়, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাবলীল ভাষা, 'ফিরেও পোঁছে না' জাতীয় বাগ্‌ধারা ব্যবহারে অকুণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী কারোরই কলমের ছাপ নেই এ ভাষায় ; নেই কোনোরকম উচ্ছ্বাসের অতিরেক বা উপমার বাহুল্য। বাস্তব জীবনের একটি বাস্তব ঘটনাকে শুধু ঈষৎ অন্যচোখে দেখা ও তার মধ্যে দিয়ে একটি উপলব্ধির প্রকাশ— প্রায় একটি গদ্য-কবিতা।

প্রিয়ম্বদার বেশ কিছু অনুবাদ-রচনার নির্দশন ছড়িয়ে আছে পত্রিকার পাতায়। নানা দেশের লেখা তিনি বেশ খুঁটিয়ে পড়তেন। কিছু কিছু বিদেশী বইয়ের সমালোচনাও করেছেন। যেমন Hudson রচিত *The Naturalist in La Plata* এবং *Idle Days in Patagonia* (*ভারতী*, আষাঢ়, ১৩০৫) Meignan -এর *From Paris to Pekin over the Siberian Snows* (*ভারতী*, কার্ত্তিক, ১৩০৫)। *Wide World* -পত্রিকা থেকে Louis de Rosemount -এর রচনা অবলম্বনে 'দেশান্তরিত ফরাসী' (*ভারতী* বৈশাখ, ১৩২৩) নামে একটি অনুবাদ পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায়, 'অন্তিমে' নাম দিয়ে একটি রুশ নাটিকার অনুবাদ (*ভারতী*, শ্রাবণ, ১৩২০)। প্রিয়ম্বদার ভিন্ন ধরনের একটি অনুবাদ রচনা 'চা-গ্রন্থ'। *The Book of Tea* নামে ওকাকুরা-র একটি ছোট বই প্রকাশিত

হয়েছিল, যার মধ্যে জাপানের গৃহ সংস্কৃতির কয়েকটি দিক—চায়ের আসর, ফুল সাজানো ইত্যাদি আলোচিত হয়। সেই বইটি 'চা-গ্রন্থ' নামে অনুবাদ করতে শুরু করেন প্রিয়ম্বদা। *মানসী* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩২১ এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ সংখ্যায় দু'কিস্তি বেরোবার পর লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিশ্বের বিচিত্র মানুষ, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল সম্পর্কে একটি জাগ্রত কৌতূহল ছিল তাঁর যা তাঁর মৌলিক রচনাকেও প্রভাবিত করেছে। অনুবাদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাসের রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র অনুবাদ। প্রকাশিত হয় *মানসী* পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায। প্রিয়ম্বদা এই অনুবাদে সংস্কৃত ভাষারীতি পরিহার করে সরল ও সুন্দর ভারি মিষ্টি একটি বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন যা সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদে সাধারণত দেখা যায় না। শুধুই সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার টানে করা এই অনুবাদটির মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, 'এই স্বল্পায়তন স্বপ্নসুন্দর নাটিকাখানির কাব্যরসই আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল। রম্যাণি এক৷ ভোগ করিলে পরিতৃপ্তি হয় না, তাই সকলের সহিত সে আনন্দ ভাগ করিয়া লইবার জন্যই নাটকখানি ভাষান্তরিত করিয়াছি।' এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সার্থক হয়েছে তাঁর অনুবাদে। তাঁর ভাষার সংযত সুকুমারতা, স্বচ্ছন্দ পারিপাট্য ও মধুর অনুভবের সূক্ষ্মতাকে অনায়াসে রূপ দেবার সহজাত শৈলী এই অনুবাদকর্মটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মসৃণভাবে মিলে গেছে।

সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কিছু অনুবাদ প্রিয়ম্বদা করেছিলেন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার জন্য। এই পত্রিকায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের (১৮৩৩ শক) বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় 'সাধুবাক্য' নাম দিয়ে বাইবেলের কিছু অংশ এবং ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রায় একবছর ধরে 'ভক্তবাণী' নাম দিয়ে বাইবেলের আরো কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন তিনি। এ জাতীয় লেখার সূত্রপাত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের *তত্ত্ববোধিনী*তে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় গীতা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তরদানের মধ্যে দিয়ে। কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ইন্দিরা দেবী, অধিকাংশই প্রিয়ম্বদা। মনে হয়, পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই এগুলি করা হয় (১৩১৭ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত *তত্ত্ববোধিনী*-সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ)। নিছক ধর্মবিষয়ক অন্য কোনো লেখা তাঁর নেই। প্রিয়ম্বদার স্বভাবে গভীরতা ও প্রাঞ্জলভাবে সবকিছু বোঝার ক্ষমতা থাকায় এই দুরূহ কাজটি তিনি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। বিষয়টি আরো উল্লেখ্য এই কারণে যে, *তত্ত্ববোধিনী*র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সর্বোত্তম মননশীল লেখকগোষ্ঠী, যাঁদের ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের জ্ঞান ছিল প্রশ্নাতীত। তবু এই কাজটির ভার অর্পিত হয়েছিল প্রিয়ম্বদার উপর। তাঁর গীতা ও বাইবেলের উপর অধিকার সম্পর্কে পত্রিকা-পরিচালকমণ্ডলীর দৃঢ় আস্থা ছিল অবশ্যই।

প্রিয়ম্বদার বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি যদিও অনিয়মিতভাবে লেখা এবং বিশেষ বিষয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক তাতে ধরা পড়ে না, তবু এগুলি প্রমাণ করে যে, এই বিভাগেও তিনি অনধিকারী ছিলেন না। তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আছে— 'ভারতবর্ষের বীর-রমণী' (*ভারতী*, কার্তিক, ১৩১৬) ; ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের মৃত্যুস্মরণে রচিত প্রবন্ধ (*ভারতী*,

পৌষ, ১৩১৭) ; প্রিয়জনের মৃত্যুর পর স্মৃতির মূল্য বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ 'স্মরণ' (ভারতী, কার্তিক, ১৩২৪) ; 'ভারতমহিলা ও রাজা রামমোহন' (*তত্ত্ববোধিনী*, কার্তিক, ১৩২৫) ; লর্ড বিশপের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত প্রবন্ধ (*তত্ত্ববোধিনী*, চৈত্র, ১৩২৫)। একটু গতানুগতিক বিষয়— সুগৃহিণীর কর্তব্য নিয়ে লেখা প্রবন্ধ 'ঘরের কথা' (*সুপ্রভাত*, অগ্রহায়ণ ১৩২০— ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধিবেশনে পঠিত) ছাড়াও আছে 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল' নামে পৃথক প্রবন্ধ (*মাতৃমন্দির*, মাঘ, ১৩৩০)। আরও একটি লেখায় প্রবন্ধাকারে নিবেদিত হয়েছে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকার বিবরণ (*প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯)। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনটি লেখা একটু বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। *চৈতালি* কাব্যের একটি সপ্রশংস সমালোচনা লিখেছিলেন তিনি (*বিচিত্রা*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯)। লেখাটি সমালোচনামূলক নয়, ভক্তিমূলকই বলা যায়। তবে একজন কবির রচনাসৌন্দর্য আর একজন কবিকে উদ্বেলিত করছে— এই অনুভব লেখাটিকে প্রায় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে পরিণত করেছে। আর একটি লেখা 'পুণ্যাহ' (*ভারতী*, আষাঢ়, ১৩২৪)। পঞ্চম জর্জের ভারত-আগমন উপলক্ষে দেশের আনন্দোৎসব ও সৌভাগ্যের কথা তাতে বলা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসক ও সে সময়ের শিক্ষিত বাঙালির ঈষৎ বিচিত্র মানসিক সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। বাঙালিরা অধীনতায় বেদনা বোধ করতেন, চাইতেন সমান সম্মান, উপযুক্ত কর্মনিযুক্তি, কিছুটা স্বায়ত্তশাসন, অথচ যোগ্যতম শাসক হিসেবে সিংহাসনে দেখতে চাইতেন ইংরেজকেই। ব্রিটেনের রাজন্যবর্গকে কেন্দ্র করে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার একটা ধারা একসময়ে বাংলা সাহিত্যে বয়ে গেছে। প্রিয়ম্বদার 'পুণ্যাহ' লেখাটিকে সেই ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এরই অল্পদিন আগে লেখা 'যুদ্ধ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি (*ভারতী*, বৈশাখ, ১৩২৩) পড়লে সন্দেহ থাকে না যে আত্মমর্যাদা ও ইংরেজভক্তির পূর্বোক্ত সহাবস্থান প্রিয়ম্বদার মধ্যেও ছিল। 'যুদ্ধ প্রসঙ্গে' লেখার সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধের নির্মমতা ইত্যাদির উল্লেখ ছাড়াও ইউরোপ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন তিনি যার মধ্যে ধরা পড়েছে চিন্তা ও সৎসাহস। 'এতদিন ধরে ইউরোপ ধর্মের ধ্বজা ধরে, বিশ্বমৈত্রীর বাহানা করে, যে বিরাট মিথ্যার অভিনয় করে আসছিল আজ কি তাই অবারিত হয়ে পড়েনি ?' এরই পাশাপাশি এশিয়াবাসীর মানসিকতারও তিনি যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন, 'আমাদেরও দেখতে হবে, কর্ম্মহীন অসাড় জীবন কি অসার, জড়তা কি পরিমাণ স্বার্থপরতা, মানুষের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকলে কত পাপেরই সৃষ্টি করে . . .'। এই প্রবন্ধটি পড়লে মনে হয়, প্রিয়ম্বদা চিন্তাধর্মী প্রবন্ধ আরো লিখলে পারতেন। তা হলে সে সময়ের এক শিক্ষিতা মহিলার সমকাল-সমস্যা বিষয়ক চিন্তাভাবনার কিছু পরিচয় আমরা পেতাম।

বড়দের জন্য কোনো উপন্যাস প্রিয়ম্বদা লেখেননি, তিনটি ছোটগল্প পাওয়া গেছে তাঁর। ১৩২১ বঙ্গাব্দের *ভারতী* পত্রিকায় আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির মূল রসটি বোঝার জন্য একটু দীর্ঘ বর্ণনা প্রয়োজন। দুই বাল্যবন্ধু হেক্টর ও বোরিস ভালোবেসেছিল একই রমণীকে এবং

স্থির করেছিল প্রতিযোগিতার নিষ্পত্তি হবে একটি *ডুয়েল*-এর সাহায্যে। তার আগেই ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হল। হেক্টর যোগ দিল নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে এবং বোরিস রাশিয়ার পক্ষে। এরপর লেখিকা রুশবাহিনীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ সেই প্রবল তুষারঝড়টির বর্ণনা করেছেন। রাত্রিশেষে ভাসমান একটি বরফখণ্ডের উপর দুই আহত বন্ধুর জ্ঞান ফিরল এবং তারা স্থির করল সেই অঘটিত দ্বন্দ্বযুদ্ধটি তারা নিষ্পন্ন করবে সেখানেই। লেখিকা এই দুই সৈনিক বন্ধুর চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই হারিয়ে যাওয়া মধ্যযুগীয় বীরত্বের রূপ। এক বোতল পানীয়ের অর্ধেক পান করে হেক্টর তা বোরিসকে এগিয়ে দেয়—না হলে দুজনের শক্তি সমান হয় না। সেই তীব্র শীতে একটু উষ্ণতার জন্য লুব্ধ বোরিস অনেক চিন্তা করে তা প্রত্যাখ্যান করে— যুদ্ধের আগে শত্রুর দান সে নেবে কি করে? হেক্টরের একটি পা কাটা গেছে, রক্তপাত হচ্ছে অবিরাম। সেই অবস্থায় বরফের উপর দিয়ে শরীর টেনে তাকেই অগ্রসর হতে হয় বোরিসের দিকে কারণ তার আগে মুদ্রার সাহায্যে ভাগ্যনির্ণয় করে স্থির হয়েছে যে এগিয়ে যাবার কষ্ট বহন করতে হবে তাকেই। এই এগিয়ে যাবার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয়ম্বদা—মাপা, তীক্ষ্ণ, করুণ, বাস্তব ও সুন্দর। বোরিস বেদনায় নীল হয়ে বন্ধুর সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেখে কিন্তু সাহায্য করে না। সৈনিককে দয়া করার অসম্মান তো দেখানো চলে না! কাছাকাছি এসে জ্ঞান হারায় হেক্টর। বোরিস হাত বাড়িয়ে তার রক্ত ঝরা ধমনীটি চেপে ধরে থাকে। একটু পরে জ্ঞান হলে হেক্টর বলে, 'কি করছ।' বোরিস বলে, 'তোমার কখন যুদ্ধের সুবিধে হবে তাই অপেক্ষা করছি।' দুজনেই প্রস্তুত হয়, এমন সময়ে কথাসূত্রে জানা যায় সেই মেয়েটি প্রতারিত করেছে দুজনকেই। সে ছিল নেপোলিয়নের গুপ্তচর। দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রয়োজন আর থাকে না। এদিকে রোদের তাপে বরফখণ্ডটি প্রায় গলে গেছে। এমন সময় জীবনের আশ্বাস নিয়ে উপস্থিত হয় হেক্টরের ভৃত্য। দুই সৈনিক মৃত্যু সম্ভাবনায় ছিল অবিচলিত, জীবনের সম্ভাবনাতেও তারা অনুদ্বেল থাকে। বোরিস শুধু বলে, 'দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবার মত বাকি দেখছি মোটে ত একখানি পা . . .'। এই গল্পটির একটি সেন্টিমেণ্টাল লেখা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু অদ্ভুতভাবে তার পাশ কাটিয়েছেন প্রিয়ম্বদা। ইতিহাসাশ্রিত স্থান, কাল ও চরিত্র ; উজ্জ্বল, তারল্যহীন মানবিকতাবোধ ; সংযত বাস্তব বিবরণের সমন্বয়ে গল্পটি ইতিহাস-কল্পনারঞ্জিত রোমান্টিক গল্পের একটি আশ্চর্য সুন্দর উদাহরণ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলির কথা মনে রেখেও বলা যায় তাঁদের গল্প যতটা মধুর রসের, ততটা ইতিহাস রসের নয়। কিন্তু প্রিয়ম্বদা এই গল্পে ইতিহাসকে একটুও ভুলতে দেননি। নেপোলিয়নের দম্ভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বড় নেতা হবার জন্য জরুরি চতুরতা অল্পরেখায় অসাধারণভাবে ফুটিয়েছেন। ইতিহাসের সেই দিনগুলির নৈতিক আদর্শ, মানবীয় সম্পর্ক, রাজনীতির ধারণা, সামাজিক প্রটোকল— প্রতিটি বিষয়কেই গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই গল্পটিতে। প্রিয়ম্বদার অপর ছোটগল্পটির নাম 'রেণুকা' (*মানসী*, শ্রাবণ, ১৩২১)—জাপানের গেইশা

রমণীদের জীবন ও তাদেরই একজনকে নিয়ে লেখা। গেইশা প্রধানা সুন্দরী রেণুকা প্রেম ও গৃহের আকাঙ্ক্ষায় ভালোবেসেছিল। কিন্তু প্রেমিকের মঙ্গলই তার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে তার সামাজিক সম্মানের কথা মনে রেখে সে বিবাহ করল না— যাপন করল নিঃসঙ্গ জীবন। এই গল্পটিতে কিন্তু কোনো বয়নকুশলতার পরিচয় নেই। সমকালে রচিত অন্য গল্পটির আপাত-নিরাসক্ত, মৃদুস্মিত, উজ্জ্বলকঠিন জীবনরসও অনুপস্থিত। গল্পাংশের তুলনায় বিবরণ অতিকথনের পর্যায়ে চলে গেছে এবং ঘটনাবিরল করুণরসের টানা বর্ণনা কিছু ক্লান্তিকর। তবে নায়িকার চরিত্রবর্ণনায় অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও একটি আন্তরিকতার স্পর্শ আছে, হয়তো লেখিকার জীবনের নিঃসঙ্গতার অনুভূতি যুক্ত হবার ফলেই। আর, জাপানের জীবন সম্পর্কে তাঁর বেশ নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় আছে গল্পটিতে। সাদা কাগজের 'হাল্কা দরজা', 'গৃহের পুষ্পসজ্জা', 'চায়ের আসর' ইত্যাদির উল্লেখে ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। ওকাকুরার মৃত্যুর একবছরের মধ্যেই রচিত এই গল্পটি সম্ভবত লেখিকার মনের জাপানের যাবতীয় অনুষঙ্গ ও স্মৃতি মন্থন করে উঠে এসেছিল। শেষ অংশে প্রিয়ম্বদা লিখেছেন, 'এখন তিনি সদাই নির্ব্বাক, অন্তরে কত কথারই উদয়াবসান হয়, কখন তিনি তাহা প্রকাশ করেন না। তিনি জানিয়েছেন এক সূর্য্য হইতে অপর সূর্য্যের মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান আজ তাঁহার এবং তাঁহার একান্ত প্রিয়ের মধ্যে যে দূরতা তাহা তদপেক্ষাও অধিক।' ওকাকুরার মৃত্যুর পটভূমিকা গল্পটিকে একটি ম্লান আলোকদীপ্তিতে মণ্ডিত করেছে মনে হয়। উল্লেখযোগ্য যে, গেইশার জীবন সম্পর্কে লেখিকার কোনো বিরাগ নেই—তা যে জাপানের প্রাচীন সংস্কৃতির অঙ্গ তা তিনি অনুভব করেছেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর তৃতীয় গল্পটির নাম 'আর আসে না' (*মানসী*, আশ্বিন, ১৩২১)। গল্প হিসেবে এটি তেমন শিল্পগুণমণ্ডিত হতে পারেনি। এক সম্পন্ন আইনজীবীর পত্নী দুই কন্যা ও বালক পুত্র রেখে পরলোকগমন করলে তিনি আবার বিবাহ করেন। কিন্তু মা ফিরে এসেছে মনে করে বালকটি নতুন মাকে দেখে গভীরভাবে আশাহত হয়। তার ব্যথিত আর্তনাদ স্পর্শ করে সকলকে। এই গল্পটি ভাবাবেগের আতিশয্যে কিছুটা সামঞ্জস্য হারিয়েছে। তবে পুত্রহারা প্রিয়ম্বদা মাতৃহারা বালকের মর্মদহনকে রূপ দেবার সময়ে নিজেকেও অনেকটা উজাড় করে দিয়েছিলেন হয়তো।

প্রিয়ম্বদার ছোটদের জন্য লেখা একাধিক গ্রন্থ আছে। একটি শিশু-উপন্যাস *অনাথ* (১৯১৫), একটি অনুবাদ উপন্যাস *পঞ্চুলাল* (১৯২৩) ; একটি অনূদিত শিকার কাহিনী *ঝিলে জঙ্গলে শিকার* (২য় সংস্করণ ১৯৩৯), দেশী ও বিদেশী লোককথাভিত্তিক একটি গল্পসংকলন *কথা ও উপকথা* (১৯২৩)। *পঞ্চুলাল* কার্লো কলোদি রচিত *পিনোক্কিয়ো* উপন্যাসের অনুবাদ, *স্পোর্টস্ ইন ঝীল্‌স্ অ্যান্ড জাঙ্গল্‌স্* কুমুদনাথ চৌধুরী রচিত শিকার বৃত্তান্ত। এই বইগুলি মুদ্রিত নেই, সহজপ্রাপ্যও নয়, তবু গ্রন্থাগারভুক্ত। কিন্তু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, পত্রিকায় ছড়ানো লেখাগুলি একেবারেই অপরিচিত থেকে গেছে। এখানে শুধু সেই লেখাগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

লেখাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। (ক) স্মৃতিকথা ও ভ্রমণমূলক রচনা, (খ) সরাসরি অনুবাদ, (গ) বিভিন্ন উৎস অবলম্বনে রচিত শিশুপাঠ্য গল্প, (ঘ) মৌলিক গল্প, (ঙ) সত্য ঘটনামূলক গল্পাকার রচনা। সামগ্রিক রচনা-সম্ভারের পরিচয়দান যেহেতু অসম্ভব, দু'একটি বিভাগ থেকে কয়েকটি রচনার কথা বলব।

সরাসরি অনুবাদগুলি Andrew Lang -সংকলিত *Animal Story-Book* থেকে নেওয়া, এই বইটিতে পশু ও পাখিসংক্রান্ত অনেকগুলি গল্প ও সত্যঘটনা সংকলিত। অনুবাদের জন্য অত্যন্ত শিশু-মনোহারী গল্প প্রিয়ম্বদা বেছে নিয়েছেন। একটি উদাহরণ— 'টুবলু' (*মুকুল*, বৈশাখ, ১৩১৬)। দুরন্ত ও বুদ্ধিমান একটি ইঁদুরছানার গল্প, যে তার মাকে বলে, 'এখনও কি তোমার আঁচলের তলায় থাকব ?' অতি দুঃসাহসের ফলে তার লেজ কাটা পড়ল একবার। কিন্তু সাহস ও বুদ্ধিবলে সত্যিই সে ইঁদুরদের নেতা হয়ে উঠল। তার কার্যকলাপের বিবরণ শিশুদের নির্মল আনন্দ দেবে। গল্পের শেষে কিন্তু টুবলু বুড়ো হয়ে মারা গেছে। গল্পের শেষে অপরাধের শাস্তি বা মৃত্যু দেখানোর প্রবণতা প্রিয়ম্বদার লেখাতে পাওয়া যায়। জীবনের সবটাই যে হাসিখেলার লঘুতা দিয়ে তৈরি হয়নি সে সম্পর্কে শিশুদের সচেতন রাখার ইচ্ছে তাঁর ছিল মনে হয়।

সত্যঘটনামূলক রচনাগুলিও প্রায়ই পশুপাখি নিয়ে লেখা। 'টমির বাঘ' (*মুকুল*, অগ্রহায়ণ, ১৩১২) ; 'আমার ময়ূর' (*সন্দেশ*, শ্রাবণ, ১৩২০), 'কালা ও হায়দার' (*সন্দেশ*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩— দুটি ঘোড়ার গল্প), 'এণা' (*সন্দেশ*, ফাল্গুন, ১৩২৪— পোষা হরিণীর গল্প)। এই লেখাগুলির কোনো বৃহত্তর তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য নেই—শিশুদের আনন্দ দেওয়া ছাড়া। পশুপাখির প্রতি শিশু-মনের স্বাভাবিক আকর্ষণকে তিনি এই গল্পগুলির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। চৌধুরী-পরিবারের অনেকেরই পশুপাখির প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল—একথাও মনে রাখা যায়।

নিজস্ব ঝরঝরে ভাষায় প্রিয়ম্বদা শিশুদের দেশবিদেশের অনেক গল্প শুনিয়েছেন। বিস্ময়কর তার বিস্তার ও বৈচিত্র্য। শুধু *মুকুল* পত্রিকাতেই প্রকাশিত এজাতীয় অসংখ্য লেখার কয়েকটি হল— 'উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা' (পৌষ, ১৩০৭), 'কাফ্রিদের রূপকথা' (বৈশাখ, ১৩১১), 'জাপানিদের রূপকথা' (আষাঢ়, ১৩১১), 'ভদ্রশীল জাতক' (ভাদ্র, ১৩১৫), প্লুটো-প্রসার্পিনের কাহিনী 'বসন্তের কথা' (মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৫), 'আপোলো ও ডায়েনার শৈশবকাল' (বৈশাখ, ১৩১৭), চীনা উপকথা 'রত্নহ্রদ' (বৈশাখ, ১৩২০)। *মৌচাক*, বৈশাখ, ১৩২৭-এ বেরিয়েছিল 'বিশ্ববীণা'—গন্ধর্ব ও সমুদ্রকন্যাকে নিয়ে বীণাসৃষ্টি সংক্রান্ত একটি মনোরম উপকথা। এমন আরো বহু আছে।

একটি বিশিষ্ট অনুবাদ-গল্প 'ধবলীর বীরত্ব' (*মুকুল*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭) আলফঁস দোদে রচিত ফরাসি গল্প অবলম্বনে লেখা। গল্পের প্রধান চরিত্র একটি গৃহ-পলাতক ছাগল। নিজের ছোট ঘর তার ভালো লাগে না। সে দূরের পাহাড়ে ঝরনার ধারে, আঙুরের বনে বেড়াতে বেড়াতে অনেক নিচে নিজের ঘর দেখে ভাবে, 'ওমা ! কতটুকুন ঘর, তাও আবার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, কেমন করে যে ছিলাম তাই ভাবি।' কিন্তু গল্পের

শেষে সে ধূর্ত শেয়ালের পেটে গেছে। গল্পটির পরিণতি শিশুদের একটু কষ্ট দেবে নিশ্চিত, কিন্তু মুক্তির আনন্দের সঙ্গে নিষেধহীন, স্বেচ্ছাচারী ঘর ছাড়ার বিপদের কথাও তাদের মনে গেঁথে যাবে।

শিশুদের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক ও শিক্ষামূলক কিছু কিছু লেখাও আছে তাঁর। মহৎ ব্যক্তিদের জীবন তাদের কাছে সরলভাবে বর্ণনা করেছেন। 'বিজ্ঞানের পরী রাজ্য' (*মুকুল*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৭) লেখাটিতে রূপকথার মতো করে বর্ণনা করেছেন বিজ্ঞানের রহস্য এবং শেষ করেছেন, 'উপকথার রাজ্যে তোমরা যেতে পারো না, বিজ্ঞানের রাজ্যে পারো।' যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থ *শিশুভারতী*-তে (১৩৩১) তিনি শিশুদের জন্য অনুবাদ করে দিয়েছেন আমেরিকা ও সার্বিয়ার জাতীয় সঙ্গীত।

ছোটদের জন্য লেখাগুলির মধ্যে তাঁর ভারি সুন্দর একটি হাস্যরসবোধেরও পরিচয় পাই। তা ব্যঙ্গভিত্তিক বা উদ্ভট কল্পনাজাত নয়, ভাষার কারিগরিও নয়। যেমন 'প্রবাসের সঞ্চয়' (*মুকুল*, বৈশাখ, ১৩১৫) লেখাটিতে গ্রামের এক বৈরাগীর কথা বলেছেন, যে প্রবল জ্বরের উপরও যথানিয়ম স্নান খাওয়া বন্ধ রাখত না, 'কেহ যদি তাহাতে বাধা দেয় তো বলেন—"আহা ইনি (অর্থাৎ জ্বর) আমার শরীরে সুখ ভোগ করতে এসেছেন, আমি যদি অস্নাত, অনাহারী থাকি, তাহলে এঁর কষ্ট হবে যে, সে আমি পারব না। আমার কাছে যখন এসেছেন তখন এঁকে সুখেই রাখতে হবে, যখন মন হবে চলে যাবেন"। এ অপূর্ব অতিথেয়তায় তাঁর বিশেষ অনিষ্ট হয়নি দেখলাম, তাই বলে তোমরা এ চেষ্টা কোরো না যেন।'

ছোটদের জন্য লেখা প্রিয়ম্বদার অনেক সুন্দর কবিতা *মুকুল*, *সন্দেশ*, *মৌচাক*, *শিশুসাথী*, *রামধনু* ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁকে নিয়ে নিবিষ্ট গবেষণা হলে এই কবিতাগুলিও তাদের প্রাপ্য মূল্য পাবে কোনোদিন।

প্রিয়ম্বদা ছোটদের ও বড়দের জন্য লিখতেন। কিন্তু একজন সত্যিকারের সাহিত্যিক আসলে তাঁর নিজের জন্যও লেখেন। প্রিয়ম্বদার পুত্র-স্মরণে রচিত কবিতা ও উপলব্ধি নিবিড় গদ্য, যাকে গদ্য-কবিতাও বলা যায় ; তাঁর কবিতা ; শিশু-বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীদের মনে রেখে লেখা রূপময় কাহিনীগুলি যে তাঁর নিজেরও জন্য তা সংবেদী পাঠককে কখনো বলে দিতে হবে না।

লেখার পৃথিবীতে প্রিয়ম্বদার যে নিরন্তর আত্মচারণা ছিল তার মন-ভরানো নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর নোটবইয়ে। প্রকাশক হাইবনশা ১৯৭৮ সালে ওকাকুরা কাকুজোর তিন-খণ্ডের রচনা-সংকলন প্রকাশ করে ইংরেজি ভাষায়। তারই তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয় প্রিয়ম্বদা দেবীর দুটি নোটবই। এই নোটবই সংরক্ষিত আছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র ভবনে। কোথাও মুদ্রিত করবার জন্যে নয়, একান্তই নিজের মনের অনুভূতির টুকরোগুলিকে ধরে রেখেছেন তিনি তাঁর নোটবইয়ে। কখনো কোনো প্রবন্ধের খসড়া, কখনো কল্পনার আঁচড়—যা পরে কবিতা, কথিকা বা প্রবন্ধে বিকশিত হবে। আর অনেক সময়ে কেবলই মনের মুকুর হয়ে উঠেছে সেই নোটবই। ইংরেজিতে লেখা প্রথম নোটবইটি (১৯১২-

১৫) থেকে দুটি অংশ দেখি। অনুভব করি কিভাবে নিজের মনকে সর্বক্ষণ তিনি পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে চলতেন। মনকে কখনো এলিয়ে পড়তে দিতেন না। অহর্নিশি মনের শক্তি সঞ্চয় করা, মনকে পরিস্রুত করা, গভীর উপলব্ধিতে ও স্নিগ্ধতায় সিঞ্চিত করার স্বেচ্ছাব্রত থেকে নিজেকে কখনো বিরাম দিতেন না।

How I love my hard white bed, after the long day it rests my tired back and eases the weariness of my weak limbs. It does not yield to me with soft insistent clinging but resists rather and with its self-sufficient restraint brings forth again my retired strength.

23.11.12

My life, is it life at all, some will ask, because of its monotony. This quiet existence, simple habits, invariable duties day after day, may disenchant an outsider and perhaps make him doubt that there is any living force dormant or even latent in it somewhere, which though not obvious, is still surely there. Inert waters, do they not hold a strong current in their silent depths; and the serene sky, does it not teem with myriads of atoms so full of eternl life?

16.12.12 my birthday

বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদা দেবীর স্থানটি কোথায় তা নিয়ে কিছু ভাবতে গেলে মনে হয় কয়েকটি কথা। কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর স্থান তাঁর সমকালের রবীন্দ্রানুরাগী (রবীন্দ্রানুসারী শব্দটি খুবই বিতর্ক-উদ্দীপক। যাথার্থ্যবাচকও নয়, মনে হয়) কবিদের মধ্যে ছিল প্রথম সারিতে—সে কথা আমরা আগে বলেছি। কথিকা জাতীয় রচনা এবং প্রবন্ধে যদিও তাঁর লেখার হাত যথেষ্টই সক্ষম ছিল, তবু এই বিভাগগুলিতে গতানুগতিকতার স্তর তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। অনুবাদক প্রিয়ম্বদা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন বলে মনে করি। চা-গ্রন্থ আর 'স্বপ্নবাসবদত্তা', অ্যানড্রু ল্যাং আর আলফাসঁ দোদে-র গল্প, সত্যিকারের শিকার-কাহিনী আর কার্লো কলোদি-র চিরায়ত রচনা 'পিনোক্কিয়ো', যার নায়ক একটি জীবন্ত কাঠের বালক, পরে যে সত্যিকারের ছেলে হয়ে যায়, এসবই অনুবাদ করেছেন তিনি। সেই একই কলমে করেছেন বাইবেল আর গীতার অনুবাদ। প্রত্যেকটি অনুবাদই চমৎকার। যেসব গল্প অনুবাদ বলে উল্লেখিত নয়, তারও অনেক গল্পের আখ্যান থেকে মনে হয় মূলে কোনো একটি বিদেশী কাহিনী-বীজ ছিল। অনুবাদক প্রিয়ম্বদাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া উচিত।

ছোটদের সাহিত্যের লেখক প্রিয়ম্বদাকে প্রায় ভুলেই গেছি আমরা আজ। অথচ

এই ক্ষেত্রে তিনি অতি উচ্চস্থানের অধিকারী। শিশুদের মনের প্রসার ঘটানো, বাস্তবের সঙ্গে তাদের পরিচিত করা, দেশ-বিদেশের মনোরম রূপকথা-উপকথার সম্ভারে তাদের জানার জগৎ ও কল্পনার আকাশকে বিস্তৃত করে দেওয়ার কাজ তিনি করেছেন একই সঙ্গে। শিশু ও বালক-বালিকাদের মন বিকৃতির দিকে না গিয়ে সুস্থতা, শুভবোধ আর সুন্দরের দিকে ধাবিত হোক এই চেতনা তাঁর ছোটদের লেখায় সমুজ্জ্বল। অথচ তাঁর লেখা উপদেশাত্মক নয়। শিশু মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও মনোহারী আখ্যান নির্মাণে প্রিয়ম্বদা সিদ্ধলেখনী ছিলেন। অতি সাবলীল, অতি মধুর ও সপ্রতিভ, বহিরঙ্গ প্রসাধনহীন অথচ ঝরঝরে ভাষা ছিল তাঁর। এই বিরল রম্যতাগুণ যা একই সঙ্গে ছোটদের টেনে রাখে আর বড়রাও ছাড়তে পারেন না— খুব কম লেখকই আয়ত্ত করতে পারেন। আর এই ভাষাটি আয়ত্ত না হলে ঠিকমতো ছোটদের লেখক হওয়া যায় না। *অনাথ* উপন্যাসটি, যেখানে একগুচ্ছ শিশু আর বালকবালিকাই গল্পের চরিত্র, ছোটদের সামনে এক সুখ-দুঃখময়, করুণ মধুর আনন্দ ভরা জগতের দরজা খুলে দেয়। প্রিয়ম্বদার ছোটদের লেখাগুলির পুনর্মুদ্রণ ও সংকলন না করে আমরা আমাদের শিশুদের বঞ্চিত করে রাখছি। সাহিত্যের এই বিভাগে প্রিয়ম্বদা সর্বকালের লেখক।

সুমিতা চক্রবর্তী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,
ডিসেম্বর ১৯৯৫



প্রথম পর্ব

শব্দচিত্র

প্রথম পর্ব : শব্দচিত্র

রেণু

অতি শিশুকালে আমরা কিছু মনে করে রাখতে পারিনে, কিন্তু হাতের কাছে যে টুকু পাই সে টুকু এম্নি জোরে আঁকড়ে ধরি যে ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন হয়। বড় হলে আমরা হাতের কাছের জিনিষ ছেড়ে বুকের কাছে যা পাওয়া যায় তাও ধরে রাখতে পারিনে, তখন কেবল সবই মনে করে রাখি।

সুখ চলে গেলে তার স্মৃতিটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু প্রিয়জন চলে গেলে শুধু স্মৃতি নিয়ে জীবন চলে না। সুখ আমাদের জীবনের অংশ মাত্র, প্রিয়জন জীবনের সর্ব্বস্ব।

নীলাকাশ শূন্য, কিন্তু তারি মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ গ্রহ তারকা লুকিয়ে আছে—শিশুর শূন্য দৃষ্টিটুকুও নীল, কিন্তু তারি মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের কত চিন্তা কত লক্ষ্য কত প্রকাশ অপরিস্ফুট ভাবে সঙ্গোপনে নিহিত থাকে।

অমাবস্যার পরদিনকে প্রতিপদ বলা হয়, পূর্ণিমার পর দিনকেও প্রতিপদ বলি ; সুখের হাসিও হাসি, দুঃখের হাসিও হাসি ; কিন্তু দুয়ে প্রভেদ কত ? একটি আশার বিকাশ, অপরটি আশার অবসান।

ভারতী, বৈশাখ ১৩১২

যা কিছু অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট তারি আবরণ আচ্ছাদনের আবশ্যক—ফুল যতদিন কোরক অবস্থায় থাকে ততদিনই সবুজ পাতার আচ্ছাদনে ঘেরা থাকে। মানুষের মনে প্রেম যখন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তখনি আমরা ব্যাকুল হয়ে প্রিয়জনের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তার আগে কেবল চোখের চাহনিতে মুখের লজ্জারাগে তার আভাষ পাওয়া যায় মাত্র।

সাদা কাগজখানির উপর একটুও কাল কালী ঢেলে পড়লে কি রকম বিশ্রী দেখতে হয়, কিন্তু অনেকটা লালকালী ঢেলে পড়লে কোন হানি হয় না বরং দেখতে ভাল হয়—জীবনভরা অনুরাগ জীবনের শোভা, কিন্তু এতটুকু কলঙ্ক তাকে কত শ্রীহীন করে !

নবোদ্ভিন্ন ধান্যগুচ্ছে যে সুকুমার পীতরাগ দেখা যায়, অপক্ক ধান্যশীর্ষে সেই পীত আবার গাঢ়তর কণকবর্ণে দেখা দেয়। জীবন প্রারম্ভের আশা আর জীবন শেষের আশ্বাসে কেবল একটু মাত্র বর্ণের তারতম্য।

ভারতী, আষাঢ় ১৩১২

দীপাবলিতে আমরা দুয়ারে, ছাদে, জানালায় অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে দি, তার পর দিন থেকে সারা বৎসর ঘরের কোণে শুধু একটি প্রদীপ জ্বলে। কোজাগর পূর্ণিমায় আকাশে শুধু একা চন্দ্র দপ দপ করে জ্বলতে থাকে আর লক্ষ লক্ষ তারা সবগুলি একেবারে মিলিয়ে আসে ! আমরা যেদিন বহু আড়ম্বরে বাহিরের অজস্র আয়োজনে দেবতার পূজা করি, তার পরে শূন্য হৃদয়ে তার ম্লান স্মৃতি জেগে থাকে—আর নিরায়োজনে দেবতার আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়ে চিরজীবনের অনন্ত আগ্রহ ও অশেষ আকাঙ্ক্ষা সব একেবারে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়।

মহা সমারোহে বরযাত্রী চলেছে। কত বাদ্যভাণ্ড কত প্রদীপ কত আলো কত লোকজন হাঁক ডাক কলরব। সেটি যখন আমাদের সম্মুখ হ'তে চলে গেল, অম্নি চারিদিকে গাঢ়তর অন্ধকারে ছেয়ে এল, পথ একেবারে নীরব জনশূন্য বলে বোধ হতে লাগল, যেন শেষাঙ্কের যবনিকা পতন ! কিন্তু তখনি তো অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে !

ভাবতী, ভাদ্র ১৩১২

কণিকা

শুধু সঞ্চয় করা সুগৃহিণীর একমাত্র পরিচয় নয়, তাঁর ঘরে অপচয়ও অনেক ঘটে। অতিথি প্রত্যহ আসে না কিন্তু সেই প্রত্যাশায় তিনি প্রতিদিনই কত আয়োজন করে রাখেন।

গৃহিণী যদি বিধবা হ'ন তবে শুধু তাঁর নিরামিষের ব্যবস্থা করিলে চলে না, আমিষের ব্যবস্থা তাঁকেই করিতে হয়, একাদশীর দিনেও তাঁর ঘরে রান্না চড়ে।

দুঃখের দিনে দুঃখ করা তো বিদ্রোহ নয়, কিন্তু সেই দুঃখকে জীবনে জাগ্রত করে রাখিবার চেষ্টাই বিদ্রোহ।

মানুষ নিজের দোষে জীবনটা নষ্ট করে, যখন দুঃখে পড়ে তখন অদৃষ্টের দোষ দেয় ; কিন্তু দৈবে যদি সুখ হয় তখন আত্মপ্রশংসা আর মুখে ধরে না।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

যাকে চিরকাল "আপনি" বলে আসছি তাকে একদিন অকস্মাৎ "তুমি" বল্‌তে বাধে না কিন্তু একবার "তুমি" অভ্যাস হ'লে আবার "আপনি" বলা বড় কঠিন।

বিষ্ণু যখন অখণ্ড দেবতা তখন বৈকুণ্ঠে তাঁর অমর জীবনের এক মাত্র সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী, আবার তিনি যখন অখণ্ড মানব রামচন্দ্র, তখন তাঁর একমাত্র প্রণয়িনী জানকী ; কেবল তিনি যখন কৃষ্ণ অবতারে কতক মানুষ, কতক দেবতা তখনি তাঁর সত্যভামা, রুক্মিণী ছেড়ে আরো অনেকগুলির আবশ্যক হয়েছিল।

নূতন আবিস্কৃত × (rays) রশ্মি সব কাঠিন্য, দৃঢ় সন্নদ্ধ প্রাচীর, কাষ্ঠ অন্তরাল, অস্থি মাংসভেদী ; কিন্তু প্রিয়জনের চক্ষে তার অপেক্ষা চতুর কুশল, ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ আলোক আছে সে একেবারে অন্তরাত্মায় পৌঁছয়।

বর্ত্তমানে যিনি প্রভূত ধনের অধিকারী আমরা তাঁকে বলি বড় মানুষ, কিন্তু কালক্রমে যখন তিনি ধনহীন হ'ন তখন তাঁর পরিচয় বনিয়াদী ঘরের ছেলে। আজ যাঁর জীবনে অনেক সুখ, ভবিষ্যতে অনেক আশা তিনি তো জীবনের রাজা, কিন্তু যাঁর জীবনে একটি বৃহৎ সুখের স্মৃতি আছে তাঁকেও দরিদ্র বলা যায় না।

ভারতী, পৌষ ১৩১২

ভাল ছিদ্রহীন নৌকাখানি পারঘাটে বাঁধা থাকে, স্রোতের জল তার নীচ দিয়ে তর্ তর্ করে বহে যায়, তরঙ্গেরা এসে তাকে আদর করে দুলিয়ে দিয়ে যায়, এক পারে যাত্রী সব তারি উপর আরোহী হয় অপর পারে তারি অপেক্ষায় বসে থাকে, পারাণী মহানন্দে নৌকা খুলে দেয়। আর ভাঙ্গা ফুটো নৌকাখানি তার বুকের সবগুলি পাঁজর বার করে কাৎ হয়ে শুক্‌নো ডাঙ্গার উপর পড়ে থাকে, তাকে কেউ ফিরেও পোঁছে না। অথচ সেই সম্পূর্ণ নৌকাখানি আপন সৌভাগ্য সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞান, ভগ্ন তরীখানিও আপন হতভাগ্য বিষয়ে ঠিক তেমনি অচেতন।

যেদিন লিখ্‌বার ঝোঁক চাপে সে দিন অকস্মাৎ একেবারে এত ছন্দ, এত কথা, এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে অস্থির হয়ে উঠ্‌তে হয়। একসঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, চাতক, কলহংস সবগুলি ডাকতে আরম্ভ করে। একত্রে বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ সবগুলি ছুটে এসে পড়ে। কতক যদি বা বলা হয় তো অনেক পড়ে থাকে—একলা একটু খানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন ? এত বড় পৃথিবী এমন বিশাল তাতেও পর্য্যায়ক্রমে ঋতুগুলি দেখা দেয়, একে একে কোকিল, দয়েল, চাতক, কলহংস গান গাইবার অবসর পায়।

ভাবতী, চৈত্র ১৩১২

বসন্তের কথা

শীতাকাশে ধূসর ম্লানিমা আর নাই। দিক্‌চক্রবাল অন্তরাল করিয়া কুয়াশার যে ঘন যবনিকা আমাদের উৎসুক দৃষ্টিরোধ করিতেছিল তাহাও অন্তর্দ্ধান। প্রকৃতি যোগনিদ্রাহত ছিলেন তাই জীবনের গতি যেন স্থগিত ছিল ; উৎসরাজির কলসঙ্গীত হিমানী-ব্যাঘাতে নিস্তব্ধ, স্রোতস্বিনীর স্রোতধারা শ্রান্ত মন্থরগতি, ম্রিয়মান-প্রবাহ, পত্রহীন রিক্ত তরুসমূহ মর্ম্মর গান ভুলিয়া মূক হইয়াছিল। গায়ক বিহঙ্গকুল দূরান্তর প্রবাসে ; আশার কাকলি আর কে শোনায় ? অন্তরে বাহিরে মৌন প্রতীক্ষা বিরাজ করিতেছিল। পৌষ মাসে যে রস-সৌন্দর্য্যধারা ফল্গুর ন্যায় অন্তরবাহিনী ছিল, ফাল্গুনে আজ তাহা দিকে দিকে উৎসারিত ; ধূসর আকাশের ক্লান্ত দৃষ্টি আনীল অপরাজিতার স্নিগ্ধ বর্ণে নয়ননন্দন, নবপল্লবশোভিত বনপ্রান্তর মর্ম্মর গানে মুখর, পিক পাপিয়ার ঝঙ্কারে আনন্দময়, শ্যাম-পত্রান্তরে কুসুমসুষমা বর্ণবৈচিত্র্যে নব বসন্তের অভ্যুদয় প্রচার করিতেছে, বৎসরের এই প্রভাত কাল, এই তরুণ কৈশোর অরুণ পুষ্পের লাবণ্য বহিয়া আনে, তাই আজ অশোক কিংশুকের প্রভাব, বলভদ্রের মদবিহ্বল নেত্রের মত আরক্ত পুষ্পসম্ভারে পথের দুইধারে বলরামচূড়ার বাহার। এ যে শীতাপগমে প্রকৃতির প্রথম জাগরণ, তাই অরুণোদয়ের বর্ণমাধুরী তাঁহার অঙ্গরাগে প্রোজ্জ্বল হইয়া ওঠে। আজ তাঁহার আঙ্গিয়া আবীরে কুঙ্কুমে লালে লাল।

শ্রীপঞ্চমীতে অলকে নব চূতমঞ্জরী দোলাইয়া, পীত উত্তরীয়াঞ্চলে বিকাশোন্মুখ তনু অঙ্গযষ্টি আচ্ছাদন করিয়া বাসন্তী লক্ষ্মী আসিয়া দেখা দেন। চারিদিকে পূজার আয়োজন পড়িয়া যায়, নবমালতী কুসুম বিকাশ চেষ্টায় উৎসুক হইয়া তাহার কোরকাবলিকে বিদীর্ণ করিয়া দেয়, চারিদিকে কুঞ্চিত দল ছড়াইয়া পড়ে, সৌরভে দিক্‌-প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়া যায়। আম্রশাখার প্রবালরক্ত-কিশলয়ের পাশে পাশে মুখ রাখিয়া শুক-বক্ষ-পীতবর্ণ নব মুকুল ফুটিয়া ওঠে, সুগন্ধের মৌন মধুর স্বাগত জানাইয়া তাহারা মুখর কলকণ্ঠ পিক-বৈতালিক দলকে আবাহন করিয়া আনে, প্রহরে প্রহরে আনন্দের নহবৎ বাজিতে থাকে। সে সাড়ায় বনানীর তোরণাবলিতে আরক্ত পুষ্পস্তবক প্রস্ফুটিত হয়, অশোক

পলাশ কিংশুক অগ্নিরাগ-প্রভায় অহোরাত্রি হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখে, বর্ণে গন্ধে গীতে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

শরতের শেষ-দিনগুলির সহিত এই নবীন বসন্তের বড় একটি সাদৃশ্য আছে, আকাশ তেমনি অপার সুনীল বর্ণ, স্বচ্ছ উজ্জ্বল, মেঘলেশহীন, বসন্তের প্রারম্ভে তরুরাজির পল্লবসজ্জা তখনও সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত হয় না, প্রায় শেষ শরতে তাহার সব পাতাগুলি তখনও ঝরিয়া যায় না। শস্যশ্যামল প্রান্তর প্রচুর শিশিরপাতে অধিকতর লাবণ্যময়, পাখীর গানের তখনও বিরাম হয় না। কোকিল পাপিয়া দূরান্তর প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে, একবার প্রাণ ভরিয়া গান গাহিয়া লয়, বিদায়কে মিলনের মতই রমণীয় করিয়া তোলে ! প্রভাতের অতি সুকুমার কুয়াসা সূর্য্যোদয়ে অমল শুভ্র, সন্ধ্যায় নারাঙ্গী-রাঙা হইয়া উঠে। শীত-শেষ বসন্তের সূচনা মনে জাগাইয়া তোলে। তাই শীতের ধূসর রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ও আমরা বসন্তের স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হই। নব চূতাঙ্কুরের পীত লাবণ্য, অশোকের অরুণ বর্ণ থাকে না সত্য, তবে দিগন্তচুম্বী প্রান্তরে আপক্ব ধান্যমঞ্জরীতে কনক শোভা জাগিয়া ওঠে, শেফালি অজস্র ফুটিতে থাকে, এই স্নিগ্ধ সুরভি পূজার ফুলগুলির নবনীত শ্বেত কোমল দল, দীপ্ত রক্তিম সুকুমার বৃন্তের উপর ভর করিয়াই ফুটিয়া ওঠে। হায় ! আমাদের জীবনের শারদ আশ্বাস জীবন কৈশোরের অশোক আশার আশ্রয় করিয়াই সঞ্জীবিত থাকে।

আমাদের দেশের প্রকৃতিতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব বড় কম, সে আসে আর যায়। অশোক ফুটিয়া উঠে, আবীরের ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়, বাঁশী বাজিতে থাকে, তবে সে কত দিনের জন্য ? হয় এক পক্ষ, নয় বিশটি দিনের মত। তাই হোরির আমোদে একটু বাড়াবাড়ি, কিঞ্চিদধিক চীৎকার শোনা যায়। যাহা ফুরাইয়া যাইবার ভয়ে ভঙ্গুর, যাহা ক্ষণিকের আনন্দে স্বপ্নময় তাহাই লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মাঝে হইতে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, বাকি থাকে শ্রান্তি গ্লানি, দীর্ঘ জাগরণের রাঙা চোখ আর ভাঙ্গা গলা।

বসন্তের এই যে অন্তরহীনতার কথা বলিলাম, আবার অন্য দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, দেখিতে পাই ঠিক বলা হইল না। মুকুলের মধ্যেই ত পরিণতির সূচনা বাস করে। মুকুলের আভাসের মত বর্ণ গন্ধ, ফলের মধ্যে পূঞ্জীভূত হইয়া, বাস্তবতা লাভ করে ; শুধু তাই নয় মুকুলের মধ্যে যে স্বাদের অস্তিত্ব আমরা জানিতাম না, ফলে তাহা পরিপক্বতার মধুরতায় রসে ভরপূর হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষ না হইয়াও এই সবই তো মুকুলের ক্ষণিকতার মধ্যে জীবন্ত ছিল, অন্তরে তাহার নিঃস্ব শূন্যতা নয়, পরিপূর্ণ প্রাণ ছিল বলিয়াই এমন সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্ভব হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে সম্পূর্ণতার অপেক্ষা সূচনাই অধিক প্রাণ-সার। সম্পূর্ণতা অর্থে বিরাম, শেষ, অনন্তের অধিকার সেখানে সীমাগ্রস্ত ; কিন্তু প্রারম্ভ, প্রথম বিকাশ-চেষ্টার মধ্যেই অনন্তের আবাহন, বিসর্জ্জন নহে। বসন্ত বৎসরের সূচনা বলিয়াই অন্তহীন সম্ভাবনার সঙ্গোপন আকর।

বসন্তে ফুলের বর্ণ লাবণ্য যত প্রচুর, সুগন্ধগৌরব তত নাই, এ যেন রূপের বিকাশ,—মন তখনও জাগে নাই। ইহার উৎসবের মধ্যেও মনের গভীরতার অভাব দেখিতে পাই। দোললীলা এই মধু ঋতুর আনন্দ-অনুষ্ঠান। এই দিনে আমরা যাহাদের সঙ্গে হোরি খেলা করি, তাহাদের সঙ্গে হয় কোন সম্পর্ক থাকে না, নয়তো কেবলমাত্র কৌতুকের সম্বন্ধ ; যে রং গায়ে ছড়াইয়া দি, তাহাও ঝরিয়া পড়িয়া যায়, যে কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া খেলি, তাহারো চিহ্ন বড় বেশী দিন থাকে না, ধুইয়া ফেলিতে যা বিলম্ব। তাহার পর গ্রীষ্ম যায় বর্ষা গত হয়, শ্রাবণের শেষপূর্ণিমায় নীরবে দক্ষিণ হাতে এক একখানি রাখি বাঁধিয়া লই। এই বন্ধন যাহার প্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া দি তাহার সঙ্গে বড় একটি পবিত্র মধুর সম্বন্ধের স্থাপনা হয়। তিনি আমাদের রাখী ভ্রাতা। রাঙা রেশমের সুকুমার বন্ধনটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেও, সে সম্বন্ধ ঘোচে না, রাখী ভ্রাতা বন্ধুর চিরজীবনের আর্ত্তি সহায়।

ভারতী, চৈত্র ১৩২১

শব্দচিত্র

আমার ছোট ঘরটির দরজার ফাঁক দিয়ে, সম্মুখে যতটা চোখে পড়ে, তা বিঘে-দুয়েক জমির বেশী নয়। তবু এরি মধ্যে অনেক দেখবার ও ভাববার জিনিষ আছে। প্রথম হচ্ছে, ধূসর মেঘে-ছাওয়া খানিকটে আকাশ, অসীমের একটুখানি টুক্‌রো, তারি নীচে ঘন সবুজ রংএর বনের বেড়া, আকাশের নুয়েপড়া অংশটুকু প্রায় সমস্তই সে ঢেকে রেখেছে। আকাশের সেই অংশ দেখা যাচ্ছে যেখান হতে গোলক-ভাব কেটে গিয়ে সমতলতার সূচনা হয়েছে। বনের বেড়ার পায়ের তলা হতে একটি সোণালি সবুজ ঘাসের আস্তরণ কতক দূর এসে একটি চতুষ্কোণ পুস্করিণীর দ্বারা খণ্ডিত। তারপর আবার ঘাসের গালিচা। সবশেষে সিমেন্ট-মাটী দিয়ে মাজা আমার ঘরের সম্মুখের মাটির রংএর বারান্দা। সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে না ; মনে হচ্ছে, সেই বারান্দার পরই ঘাসের আঙ্গিনা। আকাশটুকু যে মেঘের ভারে সর্ব্বদাই স্তম্ভিত আছে, তা নয় ; মাঝে-মাঝে সূর্য্যের আলো তার উপর অনেকগুলি ধারাল তীরের মত এসে বিঁধে পড়ছে ; মনে হচ্ছে, যেন বলছে, "এ অসাড় ভারটাকে সরিয়ে ফেলো, আমি তোমার সবখানি আলোয়-আলোয় উজ্জ্বল করে দি।" আবার কখনো-বা খেলা চলছে,—আলোছায়ার লুকোচুরি, কখনো ধূসর মেঘের আঁচল ঘিরে একটি ঢেউখেলান রূপালি জরির ঝালর ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেঘের ভার জমেই আছে ; কখনো গুরু, কখনো-বা লঘু ; একেবারে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে না, সম্পূর্ণ অব্যাহতি আস্‌ছে না।

তারপরে সেই বনের বেড়া। যখন বাতাস উঠ্‌ছে, তখনই সমারোহ। তাল, খেজুর, সুপারি, নারিকেল, বট, বাঁশ, আম, কাঁঠাল, বাবলা, সবাই মিলে তান ধরছে ; একটি ঝর্ঝর মর্ম্মর শব্দে সঙ্কীর্ত্তনের স্রোত ভেসে আস্‌ছে। বাঁশের হাল্কা শাখা দুলছে, কাঁপছে,

উঠছে, পড়ছে সে যেন সঙ্কীর্ত্তনকারীদের পতাকা বহন করে চলেছে। এক একটি গাছ আবার লতায় ঘেরা, জটাধারী সন্ন্যাসীর মত তার আন্দোলন বড় ধীর গম্ভীর!

বট দোলে না; সে যে তার বাকল-জটায় একেবারে বাঁধা, স্থবির। তার অসংখ্য পত্রাবলি শুধু তুড়ি দিয়ে গায়। নারিকেল সুপারি হাত দুলিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নাচে; তাল, গম্ভীর শব্দে বড়-বড় পাতায় আঘাত করে' করতাল বাজাতে থাকে। অদৃশ্য গায়কদলের অবাধ-সঙ্গীত ভেসে আসে, চারিদিকে বিস্তারিত হয়ে যায়। বাতাসের আবেগ হ্রাস হয়ে এলে গীত-শব্দও স্তব্ধ হয়ে আসে, আন্দোলন দূর হয়ে যায়। আবার অনেক তরু-সারি দুর্গ-প্রাকারের মত স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

এরি পায়ের নীচে বিছান ঘাসের আস্তরণ গালিচার মত নয়, রেশমী সবুজ সোণালিতে মেশান ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর মত। যখন মেঘে ছায়া করে আসে তখন সবুজ গাঢ় হয়, তার সোণালি আলোর জলুষটুকু নিবে যায়। আবার যখন আকাশে আলো ওঠে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই ঘাসের বিছানার সোণালি বাহারটুকু আরো পরিস্কার করে দেখা যায়, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই বিছানার উপর যখন গাছের ছায়া পড়ে, নারিকেলের লম্বা পাতাগুলি উপরে দুল্‌তে থাকে, নীচে তার ছায়া কাঁপে, মনে হয় কে যেন অদৃশ্যহস্তে সব ঝেড়ে পরিস্কার কর্‌ছে। গরু চরে বেড়ায়, মানুষ আনাগোণা করে, ছাগল-ছানা লাফিয়ে চলে; সবাই আপন-আপন ক্ষণিক ছায়ার ছবি এঁকে সরে-সরে যায়। শালিক ভূঁয়ে চরে খুঁটে-খুঁটে কিবা খায়, বুল-বুলির রঙ্গনগাছে বাসা আছে, মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আসে, ঝুঁটি নাড়া দিয়ে এদিক-ওদিক ওড়ে, আবার কখন যে পাতার আড়ালে ঝোপের মধ্যে আপন বাসাটিতে গিয়ে বসে, বোঝাও যায় না। ছোট্ট-ছোট্ট টুন্‌-টুনি পাখীরা ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায়, তাদের গায়ের বর্ণ ময়ূরকণ্ঠীর মতই সোণালি সবুজ। হল্‌দে পেয়ালার মত কলকে ফুলের মধুই তাদের বেশী ভাল লাগে বোধ হয়। সারাদিনই ত দেখি সেইখানেই আনাগোনা কর্‌ছে। ফুলগুলিকে কাৎ করে ধরে, বোঁটার কাছ হতে মধু টেনে খায়। তাদের লম্বা-লম্বা ঠোঁট ডগার কাছে একটু বাঁকান। আর প্রজাপতির সা'র হেলে-দুলে কেঁপে-কেঁপে উড়ে বেড়াচ্ছেই। কেউ কালো, কেউ শাদা, কেউ বা হল্‌দে, কেউ বা পোড়ান ইঁটের মত পাট্‌কিলে রংএর; আবার কারো সর্ব্বাঙ্গে অনেক সাজ-সজ্জা, পাঁচ রঙা আল্‌পনা। সেগুলি যেন ইন্দ্রধনু হ'তে গড়া; শরীরের শিরায়-শিরায় অচপল চপলার আলো দিয়ে রেখা টানা। এগুলি আকারেও কিছু বড়। এত কারিগরির জন্যে একটুখানি বেশী স্থান আবশ্যক বই কি! এরি পরে সেই পুস্করিণীটি। যখন কেবলি বৃষ্টি হয়, তখন পাড়ে আর জলে ব্যবধান থাকে না; একেবারে ছাপিয়ে ওঠে। তখন সবুজ মাঠের গায়ে-গায়ে ইস্পাত-ধূসর জল, কিম্বা কালিদাস যাকে অসিশ্যাম বলেন, সেই বর্ণের জল কখনো কাঁপতে থাকে, কখনো স্থির হয়। তখন তাকে একখানি মার্জ্জিত ধাতব আয়নার মত দেখায়, একেবারে নিশ্চল। কিনারার গাছের আর আকাশের মেঘের ছায়া তার বুকের উপর এসে ঘেঁষাঘেষি করে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাতাস উঠ্‌লেই সব মাটি; জল সিউরে ওঠে, কাঁপে; দুল্‌তে থাকে, সব ছায়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়ে

যায়। আজ ক'দিন বৃষ্টি হয়নি ; তাই জলের উপরে তার পাড় মাথাকাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেকটা কালো মাটির, আর ফিকে সবুজ উলুঘাসের ছায়া স্থির হয়ে আছে ; পুকুরের কিনারায় জলের চারিপাশে দেখা যাচ্ছে, —কে যেন গিলেকরা কোরা ঢাকাই ধূসর জাজিমের চারিদিকে সবুজ মোটা মখমলের বোনা পাড় বসিয়ে দিয়েছে। আলো জাগ্‌ছে, ছায়া ঘুমিয়ে পড়েছে, পুকুরের আশে-পাশে মাঝে-মাঝে মাছ লাফিয়ে উঠে আবার ডুব দিচ্ছে। ছোট বৃত্তগুলি ক্রমে বাড়্‌তে বাড়্‌তে সমস্ত পুকুরের উপর ছড়িয়ে পড়্‌ছে। মাঝে-মাঝে আবার যখন ছোট গুণি-গুণি বৃষ্টি পড়ছে, তখন মনে হচ্ছে জলের পাতলা জমিতে কে যেন কালো-কালো বুঁটি বসিয়ে দিয়ে গেল।

এর পরে হাত-দশেক আবার সেই ময়ূরকণ্ঠী ঘাস ; তারপর আমার বারান্দা। এই ত আমার দৃশ্য-জগৎ। এরি মধ্যে দিয়ে আমি যে অদৃশ্য অসীমে প্রবেশ করি, তার কথা ভাষা দিয়ে বলা কঠিন। কতই দেখি, আর কতই ভাবি। এতটুকুখানি মন দিয়ে যেমন বিশ্ব-সংসার জানা যায়, এও তেমনি সামান্য একটি দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-ব্যাপার আয়ত্ত করবার চেষ্টা। চোখ যা দেখে, মন তার অর্থ করে। চোখ দেখে বস্তু, মন তাতে ভাব-যোজনা করে। দৃশ্যে-অদৃশ্যে, বাক্যে আর অনির্ব্বচনীয়ে এক হয়ে অনন্তের সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২২

পর্য্যায়

নারীসুলভ অপচয়ের অপ্রবৃত্তি আমাকে এই পাতা কয়খানি ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত করলে। তা না হলে নূতন বৎসরে হাল-খাতা খোলাই সনাতন প্রথা। কিন্তু তাও ঠিক নয়,—নূতন আর পুরাতনের মধ্যে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না ত, তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থাব আবশ্যক হয় না! পুরাতন যে পদ লিখে আস্‌ছিল তাতে "সেমিকোলন" দিয়েছে, "ফুল-ষ্টপ" নয় ; তাই জের টেনেই চলেছি। নূতন কখনো আসে কি ? কালের চিরন্তন গ্রন্থে, ঋতু-পর্য্যায়ের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, সেই পুরাতনেরি পুনরাবৃত্তি চলে। যে ছন্দ, যে গাথা, যে গীত ও গীতিকা আমরা পড়ে আসি, তার কত কথা এক-পাতায় সমাপ্ত না হয়ে অন্য খানিতে এসে পড়ে, আমরা একটানা পড়েই চলি ;—শেষ কোথায় ? কালের এই ঋক-সাম-যজু-অথর্ব্ব, এই দর্শন আর গান, নিবেদন আর উৎসর্গ আমরা গ্রীস্মের তীব্র আলোকে, বসন্তের গানে, বর্ষার বৃষ্টিধারায় ও মেঘধূমে, বিদ্যুতের হোমশিখায়, আর শরতের স্বর্ণ ধান্যসম্ভারে দেখতে পাই। গ্রীষ্ম পঞ্চতপার উগ্র আলোকে আমাদের মনে ঋক-মন্ত্রের উদ্বোধন করে, আমরা তখন কেবলি দ্রষ্টা হই। আকাশের নীলিমা অজস্র আলোয় উদ্ভাসিত, অপার দৃষ্টিতে পূর্ণ, দীর্ঘদিনের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে শ্যামা বসুন্ধরার নিষ্পলকনেত্রে অন্তবিহীন দর্শনের সাধনা চলে, আর জলধির আলোকউদ্দীপ্ত অক্ষৌহিণী ঊর্ম্মিমালা অশেষ ছন্দে অবিরত ঋক-মন্ত্র উচ্চারণ করতে

থাকে। বসন্তে তরু-লতার আন্দোলন, নিরন্তর ছন্দোগতি, আমাদের মনে সুরের আনন্দ সঞ্চার করে, দ্বিজ-সম্প্রদায় সাম-গাথায় ঋতুরাজের আহ্বান গায়, সঙ্গীতের সঙ্গ-সুখে চরাচরের মন পরিপূর্ণ করে। বর্ষায় দেখি, নিখিল বিশ্ব যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করলে ; জলধি তার ধূপ-বাষ্প আকাশে প্রেরণ করে, দৈবী আলোক তাতে বিদ্যুতের উদ্দীপনা সঞ্চার করে, প্রচুর ধারা-বর্ষণের সূচনা হয়,—সে আমাদের যজ্ঞফল, দেবতার প্রসাদ। আর শরতে কর্ম্মফলের নিবেদন,—দেবোদ্দেশে বর্ষের অন্তিমে নবান্নের ব্যবস্থা, অগ্রহায়ণের প্রারম্ভ !

এই চারি বেদের আচার-বিধি আমাদের জীবনের কাল-ভেদেও দেখতে পাই। শৈশবে আমরা সামবেদী, তখন গানের উপরেই থাকি, ছন্দের উদ্বেলিত গতিতে আমরা চলি, উদাত্ত-অনুদাত্তের উদার-পাদক্ষেপে তরঙ্গগতিতে অগ্রসর হই, উত্থান-পতনের উপদ্রবে বারম্বার প্রবুদ্ধ হতে থাকি। যৌবনে আমরা ঋকদ্রষ্টা ঋষি, তাই বলে মুনি নই। কতই দেখি আর কতই দেখার আশায় উৎফুল্ল ! নবীন চেতনার জাগরণে আমাদের নয়ন-মনে নূতন দৃষ্টি খুলে যায়, দেখি আর দেখাই ! এ ঋক রচনায় নরনারী উভয়েরি সমান অধিকার ! কি আনন্দেরি সেই জাগরণ ! আকাশ, ধরণী, আলোক আর ছায়া, পত্র পুষ্প তৃণবল্লরী সবাই আপনাদের বুক অবারিত করে দিয়ে ভাল করে দেখে নেবার জন্যে, আমাদের কেবলি ডাকে ! তখন আমাদের চোখে যে অঞ্জন আনন্দ-রেখা টেনে দেয়, তার উপকরণ পোড়ান ঘৃতের কালো কালি নয়,—সোনা-গলান তরল আলো ! সে দৃষ্টিতে অদৃষ্টদেবী এসে পরশমণি বুলিয়ে দিয়ে যান, তাই যেখানেই তাকে ছোঁয়াই সেইখানেই সোনার স্বপন জেগে ওঠে। তারপর প্রৌঢ়ে আসে যজুর পালা,—নিবেদন আর আবেদন, মন্ত্রপাঠ আর তন্ত্র উদ্ভাবন ! যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখনি আমরা "দাও" আর "দাও"-এর বুলি আরম্ভ করি। যৌবন তার ভরা ভাণ্ডার হতে কেবলই দান করে, সে পূর্ণ : —তেজে দীপ্তিতে, কামনা আর বাসনার আবেগে পরিপূর্ণ ; অবারিত তার দানপ্রবৃত্তি, তখন আর সঞ্চয় করবার কথা মনেই আসে না। প্রবীণ হয়ে হিসাবের খাতা খুলি, ব্যয়ের বিধানে মনোনিবেশ হয়, আয়ের কথা মনে আসে। তখনি দেবতার কাছে প্রার্থনার পর্য্যায় আরম্ভ হয়। আমি তোমায় বলি দিয়েছি, তুমি আমায় ধন দাও। "ভার্য্যাং মনোরমাং" হতে কিই-বা আমরা না চেয়ে থাকি ? তারপরে শেষকালে জরার জড়তায় যখন আমরা স্থবির হতে চলেছি তখনই অথর্ব্বর সাধনা করি ! এই ত গেল অভ্রান্ত চতুর্ব্বেদবিধি চতুর্ব্বর্গ ফলের মূল !

নীতির দিক দিয়ে দেখলেও আমাদের এই জীবনের চারকাল চারটি নীতির বিধানেই চলে ! শৈশবে আমরা সামপন্থার পথিক। তখন সবাই সমান, ছোটবড় উঁচুনীচু ভদ্র ইতর কিছুই মানিনে। উদারনৈতিক আমরা অবাধ পথে, সমতলের রাজ্যে বিচরণ করি। যৌবন দান দিতে জানে ; প্রৌঢ় জানেন ভেদের কথা ভাল করে। শৈশবে যে অভেদ-বুদ্ধি ছিল, তা যৌবনের অভিজ্ঞতায়, "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—এই বিজ্ঞ বাক্যের ব্যর্থতায় ভেদজ্ঞানে পরিণত হয়। যা অভিন্ন ছিল, কালমাহাত্ম্যে দেখি তা

সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ; বৈরাগ্য এসে কাণে কাণে বলে, কা তব কান্তা ইত্যাদি ইত্যাদি ; বীতরাগ বানপ্রস্থের বন্দোবস্ত করতে বসে, সংসার অসার বোধ হয়, আর বেচারা বৃদ্ধ সাম দান, ভেদ সবেরেই দণ্ড ভোগ করে। সাম্য যখন বৈষম্যে পরিণত হয়, দান যখন ঋণের বিভীষিকায় বিব্রত ; ভেদ যখন ছেদন করতে বসে, তখন কালের দণ্ড, অঙ্কুশ আর কুঠার বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ পরিসরের মধ্যেই দণ্ডে দণ্ডে শক্ত ও প্রবল হয়ে এসে পড়ে ! ধূলিসাৎ হতে তার আর বিলম্ব হয় না। তার কুব্জ দেহ আর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ দণ্ডের অবলম্বনে বিচরণ করে : সে দরিদ্র তখন দণ্ডী। ১লা বৈশাখ ১৩২৩।

ভারতী, আষাঢ় ১৩২৩।

খোলা জানালায়

জানালা খুলে বসে আছি, তার নীচের ঝিলমিলগুলিও তোলা আছে। দেখতে পাচ্ছি সম্মুখের সবুজ মাঠ, তাও বারান্দার সিঁড়ির ব্যবধানে মাঝে মাঝে খণ্ডিত, ছোট ছোট গাছপালার হেলাদোলা, পাশের বাড়ীর ছাদের মাথা, দোতলার খোলা জানালার দুধারের দুই রং, একদিকে ধূসর অন্যদিকে সবুজ—ছাদের কার্ণিশ হতে তারি উপর আমাদের বাঙ্গালী বাড়ীর বিশেষ নিদর্শন, একখানি রাঙা-পেড়ে গঙ্গাজলী ডুরে শাড়ী কেবলি উড়ে এসে পড়ছে, নেতিয়ে পড়ে, উঠে আবার উড়ছে, কখনো তার ভঙ্গী উদ্যত—২ ণ; ফণিনীর মতো ইঙ্গিতে গৃহিণীর অপ্রতিহত প্রভাব ব্যক্ত করছে।—আবার কখনো-বা বাতাসের তাড়নায় ঘূর্ণীপাকের মত কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে, সাদা আর রাঙার পাকে জড়িয়ে দড়ার মত হয়ে যাচ্ছে, তিনি যে এই সংসারে মায়ার কি নাগপাশে জড়িয়ে আছেন, তাই যেন জানাচ্ছে। আরো দূরে দেখতে পাচ্ছি বড় বড় উঁচু গাছের মাথা, কোনটি ছত্রাকার, কোনটি ফোয়ারার উচ্ছ্বাসের মত উপরে উঠে, নীচের দিকে গোল হয়ে ঘিরে ঝরে পড়ছে। একটি আমগাছের মাথার আতপত্রে নূতন সবুজ আর কচি রাঙা পাতার বাহার ! তারি পাশে অশ্বত্থগাছে অসংখ্য পাতা, সবে গজিয়েছে, কচি দূর্ব্বার মত একটুখানি পীতাভ হরিত : তারা কেবলি নাচছে ! ছোটছেলে পা-জড় করে যেমন লাফিয়ে ওঠে, কিম্বা কলের পুতুলের কল টিপলে সে যেমন চট করে চোখ খোলে, তেম্নি হঠাৎ গতি, এ পাতা যখন উল্টে পড়ে তখন সেই পুতুলের খোলা চোখের মত চকিত সাদা দেখা যায় ! তারপর মস্ত একটা গাছের মাথা, তার পাতার চুলের উড়ে-পড়া, দোলা, ছড়িয়ে যাওয়া, কিছুই ভিন্ন করে দেখতে পাচ্ছিনে, সব নেপ্‌টে আছে, আমাদের হাল-ফেশানের "পাতা-কাটা" কেশ-সজ্জার মত : —একটি বড় ডাল এ ধারে ও ধারে ধীরে ধীরে দুলছে, কে-যেন বড় লজ্জা করে ঘাড় নাড়াচ্ছে, বলছে "না, না, দোহাই তোমার" !

এর পরই পৃথিবীর সম্পর্ক ঘুচল, শুধু আকাশ দেখতে পাচ্ছি, মেঘে মেঘে ছয়লাপ ; নীল যে কোথায় ছিল তার আর কোন নাগালই পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই ধূসর মেঘগুলির রং গাদা-করা ছাইএর ঢিপির মত নয়, এর মধ্যে বেশ একটু তেজ আছে,

ইস্‌পাতের মত, তীক্ষ্ণ আলোর সম্ভাবনা সঙ্গোপণে পোষণ করে রেখেছে! দিগন্তের নুয়ে-পড়া অংশ বেয়ে মেঘ কেবলি উঠে আস্‌ছে, রাশি রাশি, সারি সারি, ধূসর আর ধবল। কখনো আবার বাতাসের প্রবল আবেগে একেবারে সব পরদা উড়ে উঠছে, তখনই আকাশের সুনীল চোখের স্বচ্ছ চাহনি আর তারি উপর আলোর হাসি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই আলোর লীলা, খোলা চোখের চাহনি চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে, ধূসরের পরদা সরসরিয়ে নেমে আসছে ; আলোর আশা গেলেও তার স্মৃতিটুকু ত ফুরোচ্ছে না। একটি চিল আবর্ত্তের মত ঘুরতে-ঘুরতে শূন্যপথের অবর্ত্তমান আশ্রয়ের প্রত্যাশায় উঠছে, কেবলি উঠছে। ডানাদুটি তার যতদূর-সম্ভব সটান করে ছড়িয়ে দিয়েছে, আগ্রহের আর অন্ত নাই, কিন্তু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষ যখন আর দেখতে পাবে না, তখন তার নেমে-আসা, নিঃশেষিত-আলো উল্কাপিণ্ডের খসে-পড়ার মতই হবে। কাক কখনো একা, কখনো সঙ্গীর সঙ্গে উড়ে চলেছে, উপরের দিকে নয়, কখনো পূর্ব্ব হতে পশ্চিমে, কখনো-বা উত্তর হতে দক্ষিণে, বাতাসের সমুদ্রের বুকে সাঁতার দিয়ে চলেছে, তাদের পাখার আন্দোলন হাতছানি দিয়ে আহ্বান-সঙ্কেতের মত! তারা পৃথিবীর গাছপালার মাথার উপরে খুব যে বেশীদূর ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা নয়, উড়ছে আবার গাছের আগায় এসে বসে পড়ছে! এদের কাক-চক্ষু আকাশের নীলে ভরা, কিন্তু সে দৃষ্টি পৃথিবীর মুখের দিকেই সন্নত ; আর ঐ চিলের চক্ষুদুটি আগুনের পিঙ্গল স্ফুলিঙ্গের মত,—উড়ে ওঠা আর খসে পড়াই যার ব্যবসায়। ভূঁয়ে-চরা পাখীদের আজ খবর নাই, তারা আকাশের ভাবগতিক, গম্ভীর দৃষ্টি, বাতাসের পালাই-পালাই ভঙ্গী, এলোমেলো চলাফেরা, আর পৃথিবীর অন্ধকার মুখ দেখে, ঘর ছেড়ে বেরোনটা উচিত মনে করেনি। চটুল চড়াই ছাদের কার্ণিশের নীচে হতে, বারান্দার কোণার বাসা হতে চট করে এক-একবার নেমে, কিছু খুঁটে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তবু কিন্তু কোকিলের ডাকের বিরাম নাই, সেই রাঙা-আঁখি বিরহী পাখীটির পক্ষে কি আলো-করা, কি মেঘলা দিন দুইই সমান। তার মনের চিরক্রন্দন তো কিছুতেই শান্তি মানতে চায়-না। বাতাস গাছপালার পাতায় পাতায় যে মর্ম্মরধ্বনি সঞ্চার করে যাচ্ছে, তা'ও অফুরাণ। পৃথিবীর বুকে শিকড়ের শিকল দিয়ে বাঁধা এই যে স্থাবর, এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গুলির সব ভঙ্গিমাই, হাওয়ায় উড়ে-চলা পতঙ্গ, পাখী আর মেঘের মত! পরাধীন শৃঙ্খলায়ত্তের মনের মধ্যে ছাড়া পাবার, স্বৈর বিচরণের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—অভিশপ্তের অকাল মুক্তি-প্রয়াসের মত, কেবলি ব্যর্থ হাহাকারে আর নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাকে ব্যক্ত করছে!

এতক্ষণ যে মেঘমালা কেবলি উড়ে উঠছিল, এখন তারা স্থির হয়ে আপনাদের স্তূপে আর স্তম্ভে পরিণত করেছে, বাতাস তাদের আর টলাতে পারছে না। তাদের দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণী মনে করতে বাধা নাই, বিদ্যুৎ হঠাৎ চমকে উঠে তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি দিয়ে চিরে চিরে ফাটল ফুটিয়ে দিয়ে গেল, সেখানে ফাঁকে ফাঁকে ধূসরের নিবিড়তা লঘু হয়ে এল, মনে হচ্ছে বহুদূর হতে পাহাড়ের গা বেয়ে ক্ষীণ জলধারা বয়ে আসছে ; গিরিরাজের স্বর্ণ উপবীতের মত!

মেঘ উড়ে চলে বটে কিন্তু একা থাক্‌তে চায়-না, যেখানেই একজনের দেখা পাওয়া গেল, অম্নি সঙ্গে-সঙ্গে আরো দশজন এসে জমে যায়, এরা গলাগলি করে চলে, এদের মধ্যে বড়-একটি উদার হৃদ্যতার ভাব আছে, কোন ব্যবধানই রাখে না, মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়, পাখীরাও ঝাঁক বেঁধে একত্রে উড়ে চলে বটে, কিন্তু তাদের ডানার ব্যবধান এক হতে দেয় না। এদের বাষ্পের ডানা স্পর্শমাত্রে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, কোন বাধাই রাখে না, এমন-কি আকারেরও নয়, যার সঙ্গে মিল্‌তে চায় তার সঙ্গে শুধু অর্দ্ধাঙ্গ নয়, একেবারে সর্ব্বাঙ্গে অভিন্ন হয়। জানি, মেঘ আকাশের পথেই, বাতাসে ভর করে উড়ে আসে, তবু যখন দূর দিগ্বলয়ের সীমা হতে তাদের আস্‌তে দেখি, তখন বোধ হয় কোন অতল ফুঁড়েই উঠে আস্‌ছে—এরা যে সমুদ্রের বাষ্প হ'তে জন্মগ্রহণ করেছে সেইটি আভাষে প্রকাশ করে বোধ হয়। আকাশ-লোকের এই কামচারীদের কখনোই নিঃসঙ্গ দেখা যায় না, তাই শরতের বারিহীন, শুভ্র, লঘু, একক, এক-একখানি মেঘকে অপার আলো আর অন্তহীন নীলিমার বুকে ভেসে যেতে দেখেও কেমন দুঃখ হয়। অমন আনন্দের মধ্যেও সে যেন উদাস হয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে চলে।

স্তম্ভ আর স্তূপ দাঁড়ায় না, বাতাসের বার বার ঠেলা পেয়ে টলতে আরম্ভ করেছে—ভেঙে পড়ে আর-কি! এরা যদি ইষ্টক প্রস্তরের নির্ম্মাণ হত, তাহলে চারিদিক ছেয়ে চূণ-বালির ধূসর রাবিশ ঝরতে আরম্ভ করত, কিন্তু এরা যে বাতাসের আবেগে উড়ে-আসা বাষ্পের প্রয়াস, উত্তাপের অভিমান, যখন ভাঙন ধরল তখন চারি ধারে বৃষ্টিধারার বর্ষণ আরম্ভ হল, সব যে ঝাপসা হয়ে এল, এ অশ্রুজলের অভিযান আমার খোলা জানালা দিয়ে, ছোট্ট ঘরখানির ভিতর প্লাবন বহিয়ে দিলে। আর তো স্থির হয়ে বসে ছবি-আঁকা সম্ভব নয়, বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা কওয়াও বন্ধ হল, সেই সঙ্গে সব দুয়ার-জানালা রুদ্ধ করে অন্ধকারের অধিকার প্রচার হয়ে গেল; অতএব দেখাও শেষ!

ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৩

মনের কথা

মন জিনিসটাকে ঠিক্ ধরা-ছোঁয়া যায় না, সে এই এক বলে আবার ক্ষণকাল যেতে-না-যেতে অন্য সুর সুরু করে। বাতাসের মত স্পর্শে অস্তিত্ব জানায়, তাই তার রহস্য নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য,—চোখে দেখে, বুঝে-পড়ে নেবার সুযোগ তো পাওয়া যায় না। আভাসে যে প্রকাশ করে, তার কথা, ভাষায় ব্যক্ত করা ভারি দুরূহ;—বুঝেছি বুঝেছি মনে হতে-না-হতে হঠাৎ দিক্ পরিবর্ত্তন হয়, যে বার্ত্তা বয়ে আসছিল সব কোথায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাতাসকে জীবনী-শক্তি পূর্ণ করতে হলে তাকে স্বাধীনতা দিতে হয়, আবদ্ধ বাতাস ব্যাধিবীজের আকর; মনকেও তাই বাঁধলে চলে না. তাকে ছাড়া দিতেই হয়, কিন্তু তার গতি নিয়মিত করে সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে পারা চাই; তবেই তার অদৃশ্য প্রবাহ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অবারিত হয়।

মন যা দেখে তা চোখে দেখার চেয়ে ভালো আর সত্যিকার দেখা। উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা নেশার খেয়ালের মত, সেটা আধঘুমের স্বপ্নের মত বিক্ষিপ্ত, তার পরম্পরাগত সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু মনের অণু ও দূরবীক্ষণে যা দেখা যায় তার মধ্যে বিষমতা নেই। সে ঠিক একটি নিয়ম-সূত্র ধরে চলে। অতীত এবং আগতের কারণ সমবায়ে ভবিষ্যতের আকার ধারণা করে। যা গিয়েছে এবং যা সমুপস্থিত তা হতেই যা আসবে তা বুঝতে পারা যায়।

এই একটা কথা মনে হচ্ছিল, মানুষ যখন বড় কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, তখনই তারা ভিন্ন হয়ে পড়ে, নানা-রকমের আড়াল তাদের মধ্যে এসে পড়ে। আকাশ আর পৃথিবী যেখানে ঘেঁষাঘেষি করে আছে, সেইখানেই তাদের রঙের আড়ালে তারা ব্যবহিত, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যেখানে তারা দূরে, সেইখানেই তাদের আড়াল দূর হয়ে গেছে, আকারের আর বর্ণের তারতম্য তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ রচনা করতে পারছে না,—তারা বাতাসের বুকে একেবারে অভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে মিশে গেছে। আকাশ তো যথার্থ পৃথিবী হতে দূর নয়, তার শূন্যতাই উভয়ের মিলনক্ষেত্র, তবু ঐ যে নীল আর এই যে সবুজ—এই যেন তাদের ভিন্ন করে রেখেছে। যেখানেই একটা আকার গড়ে ওঠে, বর্ণের তারতম্য বোধ জন্মায়, সেইখানেই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সপ্তবর্ণ যখন আপন আপন মূর্ত্তি ধারণ করে দাঁড়ায়, তখনি তাদের জাতি বর্ণের ভেদ আমরা দেখ্‌তে পাই, তখনই বিচার করে তাদের বর্ণনা করি। কিন্তু যখনি আলোকের প্রেরণায় সব পার্থক্য পরিহার করে, মিলেমিশে নিরাময় শুভ্রতায় পরিণত হয়, তখনি সে নির্ব্বিকার, একবর্ণের ; —আর কোন বর্ণনাই খুঁজে পাওয়া যায় না। দূরতাই এই বর্ণ-ভেদ দূর করে, বৈচিত্র্যকে এক করে, বিচ্ছেদে মিলনের সম্পূর্ণতা এনে দেয়, এই জন্যই বোধ হয় প্রণয়ী বিরহের দিনে অধিক করে এই বিশ্ব, প্রিয়জনে তন্ময় দেখেন।

কিছু লাভ করতে হলে দেখছি, এক জোর করে আঁকড়ে ধরতে হয়, নয়তো মুঠো আল্‌গা করে একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়। এক হাতের পাওয়া, আর-এক পাওয়া মনের। হাতের পাওয়াটাও কতক মনেরও পাওয়া এ-কথা ঠিক্ কিন্তু যেটি একেবারে মনের পাওয়া, তার সঙ্গে হাতে পাবার কোন সম্পর্কই নেই। হাতে পাওয়া জিনিস হারিয়ে গেলেই গেল, কিন্তু মনে পাওয়া জিনিসের হারানো নাই। সে একেবারে আমাদের প্রাণের মতই,—যুগ যুগান্তের জন্মজন্মান্তের সঞ্চয়,—রয়েই গেল, নষ্ট হল না। সহসা দেখ্‌লে কিম্বা ভাবলে মনে হয় দুঃখ-কষ্টে কিছুই পাওয়া গেল না, বরং লব্ধ দ্রব্য হারিয়েই গেল, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে হারিয়ে-যাওয়া অনেক সময় কি পাওয়ারই সামিল নয় ? কেন না যে দ্রব্যটি আমার কাছে ছিল, অথচ তার মূল্যজ্ঞান আমার মনে ছিল না, ততক্ষণ যথার্থ আমি তা লাভ করিনি। হারিয়ে যখন তার অভাব বোধ হল, যখন তার মূল্য জ্ঞান আমার মনে জন্মাল, তখনি আমি তা পেলাম। বর্ব্বর

যে হীরক পেয়েও তাকে কাচ-খণ্ড জ্ঞান করে, সে হীরক তার করতলগত হয়েও সে তা পায়নি। কিন্তু যে জহুরি তার মূল্য জানে, হীরকখানিকে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে না পারলেও, সেই বেশী করে তাকে পেয়েছে বল্‌তে হবে। মূল্য-জ্ঞানও থাকে, অধিকারও জন্মায়, আকাঙ্ক্ষার সামগ্রীটি স্বায়ত্ত হয়, তবে ত সোণায় সোহাগা! এ দুর্লভ সৌভাগ্য তো বড় একটা ঘটতে দেখি না। যে যা পেয়েছে সে তার মূল্য বোঝেনি, ধূলিসাৎ করে তাকে তুচ্ছ করেছে, আর যে পায়নি সে তাকে কামনা করাই সৌভাগ্য জ্ঞান করেছে। বানরের গলায় মুক্তার হার, বেনা বনে মুক্তা ছড়াছড়ি সচরাচর না হলেও, অনেক সময় যে হয়, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" দেখে শেখা নয়, ঠেকে শেখা এ-কথাটি বড়ই সত্য। ত্রিশঙ্কুর মত মধ্য-পথে দোলায়মান অবস্থা বড় অসহ্য, অত্যন্ত অসম্ভব। এ জীবনও নয়, একে মৃত্যুও বলা যায় না। বাঁচতে হলেও শক্তি চাই, মরবারও ক্ষমতা দরকার। মানুষ শরীরকে মারতে পারে, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে আত্মাকে হারানো যেতে পারে, কিন্তু মারা অসম্ভব, কেন না সে স্বতঃই অমর। দুর্ব্বলতা কি অনবধানতাবশতঃ এই আত্মাকে যদি হারিয়েই ফেলা যায়, তবুও বলের সঙ্গে, অধ্যবসায়ের গুণে, সতর্ক জাগ্রৎ মনে অনুসন্ধান করে, তাকে ফিরে পেতে পারি; কেন না এই আত্মা লভ্য।

মানবের বর্ব্বর হতে সুসভ্য অবস্থা পর্য্যন্ত এতাবৎ কাল ধারাবাহিকরূপে, এই আত্মাকে লাভ করবার জন্যে একটি অহেতুকী স্পৃহা আর অবিরাম চেষ্টা চলে আস্‌ছেই। একটিমাত্র জীবনে, এই কামনার পরিতৃপ্তি, এই সাধনার সিদ্ধিলাভ হয়ত হয় না, কিন্তু যার মনে এই কামনার উদ্বোধন হয়েছে, জন্মে-জন্মে সেই মানবমন একে প্রবলতর করে নিয়ে জন্মায়, তার পর একদিন জীবাত্মা সাধনার শক্তিতে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়, আর সেই হচ্ছে পরিনির্ব্বাণ। মানুষ মৃত্যুর পর প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে কি নরকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তারা বিশ্বব্যাপারের আর কোন কাজেই আসে না—এ-কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না। জন্মে-জন্মে মানবাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মভোগের ক্ষয় সাধন করে, ক্রমেই বাসনাবর্জ্জিত লঘুগতিতে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, এই ত সুযুক্তিসঙ্গত, সরল বিশ্বাস-অনুগত বলে মনে হয়।

অজ্ঞানকৃত অপরাধের শাস্তি, জ্ঞানকৃত দোষের শাসনের চেয়ে যে কিছু কম হয়, তা নয়। ছোট ছেলে জানে না যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, জ্বালা করে, কত রকমের কষ্ট হয়। কিন্তু তা হলেও যন্ত্রণা তাকে সমানই ভোগ করতে হয়, সে একেবারে অবাক হয়ে যায় কেমন করে এমন নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান হ'ল! জ্ঞানকৃত দোষের এইটুকু আশ্বাস, যে দোষী সে জানে—শাস্তি তার অকারণ হয়নি। ছোট ছেলে ঠেকে শেখে আগুনে হাত দিলে পুড়বে, কষ্ট ভোগ করতে হবে, এ জ্ঞানলাভ হবার পর সে আপনাকে

বাঁচিয়ে চলে। কিন্তু মানসিক আগুনে হাত দেবার শাস্তি অবিলম্বে আসে না বলেই মানুষ এ বিষয়ে অত সাবধান কিম্বা সতর্ক নয়। আগুন যে জ্বালা সঞ্চার করে, তা প্রায় সকলের ভাগ্যেই সমান-ভাবে আসে। কিন্তু মানসিক শাস্তির আইনের ঠিক্ নেই,—এর মাপকাঠি সমান নয়। একই দোষে কেউ বা খুনি-আসামীর শাস্তি পায়,—হয় মৃত্যু, নয় দ্বীপান্তর ; আবার কারো-বা কিছুই হয় না। ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা বলে, একজন দিব্যি মনের সুখে কাল কাটায়, বরং এই মিথ্যা বলাটা তার বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞানে গর্ব্বই করে থাকে ; আবার অন্য জন ইঙ্গিতে কোন মিথ্যা প্রকাশ করে অনুশোচনায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বসে। বিবেক-বুদ্ধির এতখানি প্রশ্রয় দুঃখের হয়েও সুখের। সংসারে দশজনের মত না হ'তে পারলে, অর্থাৎ মাত্রা-জ্ঞান যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয় তবে অপরের সঙ্গে হিসাব পরিস্কার করা ঘটে ওঠে না। দশের পৃথিবীতে সাধারণ ভাবে না চল্‌তে পারলে আরাম না হতে পারে, দুঃখ ঘটাও অসম্ভব নয়, তাহ'লেও আবার অপূর্ব্ব সুখেরও সঞ্চয় করা যায় কিন্তু। আমার মনের দুঃখ যেমন কেউ ভাগ করে নিতে পারে না, আমার মনের সুখও তেমনি কেড়ে নেবার সাধ্য কারো নেই। দুঃখ ঘটে কেন ? না, মনের আদর্শের সঙ্গে মিল রেখে নিজেকে চালনা করতে পারিনা তাই। অথচ যে আদর্শ মনে আসন-পেতে বসে আছে, সে এমনি জীবন্ত, জাগ্রৎ, উজ্জ্বল, প্রবল, যে সে কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয় ! ভালো মায়ের মত সে কোন অন্যায় আবদারই শোনে না, তা তুমি যত কেন মাথা-কুটে আপসা-আপসি করনা ! তোমাকে তোমার বায়না ছাড়তেই হয়, কেঁদে চোখ ফুলিয়ে, মুখ ভার করে, যেমনই হও না, তোমায় বলতে হয়—"আমায় ক্ষমা কর, আর অমন করব না, আমায় তুমি ভালবাস !" কেননা আদর্শ যদি থাকে, তার সঙ্গ-ছাড়া হ'লে তোমার চলে না, তার স্নেহদৃষ্টি ভিন্ন তুমি এক পাও এগোতে পারনা। মানুষ নিজের মনের দরবারে ছাড়পত্র না পেলে মোটেই পথ চল্‌তে পারে না। নিজের মনের আদর্শের মত এমন বন্ধু, এমন সঙ্গী, এমন নেতা, এমন নিত্যসহায়, সে আর কোথায় পাবে ?

ভালো হতে হ'লে কি এতও নিষ্ঠুর হতে হয় ! প্রথম-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন, এ নির্ম্মমতা অপরের উপরে। তাতো নয়,—এ বিরাগ নিজের মিথ্যার প্রতি। প্রবল শক্তি সঞ্চয় না করতে পারলে যথার্থ দয়ার অবসর হয় না। যেটি ভালো, শুভ, কল্যাণ বলে মনে হয়, সেটি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য, যে পরিমাণ দৃঢ়তা আবশ্যক, তাকে কত-সময় অনর্থক মনে হয় ; মন বলে—এতটুকু দিলে ক্ষতি আর কি হ'ত ! সমস্ত মন ব্যথায় ভরে ওঠে ; কিন্তু মনের মধ্যে যে মাতা বসে আছেন, তাঁর তুলাদণ্ডকে ফাঁকি দেবার যো নেই, সেখানে একতিল কমতি হলে চলে না—কাঁদতে কাঁদতেই পরিমাপ ঠিক করে দিতে হয়। রিক্ত, শূন্য, নিঃস্ব, দীন হয়েই ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানে বেরুতে হয়। এ দান কিন্তু কোনও প্রত্যাশার জের না রেখেই দিতে হয়।

ভারতী, ফাল্গুন ১৩২৩

বিচার-বিবেচনা

ভগবান সকলেরি বটে, তবে তিনি আবার প্রত্যেকেরি! প্রত্যেক সূতাটির উপর দৃষ্টি না দিলে, তাকে অখণ্ড না রাখলে— কিম্বা ছিঁড়ে গেলে গিঁট না দিলে, কাপড় যেমন সমগ্র হয় না, যে কাপড় বোনে সে যেমন প্রত্যেক সূতাটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে সমস্ত কাপড়খানি সম্পূর্ণ করে তোলে, ঈশ্বরকেও প্রতিটি মানবজীবনের সম্বন্ধে তাই করতে হয়। তিনি আমাকেও গড়েছেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও সৃষ্টি করেছেন সত্যি, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন কোনো বোঝাপড়া নেই যে, আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে, টুকরো-টুকরো করে, দলে পিষে তিনি শুধু ব্রহ্মাণ্ডেরি উপকার করবেন। আমার মন, আমার স্নেহবৃত্তি, আমার আত্মার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি যা-কিছু, তিনিই আমার মধ্যে দিয়েছেন, তার সবই ব্যর্থ করে দেবেন? মানুষের জীবনে যদি অকারণ দুঃখই দেখা যায়, অদ্ভুত ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সে যদি কেবলি বিধ্বস্ত হতেই থাকে, অথচ সবই বাহির হতে আসে—তার চেষ্টার সুদূরে গড়ে ওঠে—তাহলে কেমন করে স্বীকার করি বিশ্বব্যাপার করুণার সৃষ্টি, ন্যায়ের পরিচালনা? তাহলে যে পা রাখবার ঠাঁই কোথাও পাওয়া যায় না, ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরে মরতে হয়। যেমন দিনরাত্রি হাত-ধরাধরি করে আসে, দুঃখ সান্ত্বনা, বিপদ আর আশ্বাস, অসহ্য উত্তাপের পর বর্ষা, নিরন্তর বর্ষণের পর নিরাময় প্রসন্ন আকাশকে আসতেই হয়। দুর্দ্দিনের অবসানে আলো আসতেই হবে। এই ন্যায়ের তুলাদণ্ড দুলছে--কাঁটায়-কাঁটায় মাপ ঠিক হচ্ছে না, একে ঠিক হতেই হবে। বিশ্ববিধাতা আপন সত্যে আপনি বাঁধা। তিনিই আমাদের মনের মধ্যে মাপকাঠি রেখে দিয়েছেন, হিসাব ঠিক করে তাঁকে দিতেই হবে—তবে ত মন মেনে নেবে!

মনে যখন কোনো ভার থাকে না, আশা ও আলোর আশ্বাস জীবনের চারিদিকে, তখন একদিন দুদিন কেন, মাস বৎসরও দীর্ঘ সময় মনে হয় না। কিন্তু জীবন যখন দুঃখভারগ্রস্ত, প্রতিমুহূর্তেই অনিশ্চিত, সমস্তই অন্ধকার, প্রতিপদক্ষেপে যখন হাতড়ে চলতে হয় তখন একটি দিনও কত ভয়ানক দীর্ঘ মনে হয়। মনের মধ্যে দীর্ঘতার ভার ক্রমে বিপুল হয়ে ওঠে, সম্মুখে আর কিছু থাকে না! ফাঁসীর আসামী যেমন অবশিষ্ট দিন-কয়টা কোনো রকমে কাটায়, তেম্নি আর কি! প্রভেদ এই যে, সে নিশ্চিত জানে, তার শেষ কবে!

জীবনে সত্যের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়ানো বড় কঠিন ব্যাপার। সত্যি, সুখ দুঃখ স্নেহ বড় তীব্র, বড়ই তীক্ষ্ণ,—একেবারে মর্ম্মন্তুদ! শেল বিঁধেই আছে, বেদনায় সমস্ত জীবন জর্জ্জর হয়ে যাচ্ছে, তবু এ শেল তুলে নেবার কেউ নেই, এ ক্ষত-স্থানে প্রলেপ দেবার মত ঔষধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে পরমধনের জন্যে দেহমনের প্রত্যেক অণু-পরমাণু ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে, তাঁকে পেতে হবে, নয় ত মরতে হবে! প্রথমটি পরমানন্দ, তা যদি ঘটে তবে জীবনে সমস্ত দুঃখের পরিপূর্ণ প্রতিকার হয়ে উপরি পাওয়া যায়;

আর তা যদি না হয় তবে মৃত্যু ত পরামুক্তি—সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়, দিনের পর দিন এই দুর্ব্বহ ভার, অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে বন্ধুর পথ হাতড়ে, হুঁচট খেয়ে চলতে হয় না। তবে ত বিরাম, শান্তি, সুষুপ্তি।

কারো-কারো মনের মধ্যেকার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির কি গোল থাকে, কাছের সম্মুখের জিনিষ, বাক্য ও সঙ্গীত কেমন যেন ডিঙিয়ে চলে যায়। এ তার ইচ্ছাধীন নয়, হয়ে পড়ে ! কিছুতেই মনের শান্তি অর্জ্জন করিতে পারে না, কেবলি বোধ করে কি-একটা ত্রুটি রয়েই গেল ! তাই তাদের ভুলও খুব বড়, ভালও অত্যন্ত বেশী। ঠিক্ যত টুকু আর যেমনটি হলে সব বেশ সামঞ্জস্য করে নেওয়া যায়, তেমনটি তার কিছুতেই মনে ধরে না। একেবারে চরম চরমপন্থী ! তাই কেবলি কষ্ট পায়, প্রতিকার করতে পারে না। যে প্রদীপটি জ্বাললেই সব অন্ধকার ঘোচে, সে অপূর্ব্ব দীপ জ্বালা আর হয়ই না। তেল জোটে ত বর্ত্তি নাই ; বর্ত্তি জুটল, তবে যে দীপশলাকা দিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে, বুকের আঁচলে ঘিরে নিয়ে পথ চলবে, সেই আলো খুঁজেই পাচ্ছে না, পাওয়াই দুর্ঘট ! পাওয়া যে দৈবাধীন ! দেওয়া মানুষ নিজের সম্বল হ'তেই দিতে পারে।

তবে জীবনে দৈবই কি বলবত্তর ? যার উপর কোনোই হাত নাই, সেইখান হতেই কি নির্ম্মম আঘাত, অসহ্য বজ্রবেদনা এসে উপস্থিত হয় ? সেদিনে যে-কথাটি শুনেছিলাম সেটি খুব ঠিক ! ঈশ্বর, নির্ব্বোধ মায়ের মত, ছেলেকে শুধু সুখই যোগান্ না, কেবলি আমোদে রাখবার জন্যেই ব্যস্ত ন'ন ! মঙ্গলময় বলেই তিনি অত্যন্ত কঠোর, তাঁর দয়া যেমন অপার, তাঁর শাসনও তেমনি অমোঘ ! তবে ঐটুকু বোঝা কঠিন হয় যে মানুষের দুর্ব্বল শক্তির পক্ষে এমন দুরূহ প্রলোভনের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে তার পর যদি সে ভুলই করে, তখন তাকে এমনতর যন্ত্রণা কেন দেওয়া হয় ? সেই প্রলোভনই বড় ভয়ানক, যখন মন ঠিক কিছুই বুঝতে পারে না, যখন সরল পথ যে কোথায় তা মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায় না। দুঃখ দেখে তা দূর করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যা করে বসে, তা শুধু ভ্রান্তি ! তার ফলে অধিকতর দুঃখই যখন হয়, তখন সে অবাক হয়ে ভাবে, এ কি হল ? কেবলি অনুশোচনায় ক্লিষ্ট হতে থাকে, প্রতিকার আর তার শক্তিসামর্থ্যের মধ্যে থাকে না। যত ভাবা যায়, ততই মনে হয় দ্বিধা, দুর্ব্বলতাই মানুষের সব-চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। যে-মানুষ প্রবল নির্ভীকভাবে ভাল হক্ মন্দ হক্ যা তার প্রাণ চায়, তাই করে, তার যেন গতিমুক্তি আছে, সে আপনার চারিদিকের জাল ছিন্ন করে, সম্মুখের পথে চল্‌তে পারে। কিন্তু যে হতভাগ্য কেবলি দ্বিধায় আন্দোলিত, শুধুই যাব-কি-যাব না ভাবনায় এক পা অগ্রসর হতে পারে না, সে নিজের গতি করতে অক্ষম, অপরের উন্নতির বাধা। 'বেঁধে মারলে সয়' বলে একটা কথা আছে। সেটা ঠিক নয় ;—সয় না। ব্যথা বরং বেশীই হয়। তবু যার বাঁধনটুকু খোলবার উদ্যম পর্য্যন্ত নেই, তার পক্ষে ব্যথার বিধানই চরম বিধান ! যে পড়ে-পড়ে লাথি-গুঁতোই খাবে আর বলবে—ভগবানের ইচ্ছা, ভগবান তার সহায় হন না। যে উঠে দাঁড়াবার জন্যে উঠে বসে ;

তাকেই তিনি আপন হাত বাড়িয়ে দেন। মনোবৃত্তি যার সজাগ, সে খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, শুধু গোধূলির আলো-ছায়ার গোলকধাঁধাঁয় ঘুরপাক খেয়ে মরে না, সেই সৌভাগ্যবান। কারো-কারো মনশ্চক্ষু বোধ হয় অস্বাভাবিক,—কতক খুব ভাল দেখতে পায়, আবার কতক কিছুই দেখে না। দূরের অনেক জিনিস খুব পরিস্কারই দেখে আর ঠিক্ যেটি হাতের কাছে আছে, তাই হাতড়ে মরে।

ভেবে দেখলে এই কথাই ঠিক মনে হয়, এ পৃথিবী, Survival of the fittest—যোগ্যতমের স্থায়ীত্বের নিয়মেই চল্‌ছে। প্রবলের প্রাধান্যই স্বধর্ম্ম। সুস্থশরীর দীর্ঘজীবী, সুস্থমন কর্ম্মক্ষম,—আত্মরক্ষায় সমর্থ। উভয়েই প্রাণসার, ক্ষয়হানির সম্ভাবনা কম। যার এ দুয়েরি অসদ্ভাব, সে যে মৃত্যুক্ষতিগ্রস্ত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি!

অজ্ঞানই দুঃখের মূল কারণ। ছোট ছেলে জানে না, আগুনে হাত দিলে পুড়ে যায়। সে সুন্দর নির্ম্মল উজ্জ্বল বহ্নিশিখার আন্দোলিত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখে আনন্দে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। জ্বালা যন্ত্রণা ছাড়া আর-কিছুই সে তার হাতের মধ্যে পায় না। মারীচ, সোনার মায়াহরিণ, সীতার চিরদুঃখের সূচনা করেছিল—মায়ামৃগের চাতুরীতে প্রিয়-কণ্ঠস্বরের ব্যাকুল আহ্বানভ্রমে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণীও সুদীর্ঘ বিচ্ছেদদুঃখের আয়ত্তাধীন হয়েছিলেন।

পাপ পুণ্য কি? আমার মনে হয় অপরকে দুঃখ-দেওয়াই পাপ! যা আমরা জেনে-শুনে করি, ইচ্ছে-করে ফন্দি-করে অপরের মন্দ হবে জেনেও করি, সেইটে বেশী অন্যায়! মানুষ দ্বিধায় পড়ে যেটা করে,—কতকটা না বোঝবার দরুন, কতকটা অহঙ্কারবশতঃ ভ্রান্ত হয়ে,—তার শাস্তিও হওয়া দরকার, কিন্তু সে শাস্তি যেন একেবারে প্রাণ-মারা বিধান না হ'য়ে বসে!

ভুল কি,—না অনিয়ম! তাহলেই কেমন কষ্ট পেতে হয়, গতির বাধা ঘটে, স্থিতির স্থানচ্যুতি হয়, তাই দুঃখও এসে পড়ে। এ পৃথিবীতে সবাই সবাইকে বাঁচিয়ে চলবে এই হচ্ছে আসল কথা। কেমন-করে এই বাঁচানো ব্যাপার হতে পারে সেইটে বোঝা কঠিন। "চাচা আপন বাঁচা" করলেই কি সব কর্ত্তব্য পালন করা হয়? আঁচড়টি লাগল না, দিব্যি আরামে গায়ে ফুঁ দিয়ে চল্‌লাম, তবেই কি সব ভাল হল? ইংরাজীতে যাকে goody goody বলে তাই কি জীবনের আদর্শ? মানুষ এম্নিভাবে চারিদিক দিয়ে দশের সঙ্গে জড়িত যে একের মাথায় যে আঘাতটা পড়ে, সেটা অপরকেও বাজে। নিজেকে বাঁচাতে হলে অপরের জীবনে অনধিকার চর্চ্চা করা সঙ্গত নয়। নিজের দাবী-দাওয়া যদি গণ্ডী পেরিয়ে না যায় তবেই অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সাম্যরক্ষাই জীবনের মূলসূত্র। কিন্তু এটাও তো দেখতে পাই বিষমতাই অনেক স্থলে, মুক্তির, স্বাধীনতার সহায়। লোকে বলে golden mean—কিন্তু মধ্যপথ কতকগুলি বিষয়ের একেবারেই

নেই। সত্যের সঙ্গে সর্ত্ত করা চলে না, আর মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সত্যকে একেবারে সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে হয়,—রাজপুত-রমণীরা যেমন করে জহরব্রত পালন কর্ত্তেন। আর মিথ্যাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন না করলে গতি কোথায় ? খাঁটি কে খোঁজে ? রংচঙে মিথ্যা বড় চমৎকার, তাকে কতরকমে পাওয়া যায়,—একেবারে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু ! কিন্তু যার এ মোহ কেটে গিয়েছে, পরিস্কার আলোতে যে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছে, জীবন কি, তার পক্ষে এমন অবাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যে অসম্ভব ! যা অসম্ভব তা সম্ভব হয় না এই মস্ত ভরসা ! গতি মুক্তি হতেই হয়। মনের সম্মুখ হতে এক ছাড়া সবই মুছে যায়। সেই এককে, সত্যকে বরণ করতে হয়, তার জন্যে দুঃখকে গ্রহণ করতে হয়, তবেই জীবনের কোনো সাফল্য যদি আসে। তখন দ্বিধা, দো-মনা করার সময় থাকে না। ভগবান শুধু দুঃখই দেন, সে দুঃখও নিস্ফল—এ কখনো হয় না। জীবনের সন্ধিক্ষণের রহস্য নিরাকরণ হয়। দৃষ্টি আসে, শ্রবণ-শক্তি প্রখর হয়, লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আদেশ পরিস্কার শোনা যায়, জীবনের গতি আর কিছুতেই স্থগিত হয়ে থাকে না।

ভারতী, আষাঢ় ১৩২৪

কণিকা (২)

এক-একরকম দুঃখ আছে বৈরাগ্যের মত, সন্ধ্যার গেরুয়া আলোর মত শ্রান্ত ! তার মধ্যে কোন আগ্রহ কি চেষ্টা নাই। কিরণের দীপ্তি নিবু-নিবু করতে করতে একেবারে নিবে আসে, প্রখর তাপ দূর হয়ে চারিদিক ছায়ার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, চারিদিক নিঃশব্দ নির্জ্জন হয়, নিদ্রার গভীরতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী নিমগ্ন হয়ে যায়। চরাচর শান্তি লাভ করে, শ্রান্তির বিরাম হয়, সুষুপ্ত বিশ্ব নিশ্চেতন হয়ে পড়ে। হয়ত এ দুঃখের অবসানে, নূতন দিনের চেতনা ফিরে এসে আবার নবীন জীবনের সূচনা করতেও পারে !

কিন্তু আর-একরকম দুঃখ আছে যা, রাত্রি-শেষ প্রভাত-সূর্য্যের মত একেবারে প্রদীপ্ত অগ্নিবর্ণ। তার তপ্ত স্পর্শে সব জড়তা দূর হয়ে যায়—তপনের সহস্র রশ্মির মতই অজস্র আলোকের তীর তার বুকে গিয়ে বেঁধে, শ্রান্তি শান্তি স্বপ্ন সুপ্তি সমস্তই সমাপন করে। নিষ্ঠুর জাগরণের প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তহীন শব্দের কল্লোলে, অবিরাম গতির অবারিত দীপ্ত দৃষ্টির অশান্তিতে, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। চলা, ফেরা, দেখা, অবিরাম চেতনায় সমস্ত জীবন জ্বালাময় হয়। আকাশের সূর্য্যের সহস্র রশ্মি মনের অন্ধকারে অজস্র দৃষ্টি সঞ্চার করে, তাকে আকুল করে তোলে। মুহূর্ত্তের স্বস্তি থাকে না। এর অবসানে যে রাত্রির অন্ধকার আসে, সে মৃত্যুর মত অনন্ত শান্তির নিস্তব্ধতা এনে দেয়। প্রখর জ্বালা-যন্ত্রণার অশেষ গতির বিরাম হয়ে, চরম শান্তির পরম বৈরাগ্যের আবাহন করে। চেতনার এই একান্ত ব্যথাময় জাগরণ, এ জীবন্ত দুঃখ, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই এর নিবৃত্তি হয় না।

দুঃখের মত নির্ব্বাক কিছু আছে কি ! চোখের জলেও তার প্রকাশ হয় না, দুঃখ যখন বড়ই গভীর আর মর্ম্মন্তুদ হয়, তখন আহা-উহু, গেলাম, মলাম বল্‌তে পারা দূরে থাক, তার অসহ্য যন্ত্রণা হ্রাস করে একফোঁটা চোখের জলও যে ঝরে পড়ে না ! সমস্ত জীবনের সব রং পুড়ে খাক হয়ে যায়, মাথার চুল দুদিনে শাদা হয়ে ওঠে, সমস্ত শরীর একেবারে নুয়ে পড়ে, মূক মুখ আর খোলে না। যে বড় প্রিয়, যাকে অন্তরের আসনে বসিয়েছি, তার নাম কি কারো কাছে উচ্চারণ করা যায়, সে যে ইষ্টমন্ত্রের মত বড় পবিত্র, অন্তরেই জপ করতে হয়। ঐখানেও যদি আত্মবিস্মৃতি না আসে, ঐখানেও যদি জাহিরের ভাব আসে, সে তো বিলাস বৈ আর কিছু নয় ! রঙ্গালয়ের দুঃখের অভিনয়, ক্ষণিকের ভ্রান্তি ; তবে সেই যে অভিনয়ের দুঃখ, তাও সে সময়ের জন্য অন্তরে যথার্থরূপে অনুভব করতে হয়। নয় তো সেই যে মিথ্যার অভিনয় সে আরো মিথ্যা হয়ে পড়ে, ন্যাকামির মত দেখায়, দর্শকের মন স্পর্শ করতে পারে না ! গভীর দুঃখ, সত্য দুঃখ অন্তর সমাহিত হয়ে থাকে, তার বহির্বিকাশ নাই বলে সে মনের মধ্যকার সব মালিন্য পুড়িয়ে নিঃশেষ করে, সব খাদ মিটিয়ে শুধু খাঁটিটুকু বজায় রাখে। যেখানে আত্ম-সম্মানের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, সেখানে আর বাকী রইল কি ? কিছুই না, ফাঁকা, ভূয়ো হাঁক-ডাক !

চেতনা আসে বুকের মধ্যে আগুনের ছোরা, চোখের উপর বিদ্যুতের স্পর্শ ! ধূ ধূ করে সব আড়াল আবর্জ্জনা পুড়ে যায়, চোখের সামনে ঝাপসা কিছুই থাকে না- -তখন আর অন্ধকার গণ্ডীর মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকা চলে না, পথ চলতে হয়, সেবা করতে হয়। জীবনের এ অপূর্ব্ব সুন্দর ভাব-গ্রন্থের ভাষ্য নিজেই করে যেতে হয়। এই ধূলি, কাদা, ভূমিকম্প, দুর্দ্দিন দুর্ভিক্ষের পৃথিবী যেমন আকাশের করুণায়, ফলফুল তৃণপত্র ধনধান্যে অতুলন সুন্দর, তেমনি মানুষের এই দুঃখ-দুর্দ্দিন-সঙ্কুল, প্রলোভনে কন্টকাকীর্ণ, খণ্ডিত জীবনও ভাবের স্পর্শে অপূর্ব্ব মহিমাময় ! ত্যাগ ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু অপার শান্তি সন্ধ্যার অনুপম কান্তি নিয়ে জীবনে তখনই আসে, যখন আমরা স্বার্থের সীমা সঙ্কুচিত করে আনি !

ভয় ভরসা দুই একত্রে মনে জাগে ! পথ যখন হয়, চল্‌বার শক্তিও তখন আসে। কারো জীবনই ব্যর্থ হবার জন্য সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরি পরিণতি হয়ে থাকে : খানিকটা প্রাকৃতিক কারণ, কতকটা আবার অদৃশ্য দৈব শক্তির উপর নির্ভর করে। ফুল হতে ফল হয়, তবে ফলটি স্বাদে-গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, আকারে সর্ব্বাঙ্গে পরিপুষ্ট হতে হলে যেমন অনুকূল রোদ বাতাস বৃষ্টির উপর নির্ভর করে রাখে, তেমনি কৃষকের যত্ন চেষ্টা, সতর্কতারও অপেক্ষা রাখে। ফলটি দেখা দেওয়া দৈবানুগ্রহ, তাকে রক্ষা করা যত্ন-চেষ্টা-সাপেক্ষ, পুরুষকার ! বাহির হতে যা আসবার তা আসবেই, অন্তরের অনুকূলতা যেন কিছুতে নষ্ট না হয় !

কাজ কি ? সে তো আনন্দের অভিব্যক্তি, সদানন্দের লীলা ! এই যে এত বড় বিশ্বব্যাপার চলছে, জীবনের এই অবিরাম স্রোত এর মধ্যে কোন কষ্ট-চেষ্টা নাই। প্রাণে, আনন্দে আলোকে সঙ্গীতে, ছায়ায় অন্ধকারে, সুখ-দুঃখের ছন্দে উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ! এর ভাবের আর প্রকাশের, কাজের ও উদ্যমের একটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু মন যেখানে পড়ে মাথা কুটছে, সেখানে বাহিরে কি উৎসবের আয়োজন ক্ষীণ হস্ত করতে পারে ? বিরস মনে যে কাজই করা যাক্ না কেন সে দেবভোগ্য হয় না—মানুষের তাতে কোন উপকার হয় কি না বলা কঠিন, তবে দেবতা যে তা গ্রাহ্য করেন না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাই হাতের কাজ আর মুখের কথার সঙ্গে মনের ভাব, অন্তরের প্রীতি যোজনা করে দিতে হয়, প্রাণের প্রেরণা আনন্দকে সঙ্গী করে যখন যাত্রী হয়, কল্যাণ তখনই সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব লাভ করে।

আজকাল দেবদারুর পাকা ফল ঝরে পড়বার সময় কত লক্ষ লক্ষ ফল কেবলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে কয়টারই বা অঙ্কুর হতে পায় ? আর যার বা অঙ্কুর হয় তার মধ্যে কতগুলিই বা বাঁচতে পায় ? যেটি বেঁচে ওঠে সেটিরও পরিণতির দিকে কত বাধা, ছাগলে মুড়িয়ে খায়, অনাবশ্যক মনে হলে মালি এসে তাকে উপড়ে ফেলে। চারিদিকেই দেখতে পাই মৃত্যু-পরীক্ষায় যে জয়ী হয়, তারি পরিণতিলাভের আশা থাকে—কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর তাড়না চারিদিক হতে ঘিরে আসছে। আত্মরক্ষার চেয়ে আত্ম-নিবেদনই অধিক দেখা যায়। এই যে অসংখ্য মৃত্যু এ কোনো অমরতাকে আশ্রয় করে, কেননা স্থূল যা-কিছু প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়েও মরে না, তার প্রাণ-সার অলক্ষ্যে প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে থাকে। মানব-জীবনের পক্ষেও কি এই নিয়ম সত্য ? জীবনের এই বারম্বার দুঃখের মধ্যে মনে যা সঞ্চয় হয়, তা কি জন্ম-জন্মের সাথী হবে না ! এই স্বকৃত-সংগ্রহ এবং অপর-দত্ত জীবনের অভিজ্ঞতা এবং লাঞ্ছনা এ কোন ভাবে কার্য্য-কর হবে ? এত কথা ঠিক্ করে ভেবে নিষ্পত্তি করা কঠিন, তবে একটি জিনিসই শুধু সম্ভব,—ভাবনার বোঝা নামিয়ে ফেলা আর মনকে একেবারে খাঁটি করে বাহিরের কাজে তারি সঙ্গে মিল রেখে চলা !

আমার ভাবনা দিয়ে ভেবে ভেবে যখন সব রহস্য পরিষ্কার করে নিতে চাই, তখন কিছুই দেখতে পাইনে। যে সূক্ষ্ম তন্তুগুলি দিয়ে আমার দৃশ্য বস্তুরচনা করব, তার সূত্রগুলিই আমার চোখে পড়ে না, আমার হাতের আয়ত্তের মধ্যে আসে না। কিন্তু নিজে যখন ভাবনার অসাধ্যতা বুঝে হাল ছেড়ে দি, তুমি যখন আমায় বোঝাও তখনি আমি সব পরিষ্কার করে দেখতে পাই। আমার ভাবনা যেন ঐ আকাশের মেঘ, আমার স্বর্গকেও আচ্ছন্ন করে আছে, আবার বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে আমার পৃথিবীটাকেও আবছায়ায় ঢেকে দিচ্ছে। তোমার বিচার-শক্তি যেন ঐ আকাশের আলো, স্বচ্ছ অবারিত স্বতঃপ্রকাশ ! সে আপনাকেও যেমন দেখায়, আপনার চারিদিকটিকেও তেমনি উজ্জ্বল করে তোলে।

সেই আলো দিয়ে যখন দেখি, তখন সবই সহজ সরল পরিষ্কার হয়ে যায়।

তুমি যাকে পথ দেখাও তার কি আর মুখ ভার করে থাক্‌বার উপায় থাকে ? চারিদিকে যে হাসির ফোয়ারা খুলে যায়, আলোর জোয়ার ভেসে আসে ! আলোর তেজে জীবনের কোথাও কোন কালো ঠাঁই পায় না। বুকখানা এতখানি বেড়ে যায়, আর বুদ্ধি কেমন সহজেই সব মীমাংসা করে ফেলে ! সোজা পথটি চট্‌ করে বেরিয়ে যায় ! যাব কি যাব-না'র মিছে ভাবনা দূর হয়ে যায়। যাওয়ার পথ, আর না-যাওয়ার অপথ দুইই সুস্পষ্ট দেখা যায়। নিজের চোখ দিয়েই দেখি আর নিজের বুদ্ধি দিয়েই বিচার করি, আর দশজনে কি বল্‌বে—ভাল মনে করবে, না মন্দ বল্‌বে সে কথা মনেও আসে না। খুব নিঃস্বার্থ হতে হলে বড়ই স্বার্থপর হতে হয়, কেননা আমি কতটা ছাড়ব, আর কতটা ধরে থাক্‌ব, সে বিচার অন্যে কখনই করে দিতে পারে না, এ-বিষয়ে নিজের উপর নিতান্তই নির্ভর করে কর্ত্তব্য-বিচার করতে হয়। বিশ্ব শক্তির সঙ্গে যখন আমার ক্ষীণ শক্তিব মিলন হয়, আমার ইচ্ছা যখন কল্যাণময়ী পরমা ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করে, তখন আমি স্বাধীন হই। বাধা, বিপত্তি, বিঘ্ন তিরোহিত হয়, গতি-পথে কোন প্রতিবন্ধকই স্থায়ী হয় না !

স্বাধীনতা অবিবেকী নয়, অবিমৃষ্যকারিতার স্থান তার মধ্যে হয় না। স্বাধীন মনোবৃত্তি উদ্দাম নয়, সাবধান এবং সতর্ক। স্বাধীনতার গতি উল্কার মত কক্ষ-ভ্রষ্ট নয়, সে গতি গ্রহ-তারকার নিয়মিত সঞ্চরণ, অক্ষৌহিণী নক্ষত্র সবাই মুক্ত পথে চলেছে, উন্নতি, পরিণতি ও নিয়তির পথে যাত্রা, তার মধ্যে বিষমতা নাই বলেই তা বাধাহীন। উল্কার গতিতে ছুটে চলতে বাধা নাই সত্য, তবে তার শেষ সত্বরই হয়। অনন্তের পথে অবিরত যে চল্‌তে পারত, সে মধ্যপথে অকস্মাৎ দীপ্ত অঙ্গারের মত ভস্মীভূত হয়ে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে। তার আত্মঘাতী পরিণামে কারো কোন কল্যাণই সাধিত হয় না।

ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৪

'আঁধারে-আলোকে'

জাহাজ ছাড়ল। আজ অনেক আরোহী। আকাশ পরিস্কার সুন্দর, বিচিত্র বর্ণ-সমারোহে মহিমাময় ; প্রতিকূল স্রোত, অনুকূল বাতাস ; যাত্রা আরম্ভ হল। দুধারের দৃশ্য অধিকদূর পর্য্যন্ত আর নাছোড়-বান্দার মত সঙ্গ রাখতে পারলে না। কেননা যে নদী বেয়ে আমরা চলেছি, তার মত স্বৈর, সরীসৃপ-গতি-প্রবাহ আর কোথাও আছে কিনা জানিনে। দণ্ডে দণ্ডে পট-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এঁকেবেঁকে, প্রবল বলে জল কেটে দু-ভাগ করে, জোয়ারের জোরাল গতিতেও অপ্রতিহত হয়ে, আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলাম। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া, চারিদিকের নিস্তব্ধতা, জলের কল্লোল-সঙ্গীত, সমস্ত মনের মধ্যে উদাস প্রশান্তির সঞ্চার করলে।

রাখী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। মেঘ ভেদ করে পরিপূর্ণ চাঁদ দেখা দিল। আকাশে আলোকের প্লাবন ; জলের উপর রজত-আলো পড়ে আকাশের নীহারিকামালার মত একটি ছায়াপথ সৃজন করেছে। জাহাজের গতি-অনুসারে সে বাষ্প-শুভ্র পথ কখনো আমাদের সম্মুখে, আবার কখনো বা পিছনে পড়ে আছে। দুধারের সঞ্চরমান দৃশ্যের উপর চাঁদের আলো পড়ে সবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জলের উপর আলোর পথ উভয়-তীরকে সংযুক্ত করছে।

আজ যখন চেয়ে দেখলাম তখন সূর্য্যোদয় হয়েছে। সোণার আলোর উচ্ছ্বাসে আকাশের নীলিমার গায়ে, প্রবালের অশোক-রাঙা আভা দেখা যাচ্ছে—সাদা মেঘের উপর সোণার কিরণ পড়ে, তাকে নারাঙির রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে। আমার ঘর পশ্চিম-মুখো, তাই সূর্য্যোদয়ের আলোকের অভিনয় আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে, পশ্চিমের আকাশের মুখে তারি যে প্রতিভা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তাই আমি দেখি। সবুজ গাছপালা, দূর্ব্বায় ঢাকা মাঠ, আকাশের খণ্ডিত নীলের ব্যবধান পূর্ণ করে, দীপ্ত আলোক দ্রবিত স্বর্ণের মত ঝলমল করতে থাকে। সাদা আর ধূসর মেঘের মুখে, গেরুয়া আর হাল্কা বেগুনি কিম্বা হরিতাভ নীলের ঝালর ঝুলে পড়ে, ডালপালা দোলে, অসংখ্য পত্রাবলি বিচলিত হয়ে কত জল্পনাই করতে থাকে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—নূতন দিনের আবাহন, শুনতে পাই—সচেতন-করা আলোকে ঊষাকালের উদ্বোধন-মন্ত্র।

আজ সকালে সোণালি আলোতে চোখ মেলে জেগে ওঠা হয়নি, ভোরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। ধোঁয়াটে নিবিড় ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ, বৃষ্টি ঝরে ঝরে ক্রমে হাল্কা হয়ে এল। মনে হচ্ছিল আকাশ আড়াল করে অনেকগুলি ভিজে কাপড় টাঙান ছিল, এক-একখানি করে কেউ যেন সরিয়ে নিলে, আর সুনীল আকাশখানি প্রকাশ হয়ে পড়ল! এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না, আকাশ চুপচাপ, শ্রান্ত চোখে চেয়ে আছে। নীরব বর্ষণ আমায় বড় কাতর করে, মনে হয় সে যেন বড়ই দুঃখের কান্না!

কি সুন্দর সোণার আলোয় ঝলমল-করা এই সকালবেলা! খোলা জানালা দিয়ে দেখছি নীল আকাশের এই গলানো সোণার ধারা দূরে নিমগাছের হাল্কা-হলুদ পাতাগুলির স্তবকের উপর গড়িয়ে ঝরছে। দেখি আর ভাবি এই সোণার আলোয় হৃদয় আমার ভরে নিতে হবে। সত্যের প্রকাশে, মিথ্যার মরণে সব অন্ধকার চিরদিনের মত অন্তর্ধান হয়ে যাবে। সম্মুখের আলো-ভরা পথেই আমি চলব,—দিনের কিরণ সর্ব্বাঙ্গে বহন, আর দুটি অবারিত নেত্রপুটে ধারণ করে অচঞ্চল চিত্তেই চলব। রাত্রিও আমার কাছে অন্ধকারের বিভীষিকা আন্‌তে পারবে না,—তার আরত্রিক পাত্রে অনির্ব্বাণ অগণ্য তারকার দীপ্তি, অনন্তের পথে অভিনন্দন করে আগু বাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সম্মুখেই চলব—পিছু ফিরে আর চাইব না ; তার পর যেদিন স্নিগ্ধ ছায়ায় গোধূলির শুভ মুহূর্ত্তে

তুমি আমায় তোমার মন্দিরে স্থান দেবে সেদিন সমস্ত জ্বালাই নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে।

আলো দিয়ে তুমি যা লিখে দিয়েছ অন্ধকারে বসে-বসে তাই আমি পড়ছি। সে যে তোমার তারার আখরের লেখা অনির্ব্বাণ, অনির্ব্বাণ!

ক-দিন ধরে কেবলি বৃষ্টি ঝরে ঝরে আকাশের মেঘ অনেক হাল্কা হয়ে এসেছে, তবু সম্পূর্ণ সরে যায়নি! এই বাষ্পাকুল আকাশে আজ একটু রোদও দেখা দিয়েছে, তবে এ শরতের জ্বলজ্বলে সোণার আলো নয়, এর দীপ্তিও ম্লান, চোখের জলে ভরা দৃষ্টির উপর একটু হাসির চেষ্টার মত। তবু যে অনিবার ধারাবর্ষণের ঈষৎ বিশ্রামও রয়েছে, আর্দ্র আর্ত্ত বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কিছুক্ষণের জন্যে শান্ত হয়ে আছে, এই সংযত অবসরটুকু,—আলোর মুখে দরজা-জানালা খুলে দিয়ে একটু ভাববার সুযোগ যে পাওয়া গেল, এও পরম লাভ মনে হচ্ছে। বাদলা দিনে অন্ধকার ঘরে স্তব্ধ হয়ে আর কত বসে থাকা যায়! মনও যে রুদ্ধ হয়ে আসে, কোনোখান হতে কোনো আলো সংগ্রহ করে আনতে পারে না। মনের সেই অসাড় পাষাণ-ভার বড় দুর্ব্বহ!

ক-দিনের অবিরাম ধূসর মেঘ আর অনিবার বৃষ্টির পর আকাশে স্বচ্ছ-নীলের অবসর এক-একটি আশার আলোক-দ্বীপের মত দেখা দিয়েছে। আমারও অন্ধকার মনের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা জেগেছে,—নিকষপটে সোণার লিখন কেটে বসবে,—শুধু অবান্তর কথা নয়, প্রমাদগ্রস্তের উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ নয়, ছন্দোবন্ধে, যতিতে সম্পূর্ণ, শোভন সংযত শ্লোক ফুটে উঠবে—করুণায় যার জন্ম, জ্ঞানে যার স্থিতি;

উদ্দাম বর্ষার আক্রোশ দূর হয়েছে। আকাশ স্বচ্ছ-নীল, চারিদিকে নির্ম্মল সূর্য্যালোক, পর্য্যাপ্ত প্রচুর পল্লব;—তরুশ্রেণীর নিবিড় হরিত-সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গে এই সূর্য্যালোকের দীপ্তি স্নিগ্ধ-করুণ হয়ে দেখা দিয়েছে! আকাশ-জোড়া আলো নিয়ে তুমি আমার সম্মুখে এসেছিলে, আমি চোখের সম্মুখে পর্দ্দা খাটিয়ে, আঁধার রচনা করে বসে-বসে ভাবছিলাম, তুমি কোথাও নাই! হাওয়ার মুখে পর্দ্দা খসে গেছে, তোমার চোখ-ধাঁধিয়ে-দেওয়া আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! কি অশোভনতার মধ্যে, কি আবর্জ্জনা-স্তূপের পাশে, জীবন যাপন করছিলাম তা সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। এখন বাঁচতে হলে উঠে-পড়ে লেগে বাসস্থানটি সংস্কার করতে হবেই! নইলে বাঁচাই দুঃসাধ্য হবে যে! বাঁচব বলেই যে সঙ্কল্প করেছি! অবসাদের দিন অবসান হয়ে গেছে! সকাল-বেলাকার এই মন আমি রাতে কোথায় হারিয়ে ফেলি,—অন্ধকারের অস্পষ্টতায়, ছায়ার নিরুদ্দেশ পথে, আর অগণ্য নক্ষত্রলোকের গহনের মধ্যে! তখন যে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার ধারণাই থাকে না। আমি একটা খেয়ালের মত, ক্ষীণপ্রাণ লঘু বাষ্পের মত কোথায় ভেসে চলি, দেহবোধ চলে যায়, স্বপ্নের মধ্যে অর্দ্ধতন্দ্রায় একটি চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকে! আমি যে কেবল একটি আত্মা, এই দেহসম্বন্ধে যুক্ত হয়েও বিযুক্ত, এই অনুভূতিই ক্ষণে ক্ষণে পরিপুষ্টি লাভ করে! আমি যে মানুষ, নাম সংজ্ঞাধারিণী নারী, আমি যে সমাজ, আত্মীয়তা জাতীয়তা প্রভৃতির মধ্যেকার কেউ—এই ধারণা আমার

চেতনার মধ্যে স্থান পায় না। আমি শুধু প্রাণ, এই কথাই মনে হয়, এবং এই প্রাণ যেন কোনো সংস্কারের সঙ্কীর্ণতার জালে বাঁধা পড়ে প্রতিহত নয়। মনে হয় আমি বাতাসের মত মুক্ত, আকাশের মত ব্যাপ্ত, জলের মত নির্ম্মল, আলোকের মত দীপ্তিমান আর পৃথিবীর মত সুন্দর—চিরসুন্দর! একটা অসীমতা, বাধাহীনতার অব্যাহত শক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করি, কেমন আনন্দ আবার কেমন-যেন ভয়ও হয়। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

আজ ভোরে উঠে যেম্নি জানালা খুলে দিলাম, অমনি শুভ্র-সুন্দর নিস্কলঙ্ক প্রভাত আমায় স্বাগত জানালে। এমন পরিপূর্ণ নির্ম্মল সকালবেলাটি আলোয়-আলোয় গানে-গানে ভরা, এ কি শুধু আমার হৃদয়-দ্বার হতে তার বারতা না জানিয়ে ফিরে যাবে? আকাশের আলো নীলিমাকে আরো সুন্দর করেছে, ধূসর মেঘকে শুভ্র করেছে; গাছের পাতায় সোণার দীপ্তি, মাঠের ঘাসে শিশিরের বুকে হীরেমাণিক ছড়িয়ে দিয়েছে—আমার চোখে আর আমার বুকে তার প্রসাদ-আনন্দ এনে দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে! আজ নয়ত কাল, নয়ত আরো দুদিন বাদে, সে তার নিখিল-মন্থন-করা অমৃতের অভিষেক, অন্ধকার-নির্ম্মূল-করা আনন্দের মন্ত্র পাঠ করে যাবেই, তার সন্দেহ নেই;—মন অবারিত, শ্রবণপথ উন্মুক্ত, নেত্র উৎসুক হয়ে থাকুক, সার্থকতা আসবেই।

ভারতী, আশ্বিন ১৩২৪

স্মরণ

যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই মানুষ মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছে তবু আমরা মৃত্যুকে প্রত্যয় করিনে, এইটিই সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ বড় সত্যকথা। মহামারী আমরা দেখি, প্রতিবেশীর গৃহে মৃত্যুদূত এসে যখন তার সর্ব্বস্ব সম্বল আত্মসাৎ করে তখন যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে চারিদিক কাতর হয়ে ওঠে, তাও আমরা শুন্‌তে পাই, তবুও মৃত্যুর যে কি ভীষণতা তা আমরা জানিনে। যতক্ষণ এ মৃত্যু-অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে এসে না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ এর যথার্থ স্বরূপবোধ আমাদের জন্মায় না। মৃত্যুর অস্তিত্ব আমরা জানি, মানুষ মরে এ-কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু মৃত্যু যতক্ষণ আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব হরণ করে', না পলায়ন করে, ততক্ষণ তার পরিচয় হয় না, তার বেদনার অনুভূতি আমরা লাভ করিনে। সুখের সংসার বেশ চলছিল, আশা আমাদের বর্ত্তমানকে নানাবর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর করে', উজ্জ্বল করে', সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত করে' দিয়েছিল; আজ যা হচ্ছে কালও তাই হবে, কিম্বা তার চেয়ে আরো সুখকর কিছু ঘটনা ঘটবে এ প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে এমন কল্পনাও মনের কোথাও স্থানলাভ করবার সুযোগ পায়নি। আমরা বড় নিশ্চিন্ত হয়েই ছিলাম, এমন সময় বজ্রবেদনা বহন করে' মৃত্যু যখন তার করাল মূর্ত্তিতে আমাদের

সম্মুখীন হয়, সুখের সংসার ভেঙেচুরে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, আশার নিত্যনবীন সৌন্দর্য্য অন্ধকারে বিলীন হয়, আনন্দসঙ্গীত স্তম্ভিত হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, জীবন একেবারে নিঃসম্বল হয়,তখনি বুঝি মৃত্যু কি ভয়ানক ! সে বেদনার প্রথম অভিঘাত এমনি প্রচণ্ড যে অনেক সময় বোধ-শক্তিই হারিয়ে ফেলি ; অভাব যে কতবড় হল তা আমরা ধারণা করতেই পারিনে। তারপর, যখন চেতনা আসে, তখন মনে হয়, এতবড় অবিচার কেন হল ? মন বিদ্রোহী হয়, স্নেহ সহানভূতি সান্ত্বনা সবই তার কাছে বিরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, বিশ্বের উজ্জ্বল শোভা, সুনিয়মিত আহ্নিক যাত্রা তার কাছে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়। তার সঙ্গে যেন সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়. কিছুই আর তাকে আনন্দ দিতে পারে না। সে বড় একা হয়ে পড়ে, সুদূরে, অন্ধকারে, নির্জ্জনতায় থাক্‌তেই তার ভাল লাগে। বিশ্ব তখন তার কাছে যেন থেকেও থাকে না। একান্ত নিঃসঙ্গ হবার, শোকের মধ্যে এই যে প্রেরণা, বেদনাহতের এই যে স্বাতন্ত্র্য, অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের কামনা, এর মধ্যে বড় একটি মঙ্গল-ইচ্ছা নিহিত থাকে, আমরা প্রথমে সে কথা বুঝতে পারিনে। যাঁরা ফোটোগ্রাফী (Photography) করেন, তাঁরা জানেন ছবির ছায়াপাত আলোকেই হয়ে থাকে, কিন্তু আভাসে যা থাকে তাকে সম্পূর্ণ ও পরিণত করতে হলে, অন্ধকারেই তাকে রাখতে হয়। শোকের দিনে নির্জ্জনতায় যখন আমরা থাকি তখনই আপনার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সুযোগ হয়। যে বাণী বারবার মনের দ্বারে এসে ফিরে গিয়েছে, যে মঙ্গল-জ্যোতিঃ বাহিরের বিক্ষিপ্ত কিরণে আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হতে অবসর পায়নি, সেই বারতা শ্রবণের, সেই আলোক দর্শনের সুযোগ ঘটে। মন যা নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, আমরা দেখতে পাই সে সকল ক্ষণিক ও ক্ষণভঙ্গুরে আর চলে না। যাকে এতবড় করে রেখেছিলাম, যে আমার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আড়াল করে ছিল, যার বাড়া আমার আর কিছুই ছিল না, সেই যখন চলে গেল, সংসারের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে পড়ল, তখন, মনের নূতন জীবনের জন্যে, এমন কিছু আবশ্যক হয়, যার অভাববোধ এতদিন তার অন্তরে ছিল না, সদ্যজাগ্রত অন্তরের বুভুক্ষা আর তুচ্ছতা নিয়ে, ক্ষণিক দিয়ে মেটে না, সে আপনার মধ্যেই সেই আনন্দ-উৎসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যার সুধার ধারা দিনে দিনে তাকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করতে পারবে। নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের আভাস পায় !

নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের সুযোগলাভ করে। যে সান্ত্বনা, অপরের স্নেহ-প্রীতিতে সম্পূর্ণরূপে এতদিন সে পায়নি, কারো কথার মধ্যে যে পরম বাণী সে শুনেও বোঝেনি, যখন সেই অমৃতবাণী আপনার মনের কাছেই শোনে, তখনি যে চরিতার্থ হয়ে যায়। যে বিধানে তার বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিধাতার নিকট হতেই সে সান্ত্বনার দান গ্রহণ করে। মা যখন সন্তানকে শাসন করেন, ব্যথা দেন, তাঁর কোলের কাছটিতে না পেলে, তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে না কাঁদলে ত সে বেদনা দূর হয় না, চোখের জল তিনিই মুছিয়ে দেন, তবেই ত শান্তি আসে ! যে দুঃখ একদিন

বড অবিচার বলে বোধ হয়েছিল, আবার জানি না কেমন করে তারি মধ্যে তরুণ আনন্দের জন্ম হয়, বর্ষাধৌত নীলাম্বরে সূর্য্যালোকের মত, বিশ্বের শ্রী নির্ম্মলতর বলে মনে হয়—বর্ষার অভিষিক্ত মৃদু ধরণীর মত মনের ক্ষেত্রে বীজ বপনের শুভ অবসর আসে। আমরা পরিপূর্ণ মনে বলতে সক্ষম হই, "তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"

মেটারলিঙ্কের (Macterlinck) নীলপাখী (Blue Bird) বলে' নাটিকাতে পড়েছিলাম, একবার খৃষ্ট-জন্মোৎসবের পূর্ব্ব রাত্রিতে দুটি ভাই বোন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্নে তারা দেখলে, যেন কোন অপূর্ব্ব লোকে গিয়েছে, কত সুন্দর সুন্দর স্থানে বেড়াচ্ছে, দেখলে কত নবজাত আত্মা সেখানে অতিথি, আবার কতজনে আমাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসবার জন্যে নৌকায় আরোহী। এম্নি সময় ঘুরতে ঘুরতে একটি জায়গায় একটি কুটীরের সম্মুখে এসে, সেখানি তাদের বড়ই পরিচিত বলে মনে হল, দুয়ারের পাশে বুড়ো কুকুর পাহারা দিচ্ছে, ঘরের দাওয়ায় তাদেরি জানাশোনা বিড়ালটি বসে বসে ঝিমচ্ছে—গৃহসজ্জা চিরপরিচিত! তারা বলে উঠল, এই যে দেখছি ঠাকুর-মা আর দাদামশায়ের ঘর—তারা অম্নি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, দেখলে তাদের দাদামহাশয় আর ঠাকুর-মা যেমনটি ছিলেন অবিকল তাই আছেন, তারা তাঁদের কাছে দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে বল্লে, দাদামশায়, ঠাকুর'মা—তোমরা তো তবে মরে যাও-নি, তোমরা যে ঠিক তেম্নিই আছ!—তাঁরা বল্লেন, তোমরা যখন আমাদের মনে করে' রেখেছ, তখন তো আমরা মরিনি, তোমরা ভুলে গেলেই আমরা আর থাকিনে, তোমরা যদি মনে করে' রাখ তাহলে ত আমরা চিরদিন অমর হয়েই থাকব!

যাঁরা চলে গিয়েছেন—তাঁরা আমাদের এই শ্রদ্ধার স্মরণের মধ্যে চিরদিন অ-মৃত। আমরা ত তাঁদের হারাইনি বরং অন্তরের মধ্যে আরো নিবিড় ভাবে পেয়েছি—তাঁদের ত্রুটি, ভ্রান্তি, গ্লানি, কিছুই আর আমাদের মনে নেই—যা-কিছু সুন্দর, পুণ্যময় তাই অম্লান শোভায় চিরন্তন হয়ে আমাদের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করছে। আমাদের স্নেহের স্মরণে নিরন্তর সঞ্জীবিত হয়ে চিরঞ্জীবি হলেন, শুধু কি এবারকার মত! এ-সব স্মৃতি যে আমাদের আত্মার সম্বল, তারি মত অক্ষয় ও অবিনাশী—তাঁরা আমাদের যুগ-যুগান্তের জন্ম-জন্মের সঙ্গী হয়ে রইলেন।

যে বিশ্বজননীর স্নেহক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করে', তাঁরি আদেশে জীবনের অভিনয় সাঙ্গ করে' তাঁরা বিদায় নিয়েছেন, তাঁরি চিরপ্রসারিত অনন্তের আনন্দ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মা উন্নততর, পুণ্যতর, শ্রেষ্ঠতর সদ্‌গতি লাভ করুক, এই আমাদের আজিকার একমাত্র প্রার্থনা—চিরদিন তাঁহাদের জন্য যেন,—মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌঃরস্তু নঃ পিতা। মধু মান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবোভবন্তু নঃ।

ভারতী, কার্ত্তিক ১৩২৪

বসন্ত শেষ

এখন নতুন পাতা গজাবার দিন, পত্রহীন রিক্ত গাছগুলি কাঙালের মত হাত বাড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যতদিন তাদের পাতার সম্পদ ছিল, ততদিন আন্দোলন-আস্ফালনের অন্ত ছিল না, দিবারাত্রই বাক্যস্রোত বয়ে চল্‌ত—এখন সে মজলিসি ভাব নেই,—নিতান্ত নিরীহ, চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ অভাব। আস্তে আস্তে পাতার কুঁড়ি ডালপালার গায়ে একে একে দেখা দিচ্ছে। বাদামের পাতা যখন বুড়ো হয়ে ঝরে পড়ে, তখন তার গায়ে রং লাল, খানিকটে শুষ্ক রক্তের মত, মাঝে মাঝে কালোর ছিটে থাকে। কিন্তু কচি পাতা যখন গজায় তখন বাহিরের দিকটা থাকে লালচে,—আর ভিতরে নতুন কাল পাতার মত সবুজ। প্রথমে লালটিই চোখে পড়ে, কেননা যখন তারা জন্মায় তখন কচি পাখীর ছানার ছোট্ট মাংস-পিণ্ডের মত তাল পাকিয়ে থাকে, নড়ে না চড়ে না, কিছুই করে না। তারপর আস্তে আস্তে মুখের কাছটা খুলে আসে, যেন ঠোঁট খুলে পাখীর ছানারি মত মায়ের কাছে আধার চাইছে। সূর্য্যদেব নিজের হাতে প্রতিদিন তাদের সোণার আলো খাইয়ে দেন, যারা ছিল একেবারে পঙ্গু অচল, অনির্দ্দিষ্ট আকার, তাদের ক্রমে গড়ন হয়, রং ফোটে, তারপর হঠাৎ একদিন নতুন পালক-গজানো শুক পাখীর মত ছোট ছোট ডানা মেলে দুলতে থাকে, মুখের কাছটি তখনও রাঙা। ক্রমে কল-কাকলি শোনা যায়। ডানা ছড়িয়ে উড়তে চায়, কেবলি ডানা কাঁপায়, অধীরতা প্রকাশ করে, ওড়া আর হয় না, গাছের ডালেই নাড়ীর টানে বাঁধা পড়ে থাকে। তখন তারা একেবারে সবুজ। সারাদিন ধরে কত কল্পনা-জল্পনাই চলে, তবু মুক্তি পায় না। পরে জরা একদিন এসে শিথিল বৃন্ত হতে তাদের খসিয়ে নিয়ে যায়। অশ্বত্থের পাতার কুঁড়ি, একটি মোড়া পানের খিলির মত কিম্বা চাঁপার কলির মত একেবারে শক্ত করে' জড়ানো, তারা যেন ডালের গায়ে মোটা মোটা কাঁটার মত লেগে থাকে। নড়ে না একেবারে, তার পর যখন খুলে যায়, তখন পানের পাতার মত দেখতে হয় আর সে সময় যে নৃত্য আরম্ভ হয়, তেমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস অ-কারণ হতে পারে না। শুনেছি এদের পাতার শিরায় শিরায় কিছু অধিক পরিমাণে তড়িৎ-সঞ্চয় আছে, তাই এত উৎসাহ। বাদামের পাতার কুঁড়ি যেমন ছোট্ট পাখীর অপোগণ্ড ছানার মত থাকে, অশ্বত্থ পাতার কলি কোন কীট-শিশুর মত গতিশক্তিহীন, কঠিন, তারপর যখন তার সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হয়, হাত-পা ছাড়াতে পারে, তখন একেবারে লাফিয়ে অস্থির। দেবদারুর পাতা দেখা দেয় স্ক্রু পাকে মোড়ানো, আস্তে আস্তে খুলে যায়। বেশী আয়োজন আড়ম্বর নেই। কাঁচা বুড়ো একই ডালে বসবাস করে, বুড়োরা ঠাঁই ছেড়ে সরলেই কচিরা এসে জুড়ে বসে।

দেবদারু কখনো একেবারে রিক্তপত্র দেউলে-যাওয়া কাঙালের মত দেখতে হয় না—তার শূন্য ডাল-পালায় নতুন পাতা পুলক-সঞ্চারের মত উদ্‌গত হয় না—পুরাণ পাতা যেমন সরে যায়, অমনি নতুন পাতা দেখা দেয়, ঠিক মনে হয়, তারা পাশেই চুপচাপ বসেছিল, যেই আসন পেয়েছে অম্নি সরে বসেছে।

কলায় কচি পাতা, বাগানের দিস্তার লম্বা মোড়কের মত, কিম্বা ফণা-লুকোনো সাপের শরীরটার মত দেখ্তে থাকে, তার পর যখন খুলে যায়, তখন হাতির কাণের মত দোলে। এরা নানা-পর্য্যায়ের। লতায় পাতা দেখা দেয় শুঁয়ো পোকার মত, কেউ বা থাকে গুটিপোকার মত গুটিসুটি হয়ে, তারপর প্রজাপতির মত বিচিত্র ডানা মেলে উড়তে চায়, পারে না। পাতার সূচনা কত অদ্ভুত আকারেই প্রকাশ পায়, কেউ কুণ্ডলী পাকানো সরীসৃপ, কেউ পতঙ্গম-জাতীয়, কেউ বা বিহঙ্গ-শিশুর মত। মানব-ভ্রূণ যেমন প্রথম অবস্থায় জরায়ুতে সমস্ত জীবপর্য্যায়ের গঠনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে স্তন্যপায়ী দ্বিপদ জীবের আকৃতিতে এসে পৌঁছয়, তেম্নি কি গাছের পাতাও মৎস্য, সরীসৃপ, পতঙ্গ ও বিহঙ্গ শৈশবের অনুকরণ করে ?

বৎসর শেষ হয়ে আস্ছে, চৈত্র যায় যায়, তবু যেন সময়টাতে সমাপ্তির ভাব নেই, এই সময়ের স্বাভাবিক উত্তাপ এখনও আসেনি, যে-সব ফুল এই মাসের, এখনও তাদের দেখা নেই। সবে কুঁড়ির সবুজ মোড়কে আমদানি হচ্ছে—তাও ভারি ধীরে সুস্থে।

এতদিনে অন্য বৎসরে বলরাম-চূড়ায় রাঙা রাঙা প্রজাপতির মত, অসংখ্য ফুল ফুটে ওঠে, দুলে দুলে ডানা নাড়ায়। রেণু কেশর ছড়িয়ে পড়ে, পথ লালে লাল হয়ে যায়। সমস্ত গাছ, পথের দু-ধারে সারি সারি ডালপালা খুব উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলন করে হোরি খেলে। এবারে তার কোন চিহ্নই নেই। এই চৈত্র-শেষে রং কোথাও নেই। করবী, স্থলপদ্ম, বলরাম-চূড়া, শিরীষ, সোঁদাল, জাপানী গোলাপী ফুল, কারো শীত-নিদ্রা ভাঙেনি। বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, রাতে শীত করে, সূর্য্যালোক তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, শীতে দীর্ঘ রাত্রির ঘুমের অভ্যাসে, চোখে এখনও যেন তন্দ্রাবেশ আছে। কোকিল মাঝে মাঝে এক-একবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে কিন্তু নিবিষ্ট মনে পঞ্চম রাগের আলাপে রত হয়নি। আমাদেরও মনে হচ্ছে বসন্ত আসেনি, আসবে ; আমাদের মনও বর্ণের সাধনা করতে রাজি হচ্ছে না, কথা দিয়ে ছবি আঁকবার উৎসাহ নেই। বসন্ত যদি মত্ত উৎসাহে, সোণালি উত্তরীয় উড়িয়ে, পথে পথে ফুলের হরির-লুট দিয়ে, গন্ধে সমস্ত আকাশ উতলা করে, গানে গানে ধরণীর শিরায় শিরায় আনন্দ সঞ্চার, তার সমস্ত অঙ্গ সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, নিবেদনের আগ্রহে আকুল করে এসে দেখা দিত, তবে আমরাও নিয়ম-ভোলা শিকল-ছেঁড়া ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে উঠতাম, যা রোজ করি তা একেবারে নিরর্থক হয়ে যেত, যা করবার কল্পনাও একসময় অসম্ভব বলে মনে হয়েছে, তাই শুধু সম্ভব কেন, তা ছাড়া আর-কিছু করার নেই, এই কথাই স্থির বিশ্বাস হয়ে যেত। "লভিয়াছি বিরহের স্বর্গ-লোক"—এমনি একটা সৃষ্টি-ছাড়া ধারণায় পূর্ণ-কাম, আনন্দরত, উদ্যম-তৎপর হতাম। জীবনের ছন্দই বদ্লে যেত। তাল, ফাঁক, উলটপালট হ'ত। ক্ষেপা আকাশে চোখ রেখে, সাগর বেলায় পরশ-পাথরের অন্বেষণে সারাদিন আর সারাটি রাত ঘুরে বেড়াত।

আকাশ জুড়ে মেঘ দেখা দিয়েছে—ঘন নয় হাল্কা, পাতলা ধূসর পর্দ্দার আড়াল হতে আলো যখন আসে, তখন তার মুখে আর রং থাকে না, একেবারে ফ্যাকাসে দেখায়, ঠিক তেমনি আলো চারিদিকে ছেয়ে গিয়েছে, বাতাস উঠেছে, মেঘ উড়ছে, গাছপালা ডাল দুলিয়ে নৃত্য আরম্ভ করেছে, লাস্য পরিত্যাগ করে, এতক্ষণে তাণ্ডব সুরু হ'ল। একি মাতামাতি, একি বিপুল ছন্দের আন্দোলন। কোথায় তাল আর কোথায়ই বা ফাঁক কিছুই ধরা যাচ্ছে না, প্রচণ্ড খেয়াল বটে, রাগ নটনারায়ণ, সমে পৌঁছবে কি করে জানিনে, কেবলি তানের পর তান কখনো একটানা, কখনো ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা, কখনো শুনছি নিরন্তর সোঁ সোঁ শব্দ, আবার কখনো কাণে আসছে ডাল-পালার আছ্ড়ে পড়া ! পাতাগুলো একেবারে মূর্চ্ছনায় ঘুর-পাক খাচ্ছে। আবার কখনো গুম্‌রে ওঠা গমকের সুরে অন্তরাত্মা ব্যথায় পীড়িত হচ্ছে। ঘর বন্ধ করতে হয়নি, কেননা বেশী বৃষ্টি এখনও পড়ছে না। ধূসর মেঘের ধারে আলোর লুকোচুরি-খেলা চল্‌ছে। বিদ্যুৎ মেঘ ফুঁড়ে এধার থেকে ওধারে ছিটকে পডছে—মুখে তার হাসির টিট্‌কারী, ভাব খানা,—কৈ গো ধরতে পারলে কৈ ? বজ্র গুরুগম্ভীর সুরে পাল্টা গাইছে, তারপর বায়ু-রথের শিঙা বেজে উঠছে ভোঁ ভোঁ, কখনো বা অমানুষিক পৈশাচিক চীৎকার মেঘ ভেদ করে, পৃথিবীর কাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ শব্দের শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, তাকে একেবারে বধির করে দিলে ! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, ধারা বর্ষণে ধরণীর ভাষা শান্ত হ'ল না, আকাশের মেঘ-মালিন্য কাটল না। চারিদিক ভার, অন্ধকার হয়ে রইল। পথে যেখানে ছিল শুধু ধুলো, সেখানে জম্‌ল কাদা। স্বচ্ছ নিরাময় প্রসন্নতা আকাশকে সুন্দর করল না, আলোকের নির্ম্মলতা, ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেল্ল না, গাছপালা নেয়ে-ধুয়ে সতেজ সরল সজীব হ'ল না। অবসাদ দূর হ'ল না, বরং বাড়লই, কেবল খানিকক্ষণ নিরর্থক মাতামাতি চল্‌ল।

ভাবতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

মনের দিনেক কথা

শরীর যেদিন অক্ষম হয়, সাহচর্য্য দেয় না, চলাফেরা দেখার পথে বাধা এসে পড়ে, সেই দিন মন এসে বন্ধুতা করে, সেদিন সে বলে, "চোখ তোমায় কি আলোই বা দেখাতে পারে, আমি তোমায় অচপল চপলার জ্যোতি দেখাই এস। হাঁটতে পারছনা, তাই দুঃখ ? এস তোমায় নিয়ে অনন্তের পথে বেড়িয়ে আনি, অগণ্য গ্রহনক্ষত্রের আলোক-অরণ্যের মধ্যে এস আমার সঙ্গে পায়চারি করবে। ঐ নীহারিকার গর্ভমন্দিরে তোমায় নিয়ে যাব, সেখানে সৃজনের স্বরূপ দেখে আসবে !" অক্ষম দেহটা আপন দখল ছাড়লে দেখে, মন এসে তার সম্পূর্ণ অধিকার প্রচার করে। আজ তাই বিছানায় পড়ে পড়ে ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী হয়েছি। চোখ বুজে বুজে কেবলি দেখছি, চোখ খুলে যা দেখবার জন্যে ব্যাকুল। চোখের অধিকার আজ মানছিনে, তার দ্বার বুদ্ধ করে দিয়েছি, তবু

আজ যা দেখছি, বহুদিন কেন কত যুগযুগান্ত, তা দেখ্‌বার সুযোগ তো হয়নি। সেই চিরাতীত কৈশোর, আজ তার সব দেখার আগ্রহ, আনন্দ, অপরিতৃপ্তি মনের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে, তাই নিঃসঙ্গ একাঘরে আজ সঙ্গীর অভাব নেই, সুখে আছি। লোকে বলছে, বেচারার অসুখ করেছে, আমি জানছি, তারা কিছুই জানে না ! একটা দিনের জন্যে যেই আমার পক্ষে বাহিরের গতি স্থগিত হয়েছে, অম্নি আমার জীবন অখণ্ডরূপে আমার সম্মুখে এসে দেখা দিল। অতীত এম্নি বর্ত্তমানই হল যে, বর্ত্তমানটার অস্তিত্বই রইল না ! শরীর যখন প্রবল থাকে, তখন কত জিনিষই হারিয়ে ফেলি, আমার বিশেষ আমির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে ! দেহযুক্ত আত্মা তাই খণ্ডিত, আপনার মধ্যে আপনার ব্যবধান রচনা করে ; ঠিক যেমন করে মিলনটি ঘটলে জীবন সম্পূর্ণ হত, তা আর হয় না ; তাই আত্মার পরিপূর্ণতার জন্যে, জীবনান্তের প্রতীক্ষা করতে হয় বুঝি ?

মন তো দিব্যি ছিল, অন্ধকারে দুয়ার ভেজিয়ে ! কেমন নিস্তব্ধ, কেমন নির্জ্জন, কেমন শান্ত পরিপূর্ণ ! ঐ যে দরজা খুলে মানুষটি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল, অম্নি আলোর সঙ্গে সঙ্গে কেমনতর যেন ফাঁক দেখা দিল, সে ভরা ভাবটি আর দাঁড়াতে পারলে না। বেশ ছিল মন একলাটি আনন্দে, নিরপেক্ষ নিরুদ্বেগ, শান্ত স্বচ্ছন্দ ! যেই আলো এল—পরিপূর্ণতা গেল, দ্বিধার আবির্ভাব হল, চাঞ্চল্য সঞ্চারের সূচনা দেখতে পেলাম। যে-দৃষ্টি মনের মধ্যে আপনাকে নিহিত করে তৃপ্ত ছিল, তার মধ্যে নিমেষ দেখা দিয়েছে, সে বারে বারে উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে, কেননা সে উৎসুক উৎকর্ণ ও বিব্রত ! এ আমি চাইনে, অন্ধকারের সমাহিত অবস্থায় মনের মধ্যে যেন সৃজন চল্‌ছিল সমুদ্রের গর্ভে অতলের মধ্যে দ্বীপগুলি যেমন করে গড়ে ওঠে, বাহিরে তখনও প্রকাশ পায়নি, তবু ও যে আছে, বাড়ছে, অপরে না জান্‌লেও অন্তর তা ভাল করেই জানছিল। মা যেমন জঠরের সন্তানকে সমস্ত দেহ মন দিয়ে অনুভব করে, আপন ঐশ্বর্য্যে আপনি বিস্মিত বোধ করে, তেম্নি আর কি ! কিন্তু এই যে অন্ধকারকে চিরে আলো দেখা দিয়েছে, এ যেন ছুরির খোঁচা, অক্ষত মনকে ভিন্ন করছে, তাই ব্যথা অনুভব হচ্ছে। মনের মধ্যে যে-বীজ অঙ্কুরে উদ্বোধিত হয়ে আলোক-জগতে দেখা দেবে বলে স্থির মনে পরিপূর্ণ সন্তোষে অন্ধকারে বসবাস করছিল, হঠাৎ সেই খানটিতে ফাটল পৌঁছেছে, এতে যে আলোক আর তাপ, অসময়ে অনাহূত সেই বীজের সূতিকা গৃহে প্রবেশ করেছে তাতে পরিণতির সহায়তা করবে না বরং আকস্মিক উপদ্রবে সমূহ ক্ষতি হতে পারে—মূলের রসবিন্দুটিকে শুকিয়ে না তোলে, তবেই মৃত্যু !

মনে কথা জমেছে বলতে হবে---বলা তো রাতদিনই চলছে তবে আবার এই কালি কলম কাগজের দরকার কি ? সে শুধু আমার মনের কথা আমি শুন্‌তে চাই বলে। জীবনে যে অনেক পায় কিম্বা জীবনে যে কিছুই পায়নি, তাদেরি আশা কি দুরাশার অন্ত হয় না, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মত তার ক্ষুধা মিটতেই চায় না। অন্য দিক দিয়ে দেখ্‌লে, যে অনেকই পেয়েছে তার লালসা মিটতেই চায় না, সে শুধু চেয়েই গেল।

এই যে প্রকৃতিকে আমি এত ভালোবাসি, দুঃখ বেদনায় একান্ত পীড়িত হয়ে যখন তার কাছে সান্ত্বনা যাঞ্চা করে' আসি তখন পূর্ণ সান্ত্বনা তো পাই না। জল-ভরা চক্ষের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ আবছায়া হয়ে আসে। যা দেখ্‌বার জন্যে মন পিপাসিত, চোখ উৎসুক তা দেখতে পাই না। এস আমার সুন্দর, অশ্রুজলের অন্তরাল দূর করে দিয়ে ; সব ঘোমটা, সমস্ত পর্দ্দার আড়াল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে', প্রকাশিত হও, বৃষ্টিধৌত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সূর্য্যকরপ্লাবিত দিনের মত। একসঙ্গে আমার নয়ন মন হরণ করে নাও। একেবারে অধিকার করে ব'স, একেবারে আচ্ছন্ন কর, তোমার বাহিরে আর কিছুই যেন থাকে না।

ধূসর মেঘের আঁচল-ঘেরা ঢেউ-খেলানো রূপালি আলো, আমায় কি বলবে ? কি বলতে চাও, আঁধার গিয়ে আলো আবার আস্‌বে ! আলো তো চাইনে আমি, আমি চাই নিবিড় নীরব অন্ধকার। তারি মধ্যে আমার স্মৃতির অসংখ্য তারা ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌বে, উজ্জ্বল হ'তে থাকবে, অজস্র অকথিত বাণী, বীণার সঙ্গীতে আমার সমস্ত মৌন মনকে পরিপূর্ণ করে তুলবে ! তাদেরই সঙ্গলাভে আমার সমস্ত নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে যাবে।

যে আলোকে আমি এত ভালবাসতাম আজ প্রাণ কেন তাকে আর চাইছে না ? উজ্জ্বল আলো চোখকে যেমন পীড়া দেয়, মনকেও কেন তেমনি ব্যথা দিচ্ছে ? আলোর মধ্যে একটি তাড়না আছে—সে বলে চলো, সে বলে ওঠো, সে বলে খোঁজো, সে বলে পথ দেখো ; কিন্তু আজ আমার মন আর পথ চলতে চায় না, আবিস্কার করতে পারবে না, নূতনের প্রয়াসী সে নয়। এস দৃষ্টি-হরা শান্তি-আহ্বান-করা, ঘুম-পাড়ান নিবিড় গভীর, অতল অন্ধকার। নিদ্রার আঁচলে ঘিরে নিঃশব্দ অদৃশ্যের অন্তঃপুরে নিয়ে যাও—স্বপ্ন দেখতেও মন আর চায় না।

প্রথম গর্ভ-সঞ্চার মায়ের মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ বহন করে' আনে, তার কাছে বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে যে নূতন আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তার পরে জীবনে আর কখনো তেমনটি হয় না ; আর প্রথম সন্তানের প্রতি জননীর যে স্নেহ জন্মায় সে স্নেহ আর কারো উপর বর্ত্তায় না। সে যদি না বাঁচে আর বেঁচে যদি বা অযোগ্যই হয়, তবুও সে যা' পায় আর কারো ভাগ্যেই তা ঘটে না।

নারী জীবনে শুধু একটি বারই এম্নি করে তার মনোভব কোন পুরুষকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসা তার পক্ষে নবজন্ম লাভ, কিম্বা তার অতীত অস্তিত্বের মৃত্যু। নারী যখন প্রথম মা হয় তখন সেও এম্নি আবার জন্মায়, তার পুরাতনের মৃত্যু হয়ে যায়। তার সব স্বার্থ চলে যায়, স্নেহের স্তন্য সুধায় তার সমস্ত জীবন অমর হয়ে ওঠে।

বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৯

ভরা বাদরে

বৃষ্টি, কেবলি বৃষ্টি, সমস্ত আকাশ ঘোলাটে, সবুজ গাছ পালার উপর, বৃষ্টি ধারার ঝাপ্‌সা ধূসর জিভে পর্দা দুলছে—গাছগুলি যেন একটির সঙ্গে অন্যটি, নেপটে গেছে। আর আর পৃথিবীর ব্যবধানটাও বৃষ্টির আবির্ভাবে ছাইরংএর হয়ে গেল।

সামনের পুকুরের বুকের উপর যতগুলি গাছের ছায়া সটান শুয়েছিল, সব কোথায় অন্তর্ধান। এখন অবিরাম বারিবিন্দু পতনে কত রকমের আঁকাবাঁকা লেখা তার উপর জেগে উঠ্‌ছে, কিন্তু জলের খেলা কতক্ষণ থাকে ? আবার সব চারিদিকে বিছিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাতাসের নিশ্বাসে সমস্ত পুকুরটা শিউরে উঠছে—কেঁপে কেঁপে জল সব ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাঠের সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে, গঙ্গার ঢলনামা জলের মত গেরুয়া জল জম্‌ছে। আর চারিদিক হ'তে একটা গভীর শব্দ উঠ্‌ছে—"যাও"—"যাও"। কেবল দালানের শানের উপর জোরে যে বৃষ্টি বিন্দুগুলি পড়ছে, তারি মধ্যে একটি হাল্কা তাল বাজছে, তুড়ি দিয়ে তাল দিলে যেমন হয় তেমনি।

বৃষ্টি ছাড়ল, আকাশের ধোঁয়াটে মেঘের মাঝে মাঝে, সাদা আলোর ফাঁক দেখা যাচ্ছে। দুচার ফোঁটা বৃষ্টি চুপি চুপি কথা কইছে। গাছ-পালা আবার সব আলগা হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে তালগাছের কাণ্ডটা একেবারে নিবিড় কালো, খেজুরও কতকটা তাই ; তবে তার গায়ে শতেক খাঁজ কাটা। বছরে বছরে তার কত রস, কেটে বা'র করে নেওয়া হয়েছে, সেই সব খাঁজে খাঁজে কালো আর নিবিড়। নারিকেল সুপারির গায়ে শাদা শাদা ছাতা পড়েছে, তাই তারা কালো না হয়ে ধূসর হয়ে গেছে। পুকুর-বুক শান্ত হয়ে এল, আবার সব ছায়া দেখা যাচ্ছে। তবে কাঁপুনিটা একেবারে শেষ হয়নি, শিউরে শিউরে উঠছে, তাতে করে ছায়ার সোজা গায়ে, ঢেউখেলান রেখা দেখা যাচ্ছে।

বিদায়ের যাও যাও শব্দ নিস্তব্ধ। দু'একটা পাখী মৃদু সুরে ডাকাডাকি করছে, গাছের পাতা বেয়ে দু'চারটা বড় বড় ফোঁটা, ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে থেকে থেকে হঠাৎ খসে পড়ছে। ঐ একটা বুল্‌বুলি উড়ে এসে ঝুঁটি নাড়িয়ে কি বলে গেল ! লেজ নাড়িয়ে, মশা তাড়িয়ে, গরু আবার ঘাস খেতে আরম্ভ করল, এতক্ষণ তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল।

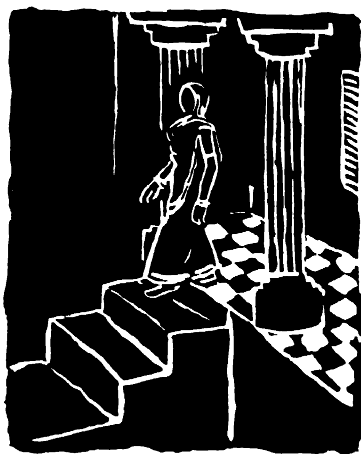
ঘন বনের বেড়া-ঘেরা দিগন্ত, আর ধূসর আকাশ এই আমার রাত্রি দিনের দর্শনীয় পৃথিবী। আমার ঘরের বারান্দার সম্মুখে একটু খানি ঘাস ঢাকা আঙিনা, তার পর তীরে নারিকেল সুপারি তাল খেজুর সারি দিয়ে দাঁড়ান একটি পুষ্করিণী। আরো খানিকদূর ঘন ঘাস-ঢাকা মাঠ—তার পর নিবিড় বনের বেড়া, গহন তরুশ্রেণী। ধূসর আর সবুজে ঢাকা এতটুকখানি পৃথিবী। ঘুঘু ডাকে, বুলবুলি ঝুঁটি নাড়িয়ে আনাগোনা করে, খঞ্জন ছোট্ট লেজটি দুলিয়ে যায়, বার বার চটুল চক্ষে চায়, আর দাঁড়কাক কি খাঁ খাঁ করে কেবলি ডাকে। এরি মধ্যে ছোট ছোট মেয়েদের করুণ কচি গলাও শোনা যায়।

যখন আলো ওঠে তখন ধূসর মেঘের কালিমা হাল্কা হয়ে আসে, রূপালি ঝালর

দেওয়া একখানি ঝালর ঝুলে পড়ে, বনের সবুজেও বর্ণ-বিভিন্নতা দেখা যায়, আবার যখন মেঘের আড়ালে আলো লুকিয়ে পড়ে, তখন সব শুভ্র অনাবিলতা চলে যায়, ঘাস ছাড়া আর সব গাছের সবুজ এক হয়ে আসে, পুকুরের জল একেবারে কাদাগোলার মত দেখায়। শুধু একটু আনন্দ আর জীবন দেখা যায় গাছপালার আন্দোলনে, বিচিত্র ভঙ্গী আর নিরন্তর পরিবর্ত্তমান মর্ম্মর সঙ্গীতে। কখনো বা স্বগতোক্তি, আবার কখনো চুপি চুপি প্রেমালাপ আবার কখনো বা মহা উৎসাহে কলকোলাহল। আমি একা একা বসে বসে দেখি, আর কত কি ভাবি।

সবচেয়ে ভাল লাগে সম্মুখের খণ্ড-আকাশ, বনের সীমানা দেওয়া এই ছোট্ট পৃথিবীটুকু দেখতে। এখানে কিছুরি অভাব নাই। পুকুরের বুকের মুকুরে, ছায়াতে আমি অনেক ছবি দেখতে পাই। আকাশের মেঘের লীলা, তীর তরুর অচল স্তব্ধতা নির্ব্বিকার ধ্যান, আকাশের নক্ষত্রের দিব্যালোক। জল যতক্ষণ স্থির থাকে ততক্ষণই ছায়ার, স্বপ্নের অবসর, তারপর যদি একটুখানি জোরে হাওয়া উঠ্‌ল সব মুছে যায়, ছায়ার চিহ্নও থাকে না, তখন শুধু বাস্তব তরুরাজির উতলা ব্যাকুল আন্দোলন, অস্থির নিশ্বাস, অবিরাম ব্যগ্র কলকোলাহল জ্ঞানগোচর হয়। ঘন বনের বেড়ার পরে নদীর প্রবাহ, সরীসৃপ-গতিতে সে বয়ে চলেছে, তার কোনও শব্দ কাণে আসে না, মাঝে মাঝে পারঘাটের জাহাজের বাঁশী আর শিঙা শোনা যায়।

বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৯



দ্বিতীয় পর্ব

মেয়েদের কথা

দ্বিতীয় পর্ব : মেয়েদের কথা

স্ত্রীশিক্ষা

স্রোত যখন প্রবাহোন্মুখ তখন তাহার পশ্চাত্তাড়না যেমন অসম্ভব ব্যাপার, তাহার গতি স্থগিত রাখা, রোধ করিবার চেষ্টাও তেমনি অযুক্ত, অসঙ্গত, বাধা অনিষ্টকর, বাধ্য হইয়া এ গতিকে স্বাধীনতা দিতে হয়। নদীর উৎসমুখে যে প্রবলতা, যে অসহ্য উচ্ছ্বাস, যে উদ্দামগতি পরিলক্ষিত হয়, প্রবাহিত জলস্রোতে সে অসংযম তিরোহিত হইয়া যায়। নদীর জন্মস্থান সঙ্কীর্ণ, দুর্গম, প্রস্তর-কঠিন, পথ উপল-বন্ধুর, পদে পদে প্রতিবন্ধক তাই তখন এই দুর্দ্দম তেজের সার্থকতা থাকে। তখন কেবলই মুক্তির প্রয়াস, সৃজনের নিমিত্ত নিমেষ মাত্র অবসর থাকে না, তাই সেই উৎস পার্শ্বে একটী ফুলও ফুটিয়া উঠে না, শ্যাম দুর্ব্বাদল বিস্তারিত হয় না, কনক শীর্ষ শস্যরাজি মস্তকে শত সহস্র জন ও জনপদের মঙ্গল সঞ্চয় ধারণ করিয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না। তাহার পর যখন সেই প্রতিহত বারি স্রোত ক্রমশঃ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সমভূমিতে আসিয়া উপনীত হয়, যেখানে পথ সহজ, বাধা স্বল্প তখন প্রসারিত প্রবাহ কূলে কূলে লাবণ্য বিস্তার করিয়া, কল্যাণস্পর্শে ধরিত্রীকে শস্যশ্যামলা ফলবতী করিয়া, দেশ দেশান্তরের বাণিজ্য বহন করিয়া, কলনাদে কুশলতৎপর গতিতে সাগরাভিমুখী হয়। আমাদের এই নবীন সভ্যতার অবস্থা এখনও অনেক পরিমাণে গোমুখী উৎসারিত গঙ্গাপ্রপাতেরি মত, এখনও উদ্ধত অদম্যতা, তর্জ্জন-বাহুল্য, উৎক্ষিপ্ত অসংযম দূর হয় নাই ; কালে আশা করা যায় ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহেরি ন্যায় অজস্র মঙ্গলবর্ষিণী হইবে। এ সকল বিষয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করাই সঙ্গত, কতক সহ্য, কতক বর্জ্জন, কতক কাল এবং অবস্থার উপর নিক্ষেপ করিয়া ফলাফল এবং চরম পরিণতির অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। আমাদের এই সভ্যতার কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই স্ত্রীশিক্ষার কথা মনে আসে।

দেশে যখন প্রথম সংস্কার আরম্ভ হয় সভ্যতার বিস্তারে যখন নিত্য নব সুখের অভ্যুদয়, বুদ্ধির বিকাশের সহিত চিন্তার স্বাধীনতা এবং আত্মার উন্নতি হইতে থাকে, তখন সমাজের সংস্কার কর্ত্তাগণ নেতৃবর্গ সেই আনন্দ সেই স্বাধীনতা আপনাদিগের আত্মীয়তম এবং ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জনের সহিত অংশ করিয়া লইতে উৎসুক হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি ? তাই আজ বহু বর্ষ আগে, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাজকীয় প্রাসাদে নবীন শিক্ষায় যখন পুরুষেরা উন্নীত হইতে লাগিলেন, জীবনের পথ

অসীম বিস্তৃত, সম্মুখে নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন, সেই আনন্দের উপভোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সীমায়, সমবয়স্ক সহপাঠী বন্ধুবর্গের অধ্যাপনা গৃহে নির্ব্বাসিত করিয়া না রাখিয়া, গৃহে প্রিয়জন সহবাসে নিত্য অক্ষয় সঞ্চয় করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন : আপনার পত্নী, দুহিতা, ভগিনীকে সেই আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তখন প্রাচীন ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ লুপ্তপ্রায়, প্রাতঃস্মরণীয়া সতী সাবিত্রী সীতা দময়ন্তীর আদর্শ পুরাণকাহিনী, খনা লীলাবতীর পাণ্ডিত্যাভিমান জনশ্রুতি মাত্র, অদূর-অতীত মুসলমান রাজত্বে কলঙ্ক ভয়ে স্ত্রীজাতি নিত্য অবরুদ্ধা অশিক্ষিতা থাকিতেন তৎসাময়িক কোনও প্রকৃষ্ট আদর্শ ছিল না, সেই নেতৃবর্গের সম্মুখে একমাত্র শিক্ষিতা ইংরাজ রমণীর নবীন আদর্শ জাজ্বল্যমানরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারি অনুকরণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন— নবীনতার মোহও বড় কম নয়! তাই দেশ কাল পাত্র বিবেচনা অপেক্ষা না করিয়া ইংরাজী অনুকরণে যে শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছিল, অধুনা, মহিলাগণের বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষায় পুরুষের প্রতিযোগিতায় তাহার চরম পরিণতি হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম এই শিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন, যাঁহারা অনুমোদন করেন, তৎপরে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন সকলেই সম্প্রতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই।

ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই, আর কিছু না হউক কেবল মাত্র সেই কারণেই ইহার প্রতীকার সম্ভব কিনা উপায়ান্তর আছে কিনা ভাবিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। এখন সমাজের যে অবস্থা, উন্নতির পথে জন সাধারণ যত দূর অগ্রসর হইয়াছে, সে স্থান হইতে তাহাদিগকে ফিরাইবার চেষ্টায় অপকার ভিন্ন উপকার হওয়া অসম্ভব। পশ্চাৎবর্ত্তন অসম্ভব, গতি স্থগিত রাখা অনিষ্টকর, সম্মুখ-প্রবাহ অনিবার্য্য, তবে কি কোনই উপায় নাই? যাহা কিছু প্রিয়,রম্য, ইপ্সিত এই উদ্দাম স্রোতের অনিবার্য্য আকর্ষণে ভাসিয়া চলিয়া যাইবে আর আমরা নিতান্ত নিরুপায় দুর্ব্বলের ন্যায় কেবলি আক্ষেপ করিতে থাকিব, এ স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনই চেষ্টা করিব না?

স্ত্রীজাতির অধিষ্ঠানভূমি গৃহ। সেখানেই তাঁহাদের বুদ্ধির বিকাশ, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সার্থকতা, তাঁহাদের কর্ত্তব্যের পরিণতি। গৃহ তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানভূমি বলায় কেহ যেন মনে না করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ অথবা সীমাবদ্ধ। যে পুরুষগণ কর্ম্ম ক্ষেত্রে, সংগ্রামে, সমাজে, সাহিত্য এবং সংস্কারে অগ্রণী তাঁহারাও প্রত্যেকেই আশৈশব স্ত্রীজাতির শিক্ষা, স্নেহ এবং সাহচর্য্যের মুখাপেক্ষী। কাজেই গৃহ মন্দিরে যাঁহাদিগের স্ত্রী বহির্জগতে তাঁহাদিগেরই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির আবশ্যকতা। এই নিমিত্তই ইঁহাদিগের কোমল চিত্তবৃত্তি সকল যেমন অক্ষুণ্ণ থাকা আবশ্যক, তেমনি ইঁহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি নির্ম্মল পরিস্কৃত চরিত্র সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজনীয়। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিক্ষা তাহাকেই বলা যায় যাহা প্রত্যেক স্ত্রীকে স্বামীর গৃহিণী সচিব সখী ও প্রিয়শিষ্যা করিতে পারে। কিরূপ শিক্ষা হইলে এই পূর্ণ আদর্শের অনুরূপে চরিত্র গঠিত হইতে পারে এবং আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে কোন অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান থাকায় ইহা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে কি

না তাহাই আলোচ্য। আজ কালকার শিক্ষা অধিকাংশ স্থলে আর কিছুই নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষগণের প্রতিযোগিতা। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত শৈশব কাল হইতে আয়োজনের আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে মহিলাগণ প্রাতে ৯ ঘটিকার সময়ে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া সার্দ্ধ তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ইংরাজী, ফরাশী, সংস্কৃত, বঙ্গভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, পরিমিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত, মনোবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করে। তৎপর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, শ্রান্তি দূরীকরণার্থ ক্ষণিক বিশ্রামের পরই সন্ধ্যা সমাগত হয়, সুতরাং পর দিনের পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইতে হয়। ইহার মধ্যে গার্হস্থ্যশিক্ষা এবং ললিত কলা চর্চার উপযোগী অবসর কোথায় ? ফলতঃ একদিক হইলে অন্যদিকের অঙ্গহানি হয়। সুগৃহিণী হইয়াও স্বামীর সচিব হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব, আবার যাঁহারা সুদক্ষ সচিব, ললিত কলাবিদ্যায় তৎপরা, অনভ্যাসবশতঃ তাঁহাদিগের সুগৃহিণীর নিপুণ কার্য্য কুশলতা ও সুনিয়ন্ত্রিত সাম্য জ্ঞানের অভাব থাকিয়া যায়। তবে এ সকলই হইতে পারে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা ত্যাগ করিয়া, সাহিত্য ইতিহাস পরিমিতি অঙ্ক বিজ্ঞান অনুশীলন, সূচিকার্য্য শিল্প এবং সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত যত গুলি বিদ্যালয় বর্ত্তমান সবগুলিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষোপযোগী পুরুষশিক্ষা প্রণালী অনুসৃত হয়। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা অবশ্য অনায়াসে গৃহে রাখিয়া কন্যাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতে পারেন, যাহাতে সময়ের অনেক সদ্ব্যবহার হয়, শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় এবং স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এরূপ শিক্ষার নিমিত্ত সাধ্য একজন মাষ্টার, একটি পণ্ডিত, একজন গান বাজনার ওস্তাদ, শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী এবং চিত্র বিদ্যার নিমিত্ত শিক্ষকের আবশ্যক হয়। সাধারণের পক্ষে এত ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভবপর নহে, আপাততঃ এরূপ বিদ্যালয় একটিও নাই, যাহা আছে তাহাতে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়া সহজ নহে, কাজেই নূতন প্রণালীতে একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপনা আবশ্যক।

এই তো গেল যাঁহারা গৃহিণীর কর্ত্তব্য গ্রহণ করিবেন, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ কালকার দুঃসময়ে অনেক নারীকে বাধ্য হইয়া এবং অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জীবন সংগ্রামে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। ইহাদিগের জন্য এক শিক্ষা বিভাগের দ্বার উন্মুক্ত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী এমনি অসম্পূর্ণ, এবং শিক্ষাদানকার্য্য এমনি বিক্ষিপ্ত রূপে সম্পন্ন হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও, পরে অধ্যাপনার নিমিত্ত অপরিমিত শ্রম করিতে হয়। অনেক সময় একজনকেই সাহিত্য গণিত মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা দিতে হয়। ইহা সাধারণতঃ একজনের পক্ষে বড় দুরূহ ব্যাপার ; এই নিমিত্তই একজনের দ্বারা সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাহিত হওয়া আশা করা যায় না। ইংলণ্ড, জর্ম্মাণি, প্রভৃতি দেশে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহারই অনুকরণ করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সে দেশে যাঁহারা অধ্যাপনা কার্য্য জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ শিক্ষার পর বিশেষ করিয়া এই কার্য্যের জন্য শিক্ষিত হইতে হয় ; পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এই কর্ত্তব্যে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হয়েন

এবং শিক্ষাবিভাগে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী রূপে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।

বাগদেবী এবং লক্ষ্মী সপত্নীর চির স্বাতন্ত্র্য-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগের গৃহ-মন্দির প্রতিষ্ঠিতা বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা-গুলির সেবায় রত হউন, আবার যাঁহারা জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারাও যেন ভুলিয়া না যান জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী হইয়াও শতদলবাসিনী।

অন্তঃপুর, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন[১]

আজকার দিনে স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক, এ কথা বলিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা প্রতিদিনের জীবনে এই শিক্ষার অভাব এত অধিক অনুভব করিতেছি যে এই কর্ত্তব্য কত সত্বর সুচারুরূপে ক্রমে অগ্রসর করিতে পারি তাহাই ভাবিবার বিষয়। দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আবশ্যক প্রাণধারণ সম্ভবপর হয় : কিন্তু দারুণ অভাবের দিন যখন অতীত তখন যেমন আহার্য্য সম্বন্ধে আমরা সাবধান হই, এখন শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল এদেশে পুরুষ-পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা চলিয়া আসিতেছে— ইহাতে আমাদের অনেক অভাব দূর হইলেও অনেক অভাবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্র পতিত হয় নাই। তাঁহারা এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন আপন সুবিধার জন্য— আমরা এখন ইহা চাহিতেছি নিজস্ব শক্তির বিকাশের জন্য— স্ত্রী এবং পুরুষে যে বৈশিষ্ট্য বিধিদত্ত, তাহা রক্ষা না করিলে তাহা অশিক্ষা না হইলেও কুশিক্ষায় পরিণত হয়। কাজেই শিক্ষা যে-ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আর সে ভাবে চালানো চলিবে না ; পরীক্ষা পাস করিয়া যে বিদ্যালাভ হয় তাহাতে আমাদের অভাব পুরে না, অনেক শিখিবার বিষয় পরে শিখিতে হয়, তাহাতে জীবনের সামঞ্জস্য হয় না। স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার ভার মাতৃজাতিকেই লইতে হইবে। এই অভাব পূরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে আমাদিগকেই।

আজ দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এই ভার গ্রহণ করিয়া দেশের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে। অনেক ত্রুটিপূর্ণ ও বহু অভাবগ্রস্ত হইলেও এই কাজটির একমাত্র গৌরব— ইহা সম্পূর্ণ নারীশক্তিপরিচালিত। ইহার বিস্তার এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া আশা হইতেছে শ্যামলা বঙ্গভূমির বুকে এই যে ক্ষুদ্র বীজটি রোপিত হইয়াছিল, আজও যাহা অঙ্কুরের ন্যায় ক্ষীণ দুর্ব্বল ও সুকুমার তাহা একদিন মহীরুহে পরিণত হইয়া ছায়া, আশ্রয়, ফুল-ফলদানে দেশকে নন্দিত করিতে পারিবে। আজ আমি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সেবিকারূপে আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি। মনে নিশ্চিন্ত আশা পোষণ করি যে কখনই বঞ্চিত হইব না। বর্ত্তমানে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধীনে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত

হইতেছে। পূর্ব্বে দুইটি ছিল, গত বৎসর চৈত্রের প্রথমে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি নূতন শাখা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দিনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫টি, এখন অন্যূন ৫০টি। শিয়ালদহ কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ডিসেম্বর মাসে ৭০টি এবং বহুবাজার কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ে গত বৎসরের শেষে ছিল ৬৫টি। মির্জ্জাপুর স্কুলে দুইজন এবং শিয়ালদহ ও বহুবাজার বিদ্যালয়ে তিনজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। ভবানীপুরে অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে ৪জন ও কলিকাতা অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে ৫জন শিক্ষয়িত্রী কার্য্য পরিচালনা করেন। ভবানীপুরের অন্তঃপুর-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ আর কলিকাতা অন্তঃপুর-বিভাগের ছাত্রী-সংখ্যা ৪৫টি। বৎসরে দুইবার করিয়া স্কুলে ও অন্তঃপুরে পরীক্ষা করা হয় এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক ও পদক প্রভৃতি দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের উৎসাহ বাড়াইবার চেষ্টা করা হয় এবং এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া পুস্তক পরিবর্ত্তন করা হয়।

তিনটি স্কুল ও দুইটি অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগ ব্যতীত ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের নিজস্ব একটি শিক্ষয়িত্রী-ভবন আছে। তাহার ব্যয় কতক ব্যাঙ্কস্থিত টাকার সুদ হইতে ও কতক ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের আয় হইতে পূরণ করা হয়। সকলপ্রকার ব্যয়, বিশেষতঃ গাড়ীভাড়ার ব্যয় এত অধিক হইয়া পড়িতেছে যে কোনরূপ ব্যয়-সঙ্কোচ না করিলে সমিতির বিশেষ কার্য্যহানির সম্ভাবনা। তাই সাধারণের নিকট এই আশ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করি— যিনি যাহা দান করিবেন শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল

কিছুদিন পূর্ব্বে মাতৃমন্দিরের কোনও প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় বঙ্গদেশে নারীর দেশহিতকর কার্য্যের দৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] নানা কারণে হয়ত বঙ্গনারী অন্য প্রদেশের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই—তবুও তাহার কাজের কোঠায় একেবারেই যে শূন্য পড়িয়াছে তাহা স্বীকার করিতে পারি না। যে কয়েকটি কাজের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ তাহারি কথা বলিব—কেন না জানা কথা লেখা ও বলা সহজ এবং সত্যের অপলাপ হইবার সম্ভাবনা কম।

আজ তের বৎসর আগে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের স্থাপনা হয়। ইহার উদ্যোগ আয়োজন ও প্রথম প্রতিষ্ঠা শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী করেন। তিনি বঙ্গদেশেরই কন্যা— তাহার পর এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন প্রাতঃস্মরণীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসী। যাঁহারা তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যান নাই কি পরিমাণ পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের বলে কাজটি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে অন্তঃপুর শিক্ষার ভার মিসনারি ইংরাজী মহিলা কিম্বা খৃষ্টান গুরুমায়েদের হাতে ছিল, তাঁহারা অতি অল্প বেতনে, অন্তঃপুর শিক্ষার

সহিত খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিতেন। বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা বহুল পরিমাণে এই সম্প্রদায়ের নিকট ঋণী তাহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তবে দেশের ইতিহাসে একদিন এমন সময় আসিল যখন সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল এদেশের শিক্ষা বিশেষ অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা স্বদেশিনী শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়—সেটা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের যুগ। তাহার পর এক যুগ চলিয়া গিয়াছে, অনুষ্ঠানটি মরে নাই—আর এই কালের মধ্যে কত সভা সমিতি উঠিয়াছে, গিয়াছে তাহা সংখ্যা করা কঠিন। ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা সেই যে দেবতার ব্রতের ন্যায় এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত জীবনের শেষমুহূর্ত পর্য্যন্ত তাহা বহন করিয়াছেন। নিষ্ঠুর নিয়তি অসময়ে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল, আরব্ধ ব্রত উদযাপন করিবার অবসর আর দিল না। প্রথমে যখন অন্তঃপুরশিক্ষার ভাঁর ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের হাতে আসে তখন শিক্ষয়িত্রী লাভ সহজ ছিল না, দেবী কৃষ্ণভাবিনীর সাহচর্য্যে ও দৃষ্টান্তে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অবস্থাপন্ন ধনীপরিবারের অন্তঃপুরে গিয়া শিক্ষাদান করা সহজ ব্যাপার নয়, অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, হয়ত তাঁহাদের আত্মসম্মান বজায় থাকিবে না। যাহাই হোক, আনন্দের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি এই দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরের কাজের মধ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহাতে আমাদের লজ্জিত কিম্বা দুঃখিত হইতে হয়। সর্ব্বত্রই তাঁহারা শিক্ষাগুরুর যোগ্য শ্রদ্ধা ও বন্ধুর ন্যায় প্রীতিলাভ করিয়াছেন। ইহা গুরুশিষ্য উভয়েরি সৎস্বভাব ও সুবুদ্ধির পরিচয় সন্দেহ নাই। শিক্ষাসূত্রে তাঁহাদের মধ্যে যে স্নেহের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা আর বিযুক্ত হইবার কারণ ঘটে না।

স্ত্রী-মহামণ্ডলের মূল মন্ত্র নারীশক্তি উদ্বোধিত, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নারীজীবনের অভাব মোচনের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত করা। প্রথম স্থাপনার পর কেবল মাত্র অন্তঃপুর শিক্ষা ও নারীশক্তি যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল হয় সেজন্য ত্রৈমাসিক সভায় এ বিষয় প্রচার করা হইত, শিক্ষিতা নারী দেশে বিদেশে নারীশক্তির যে বিকাশ ও যে কাজ দেখিয়া আসিয়াছেন তাহার বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। এ সকল বিষয়ে লোকমত কতক প্রতিষ্ঠালাভ করিলে দুইটি প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছিল, এই বিদ্যালয়গুলিতে দেশের অনুকূল শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকাগণ যাহাতে জ্ঞানের শক্তি বুঝিতে সমর্থ হয় এবং ক্রমে আত্মোন্নতির চেষ্টা করে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। ছাত্রীগণ শিল্প, সঙ্গীত, বাংলা, ইংরাজী, প্রাথমিক সংস্কৃতপাঠ, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, পুরাণাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। বাংলা সাহিত্য বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নৈতিক উৎকর্ষের দিকে মনযোগ করা হইয়া থাকে। বিবাহের পর ছাত্রীগণের শ্বশুরপক্ষ হইতে তাহাদের শীলতা নম্রতা সুশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ প্রশংসাবাদ শোনা যায়। বর্ত্তমানে সভাসমিতি অপেক্ষা নীরবে কাজে নিযুক্ত থাকা সুবিধা জ্ঞানে সভাসমিতি না করিয়া ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি করা হইতেছে।

অন্তঃপুর শিক্ষাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য, ইহা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন

দিবার বিষয় নয়, কাজকেই কাজের বিজ্ঞাপন বলিয়া জানি, সেই জন্যই এই সমিতির কাজের কথা বাহিরে তত প্রচার নয়। ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল নিম্নলিখিত বিষয়ে নারী মাত্রকেই সাহায্য করিয়া থাকেন।

১। শিক্ষয়িত্রী গ্রহণ।

২। বিপন্ন নারী মাত্রকেই কাজ দিয়া কিম্বা অর্থ দিয়া সাহায্য।

৩। নারীদিগের শিল্পাদি বিক্রয় ও তাঁহাদের জন্য গৃহস্থ পরিবারে যোগ্য কাজের ব্যবস্থা।

৪। নিঃস্ব অবস্থার বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষাদান।

সম্প্রতি ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা দশজন—বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা আট জন, অর্থ ও লোকাভাবে এখনও কলিকাতার বাহিরে কাজের বিস্তার করিবার সুবিধা হয় নাই। যে সকল শিক্ষয়িত্রীর আত্মীয় স্বজন বিদেশে থাকেন, তাঁহাদিগের বাসের সুবিধার্থে সমিতি ১৯২০ সাল হইতে একটি শিক্ষয়িত্রী ভবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এরূপ শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় এবং আর্থিক অসদ্ভাব বশতঃ শিক্ষয়িত্রী ভবনটি গত জানুয়ারী মাস হইতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের বিশেষত্ব এই যে ইহা সম্পূর্ণ নারী-শক্তি পরিচালিত অনুষ্ঠান। ইহার সমস্ত ব্যবস্থাই নারীগণের দ্বারা নিয়মিত। যে অর্থ সাহায্য তাঁহারা লাভ করেন তাহাও নারীদিগের স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধার দান।

পূর্ব্বে দু'একজন উদারহৃদয় বদান্য পুরুষ এই কাজের সাহায্যার্থে দান করিতেন, এখন তাহাও আর নাই। ইহাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। বিদ্যালয়গুলি ও অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটী হইতে আমরা বৎসরে প্রায় বার শত টাকা (১২০০৲) সাহায্য লাভ করিয়া থাকি। ইহা সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায়। মহামণ্ডলের মাসিক ব্যয় প্রায় বারোশত, দূরে দূরে অন্তঃপুর ছাত্রীদের জন্য শিক্ষয়িত্রী পাঠাইতে হয়, তাহাতে গাড়ী ভাড়া অনেক পড়ে—এমন অনেক পাড়ায় যাইতে হয়, যেখানে ট্রাম ইত্যাদি নাই, এবং ট্রামে যাইতে হইলে সঙ্গে একজন লোক থাকা আবশ্যক—তাহাতে কাজের অব্যবস্থা হইয়া যায়—কাজেই গাড়ী রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ ও নিপুণ উপায়। কার্য্যগতিকে শিক্ষয়িত্রীগণ অনেক সময় সন্ধ্যা হইয়া গেলে ঘরে ফিরিয়া আসেন, বিশেষ শীতের এই স্বল্পায়ু দিনগুলিতে।

সাধারণতঃ ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের সমিতিভুক্ত নারীগণের বাৎসরিক চাঁদা ১৲ টাকা ; পরিমিত সংখ্যা জন কত ৩৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক চাঁদা দিয়া থাকেন। এতদিন কাজের আয়ে কাজ চালাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই—সকলেই জানেন শিক্ষা ব্যাপারে আয় অপেক্ষা ব্যয় চিরদিনই অধিক পড়ে, গত দুই বৎসর চাঁদা কমিয়া যাওয়ায় মূলধনে হাত পড়িয়াছে, সে মূলধনও সামান্য, কাজেই সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

আমরা বঙ্গনারী, ঘরের ব্যবস্থা করিতে জানি, এ কাজ বংশানুক্রমে করিয়া আসিতেছি, আয় ব্যয়ে সামঞ্জস্য করিয়া দরিদ্র গৃহিণীও সংসার কোনরূপে চালান—

কিন্তু সংসারের বাহিরে উদারতার ক্ষেত্রে কাজকে গড়িয়া তোলা, নিয়মিত করিয়া স্থায়ী করার শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—কেন না আমাদের জীবনে এটি নূতন অভিজ্ঞতা, অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা বহিয়া চলিতে চলিতে যদি কূল মিলিয়া যায় তবে সৌভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তবু ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের সমস্ত অনুষ্ঠানকে কেবল মাত্র নারী-শক্তির দ্বারাই পরিচালিত করিতে চাই ও করিব, জানি অনেক ত্রুটী আছে, অনেক অব্যবস্থা ও অনিয়ম হইয়া যায়। পরিশ্রমের ভাগ না হইয়া একজনকেই বহু ভার বহিতে হয়,তবে ইহাও জানি সম্মুখ ভবিষ্যতে সঙ্ঘবদ্ধ নারীশক্তি নিশ্চয়ই দেশের ও দশের কাজে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া চরিতার্থ লাভ করিবেই। আজ অঙ্কুরে যাহা ক্ষীণ কেবলমাত্র পোষণের প্রতিপালনের ও প্রতীক্ষার বস্তু, তাহা একদিন ছায়ার আশ্রয়ের নির্ভরের অটল মহীরুহ না হইয়া যাইবে না—সেই সুদূর কিম্বা অদূর কে বলিতে পারে—শুভদিনের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া আমরা চলিয়াছি। দেশের মাতা বধূ ভগ্নি ও কন্যাগণ তোমাদেরই সাহায্য প্রার্থনা করি, তোমরাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক, নির্ভর ও আশ্রয় হও। যাহার অর্থ আছে দান কর, যাহার বিদ্যা আছে বিতরণ কর, যাহার শিল্পকুশল নিপুণ লক্ষ্মীহস্ত আছে কারুকার্য্য দান করিয়া আমাদের ভাণ্ডারের দৈন্য দূর করিয়া দাও।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন এই যিনি যাহা দান করিবেন সম্পাদিকা ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল ৪৬নং ঝাউতলা রোড বালীগঞ্জ কলিকাতা এই ঠিকানায় সম্পাদিকার নিকট পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে। এই নারীঅনুষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবার ভার আমি বঙ্গনারীদিগের হস্তেই অর্পণ করিলাম। বারান্তরে অন্য একটি নারী প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিবরণ আপনাদের জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

মাতৃমন্দির, মাঘ ১৩৩০ :

পুরুষ-গঠিত পৃথিবী[৩]

১ম অধ্যায় (মানবতার দিক হইতে)

ভাল মানুষ, নিতান্ত নিরীহ মেষজাতীয় জীব হ'তেই কথাটা সুরু করা যাক্। এ জীবটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। খৃষ্টধর্ম্মে মেষ নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, পবিত্র বলে পরিগণিত। শিল্পী, চিত্রকর এই জীবটিকেই নিরীহতার প্রতীক-স্বরূপ খাড়া করেন। সভ্য মানবের কাছে, বিশেষ শীতপ্রধান দেশে, চণক-পরিপুষ্ট মেষ-মাংস শুধু উপাদেয় নয়, প্রধান খাদ্য বলিয়া গণ্য। মেষ রোমজাত বস্ত্র শীতনিবারক। প্রতিদিনের জীবনে সঙ্কোচ ও নির্ব্বুদ্ধির উদাহরণ দিতে হ'লে আমরা প্রায় সর্ব্বদেশেই ইহার উল্লেখ করি!

গোচারণ-প্রান্তরে কিন্তু এই গো-বেচারী জন্তুটি বিভীষিকাস্বরূপ। ঘষা খাটো দাঁত দিয়ে কুট-কুট ক'রে নিয়ত কেটে, অনবরত পা দিয়ে দলে, তরুলতা, তৃণ-গুল্ম, বনানী একেবারে নয়-ছয় করে ফেলে। জনশূন্য বিশাল প্রান্তরে এই জীবের পরিচর্য্যারত মেষ-

পালক উন্মাদদশাগ্রস্ত হয়। তার কারণ— মানুষ-সঙ্গের অভাব, মেষ-পালের বৈচিত্র্যবিহীন আকৃতি ও প্রকৃতি।

পাশ্চাত্য কবি মেষশাবকের চটুল চরণ-চারণ, নৃত্যশীল গতিলাস্য-অভিনয়ে একেবারে মুগ্ধ। ধর্ম্মসঙ্গীতে কিন্তু প্রচুর শব্দ সহযোগে প্রচারিত হয় যে আমরা দুর্ব্বল মানবেরা যখন মেষের মত বিপথগামী হই, তখন সেই করুণাময় পরিত্রাতা মেষপালকের মতই আমাদের সুপথগামী করেন, "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" —এই মন্ত্রে দীক্ষা দেন।

বৈজ্ঞানিকের কাছে এই জন্তুটির পর-পদাঙ্কানুসরণবৃত্তির বিশেষ মূল্য আছে— 'গড্ডালিকা-ন্যায়' এই পর্য্যায় জীবের মত অপরে বোঝে না। শোনা যায়, দলপতির নির্দ্দেশে চলা-ফেরা করবার এই যে জন্ম-গত সংস্কার, এ নাকি বহুজন্মের অভিজ্ঞতালব্ধ। দুর্গম বনপথে, দুরারোহ গিরিসঙ্কটে, গিরি-গাত্র-সংলগ্ন সঙ্কীর্ণ প্রস্তরখণ্ডে, গভীর কন্দর-পার্শ্বে বহুশতাব্দী ধরে পরিভ্রমণের সময় নেতা এদের পথ-প্রদর্শক। তিনি যেখানে যেভাবে অগ্রসর হ'য়ে নিরাপদ হন, অন্যে তারি অনুসরণ করে প্রাণ রক্ষা করে, অন্যথা মৃত্যু। এই কারণে এদের 'গড্ডালিকা-ন্যায়', এমন জড়সড় হ'য়ে গিয়েছে।

এই সব, আর এইসঙ্গে আরো অনেক কথা মেষ-প্রসঙ্গে মনে আসে। মেষ বল্‌লে, মেষদম্পতি, স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই বোঝায়, কিন্তু তাতে কি ? ভেড়া বল্‌লে, আমরা সব ভেড়াকেই বুঝি, সেই নির্ব্বিকার জীব—যে সুরসাল মাংসের, ঘন পশমের, ও সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ নির্বুব্দ্ধিতার সত্ত্বাধিকারী। যদি আমরা মেষরক্ষক সারমেয় কিম্বা সরমা, মেষ-পালক-পালিকা, নিউজিলাণ্ডের হিংস্র "কী" পাখীর কথা মনে করি, যারা দল সাজায়, রক্ষণাবেক্ষণ কিম্বা ভক্ষণ করে, তাদের কাছে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, সবাই সমান রক্ষণীয়, পালনীয়, ও ভক্ষণীয় দ্রব্য। যখন মাংস, পশুরোম, সাধারণ আকৃতি-প্রকৃতির কথা স্মরণ করি তখন পুংস্ত্রী বিচার থাকেনা। গো, মেষ, মহিষ, অশ্ব, মার্জ্জার, সারমেয়, যে কোন জীবই হোক্‌না কেন, তাদের সমগ্র জাতি হিসাবে দেখি, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে নয়। মেষ-প্রসঙ্গে দেখা যাক, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে কোন তারতম্য আছে কিনা। আমরা দেখি, পুরুষ অধিকতর যুদ্ধদ্বন্দ্ব-প্রিয়। পায়ে মাটী খোঁড়ে, বীরত্বব্যঞ্জক বিবিধ অট্টরবের সৃষ্টি করে। গুঁতিয়ে দেবার অভ্যাসটি তার বিশেষ রকম আছে। বৃষ, মহিষ, ছাগ মহাশয়দিগেরও এ গুণ দেখা যায়। এই যে যুদ্ধপ্রবৃত্তি এটা জাতীয় লক্ষণ নয়, শৃঙ্গবিশিষ্ট যে কোন পুরুষপ্রবরের নিদর্শন।

দেহের যন্ত্র-বিশেষের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই মনোভাব, প্রবৃত্তির জন্ম হয়। আমরা যদি বিবর্ত্তনবাদের প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখ্‌তে পাই, তার অগ্রসর হ'য়ে আসার বহু সুদীর্ঘ পথে পুরুষ-জীবের এই যে বোধবৃত্তি, রাগতঃ ভাবে বারম্বার এবং বহুবার প্রতিযোধকে আঘাত-ব্যাপার, ইহাই যুগলশৃঙ্গ উদ্ভবের প্রধান কারণ।

অপর পক্ষে মেষপত্নী কিন্তু চিরদিনই শাবক-স্নেহ-মুগ্ধ,—তাহাদিগকে সযত্নে পরিপালন, দুগ্ধদানে পরিপুষ্টকরণ, এবং সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর ও যত্নবতী। শ্রীমতী ছাগী,

মহিষী, এবং ধেনু সকলের মধ্যেই এই গুণ পরিলক্ষিত হয়। এই স্বভাব বিশেষ করিয়া গবাদি জীবের স্ত্রীজাতি কেন, জীব জগতের সমগ্র স্ত্রীজাতির মধ্যেই দেখা যায়। পাখী যদিও স্তন্যপায়ী নয়, তবুও পক্ষী-মাতার মনেও সেই শাবক-স্নেহ, সন্তানবাৎসল্য বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। জনক বিহঙ্গবরের কিন্তু শৃঙ্গাভাবে যুদ্ধপ্রবৃত্তির কিছু মাত্র হ্রাস হয় না। পক্ষ, চঞ্চু, তীক্ষ্ণনখ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অস্ত্রসমূহ স্বদেহে ধারণ ও বরণ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হয়। তবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, বধূ-বরণ ব্যাপারে দেহের সৌন্দর্য্য-বিস্তার, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য-প্রচার, ও নৃত্যাভিনয়ের বৈচিত্র্য-প্রদর্শন করিয়া জয়যাত্রা সার্থক করে। তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়, তুষ্ট করিবার প্রয়োজন, ভাবীবধূর পক্ষপাতিতা-লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ, পুরুষ পক্ষীর অঙ্গসৌষ্ঠব, বর্ণবৈচিত্র্য প্রজাপতির মত মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। পালকের অগ্নিবর্ণ, শিরোভূষণের গৌরব, তাহার চূড়া ও মুকুট, দোদুল কণ্ঠহার, সুদীর্ঘ কলাপ, পক্ষী-প্রেয়সীর মনোহরণের জন্যই আবির্ভাব হয়। পক্ষিণীর পক্ষে যাহা কেবল পুচ্ছ মাত্রই, পক্ষীর দেহে তাহা বাসব-ধনুর বর্ণগৌরবযুক্ত পরিচ্ছদে পরিণত হয়। বন্য কুক্কুট, পালিত কুক্কুট, কলাপী ময়ূর, চটক হইতে উষ্ট্র পক্ষী পর্য্যন্ত সমস্ত পুরুষ পক্ষীই ইহার দৃষ্টান্ত। তাহাদের চলন, ধরণ, তাহাদের ব্যবহারই তাহার উদাহরণ। গর্ব্বিত পাদক্ষেপ, প্রেমমুগ্ধ মন্থরগতি, মন ভোলাইবার বিচিত্র ইঙ্গিত ও আস্ফালন পুরুষের বিশেষত্ব। এই সমস্ত সাজসজ্জা সর্ব্বথা সুবিধাজনক নয়, বরং আরামের বিরোধী, দ্রুতগতির অন্তরায়, কিন্তু 'কন্যা বরয়তে রূপং' কাজেই গত্যন্তর নাই, পুরুষকে এই পন্থা অবলম্বন করিতেই হয়। ইহা পুরুষের স্বভাব, কোন পক্ষী-বিশেষের বৈশিষ্ট্য নয়, সমগ্র পুরুষ-পক্ষীর প্রকৃতি। পক্ষযুগল দ্বারা, ঢক্কা-নিনাদ, কণ্ঠের কেকা শব্দ, সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মধুর আলাপ পক্ষিণীকে মুগ্ধ করিবার মন্ত্র। পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে প্রতিযোগিতার ও সংগ্রামের আহ্বান 'যুদ্ধং দেহি'র বাণী। আঘাত-গর্ব্বিত বিচরণ, সোর-গোল করিয়া আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার উপায়, প্রেমের অভিব্যক্তি। ইহা কেবল পক্ষীর নয়, সমগ্র পুরুষজাতির স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য।

এখন আমরা সাধারণ ভাবে বলিতে পারি, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে পুরুষ মাত্রেরি ইহাই পৌরুষ। স্ত্রী-জাতির যাহা বিশেষত্ব, তাহাও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে একই প্রকার। অণ্ডজ, গোজাতীয়, সারমেয়-মার্জ্জার, তুরঙ্গ-রাসভ, যে কোন পর্য্যায়ের জীবই হৌক না কেন, সবাই স্বভাবের বশ,তাহাদের লিঙ্গভেদ নাই।

কিন্তু দেখিতে পাই মানুষের মধ্যে সবাই বিপরীত। আমরা পুরুষ ও স্ত্রীর প্রভেদ এমনি বাড়াইয়া তুলিয়াছি যে আমাদের মনুষ্যত্ব যেন পলাইয়া গিয়াছে। আমরা জানি আমরা সকলেই মানুষ, মনুষ্যত্বের গর্ব্বও করিয়া থাকি, কিন্তু এই মনুষ্যত্ব যে কি, তাহা বিচার করিয়া দেখি না। কেমন করিয়া ইহার সীমা অতিক্রম করি, কিম্বা ব্যতিক্রম ঘটাই, তাহাও ভাবিয়া দেখি না—ভেদবুদ্ধিবশে পার্থক্যের উপরই সমধিক মনোযোগ করি। ইহা পুরুষোচিত, এইটি স্ত্রীসুলভ, এই কথাই প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু কিযে (য) মনুষ্যোচিত তাহা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

একেবারে চরম অবস্থায় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু ব্যাপারে আমাদের সহজ মনুষ্যত্ব

স্মরণপথে উদিত হয়—সেই সময়ই যেন আমরা যে মানুষ কার্য্যতঃ তাহাই প্রমাণিত হয়। কেননা অনুভূতি ও মনুষ্যত্বের প্রামাণ্য কর্ত্তব্য স্ত্রী ও পুরুষের যে অভিন্ন, সে কথা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সময় আমরা বিস্মৃত হই—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ?*

বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৩৫

২য় অধ্যায় (পুরুষ-গঠিত পরিবার)

মানবসমাজ গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই কারণেই ইহাকে সার্ব্বজনীন বলা যায় না। ডাকঘর, মানবতার ছাপমারা একটি সার্ব্বজনীন ব্যাপার, অন্য কোন জীবের ডাকঘর নাই ; কিন্তু বহু জীবজন্তু পশুপাখীর পরিবার আছে। অনেক রকমের পরিবার,—দশসালা, মৌরসী, সালিয়ানা, একপত্নীক, বহুপত্নীক, বহুভর্ত্তৃক প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র ব্যবস্থার পরিবার।

মানুষের মধ্যে এই পরিবারগঠন-ব্যাপার এখন আমাদের পর্য্যালোচনার বিষয় ; মানবতার মধ্যে ইহার বুদ্ধিগত ক্রমোন্নতির ধারাটি কিরূপ, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ; যান্ত্রিক, মানসিক ও সামাজিক পর্য্যায় কেমন, প্রীতি ও সেবার ক্ষেত্রে বিস্তার কতখানি, পুরুষ-কর্ত্তার অধিকারে— 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে' এই অভিনব রাজ্যে ফলাফল কি হইল, তাহাও অভিনিবেশ ও বিচারের বিষয়।

সমস্ত প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠানের মতই পরিবার-গঠনেরও একটি উদ্দেশ্য আছে, ফলাফলের দ্বারাই তাহার যোগ্যতার পরিমাপ করা হয়। এই উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শিশু-মানবের পরিচর্য্যা ও প্রতিপালন। অসহায় শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদের আহার্য্য ও নিরাপদ আশ্রয়দান, অপরিণত বয়স-কালের জন্য অপকার হইতে রক্ষা করিয়া জাতির উন্নতি-সাধন, মূলতঃ ইহাই পরিবার গঠনের লক্ষ্য।

প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান যখনি মানবতার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়, তখনি তাহা চেতন-জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করে ; তাহার সম্বন্ধে আমরা ভাবিতে আরম্ভ করি, এবং আমাদের নবাবিস্কৃত স্বেচ্ছাশক্তির প্রেরণায় তাহার জন্য কাজ করিতে লাগিয়া যাই। পরিবারে আমরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটাইয়াছি, আমরা বলিতে এখানে নারী বোঝায় না, বিশেষ করিয়া পুরুষই সে সম্বন্ধে কার্য্যকর্ত্তা।

ফরাসী-লেখক ব্যালজাক তাঁহার তীব্রতিক্ত ভাষায় বলিয়াছেন, "নারীর সতীত্ব, পুরুষের সর্ব্বপ্রধান ও চতুরতম উদ্ভাবনা।" ব্যালজাক কিন্তু ভুল করিয়াছেন, কেননা সতীত্ব, একনিষ্ঠা, একমাত্র জীবনসঙ্গীর প্রতি অবিচলিত প্রেম, বহু বিহঙ্গ ও স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যেই সাধারণভাবে দেখা যায়। যদি ব্যালজাক কৌমার্য্যরক্ষা অর্থে সতীত্ব শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহাই যে পুরুষের উদ্ভাবনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; তাই বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না যে এইটিই পুরুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

---

* Charlotte Perkins Gilman-এর *Man-Made-World* অবলম্বনে।

পরিবার সম্বন্ধে পুরুষ যাহা করিয়াছেন, স্থূল ভাবে বলিতে গেলে তাহা এই দাঁড়ায়—পরিবারকে সন্তানপালনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া আত্ম-সুবিধা-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়স্বরূপে নিয়োগ করিয়াছেন। স্বকীয় আরাম, স্বীয় ক্ষমতা ও গর্ব্ব-পরিচালনার অবিসম্বাদী ক্ষেত্র।

'অচলায়তন' প্রাচ্যদেশের কোটী-কোটী অবিচল জনসঙ্ঘের মধ্যে সন্তান, বিশেষ করিয়া পুত্রসন্তান-লাভ পিতার পক্ষে প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের বিষয়। কেন না, বংশরক্ষার দ্বারাই পিতৃপুরুষের খ্যাতি ও কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, কাজেই জনকের পক্ষে তাহা বিশেষ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু পিতৃপুরুষের এই প্রেতপূজা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ,—পুরুষেরি সৃষ্টি। প্রকৃতি ভবিষ্যের কল্যাণ-কামনা করে, অতীতের ধার ধারে না। ইউরোপের মধ্যযুগের পিতৃত্ব-গৌরব-রক্ষার পক্ষপাতী জাতিগুলির মধ্যে এ ভাবের প্রভাব প্রবল, মার্কিন দেশেও বর্ত্তমান যুগে এই ভাবের পরিপোষক দু'একটি বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত বিরল নয়। "অতীত গৌরব-বাহিনী বাণী"র অতিপ্রচার প্রাকৃতিক কিম্বা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

পূর্ব্বপিতামহদিগের অপেক্ষা অগ্রসর ও অধিকতর উন্নতি অর্জ্জন করাই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—সেই লক্ষ্য ধরিয়াই সম্মুখের পথ চলা আমাদের কর্ত্তব্য। অতীতকে যখন আমরা পথ চলিবার দিগ্‌দর্শন গ্রন্থস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, মহদানুভব, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদুন্নতিকল্পে নিয়োগ করি, তখনি সকল প্রকার উন্নতি সত্বর আমাদের আয়ত্তাধীন হয়।

পুরুষের প্রাধান্যবশতঃ পাবিবারিক ব্যাপারে যে সকল পরিবর্ত্তন ধটিয়াছে তাহা সহজেই চোখে পড়ে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় পুরুষের জন্মগত বিশেষত্ব স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য :— প্রবৃত্তির প্রাবল্য, যুদ্ধস্পৃহা ও আত্মপ্রকাশ, তাহাদের পক্ষে সীমার মধ্যে সর্ব্বত্রই এই মনোভাবের পরিপোষকতা বিধিসঙ্গত ও উচিত সন্দেহ নাই। সীমানা ছাড়া হইলেই এই সকল স্বাভাবিক বৃত্তি অমঙ্গল ও অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই মনোভাবের প্রেরণাতেই স্ত্রীজয়ের জন্য পুরুষ—কোকিল ও মার্জ্জারের মত সঙ্গীতের উৎসাহে দিশাহারা হয়, ময়ূর ও ঝাপ্পাঝোপ্পাধারী প্রাণীবিশেষের মত অপরিমিত সজ্জায় সময় ও অর্থের অপব্যয় করে ; দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া কুরঙ্গ তাহার শৃঙ্গ ও মানুষ তাহার বর্ষার ব্যবহারে ঝণৎকার ও চমৎকারের সৃষ্টি করে।

আশা করি, কোন পাঠক-পুরুষ এই সকল বিশেষত্বের বারম্বার উল্লেখে অভিমান করিবেন না। স্ত্রীসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীতে স্বভাবতই তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহেরই উল্লেখ, আলোচনা ও সমালোচনা করা হইয়াছে এবং হয়। যদিও নারীজাতি বারম্বার স্ত্রীজীব বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় অধুনা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তবুও এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী পুরুষও স্বভাবের বর্ণনায় আপত্তি করিতে পারেন না, অন্ততঃ আপাততঃ পারেন না এবং ভবিষ্যতে এখনও কয়েক শতাব্দী পারিবেন না।

এই সকল পুরুষ-মনোবৃত্তি, যুদ্ধস্পৃহা, আত্মপ্রকাশের আগ্রহ, দৈহিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য কি ভাবে পরিবার ও গৃহের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বিবেচ্য, বিশেষ

যখন পুরুষের হাতেই ক্ষমতার আধিক্য—তিনিই প্রতি সংসারের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা।

যৌননির্ব্বাচন ব্যাপারই প্রাথমিক কথা। প্রাকৃতিক ব্যাপারে যৌননির্ব্বাচনই উন্নতিপথের প্রথম সোপান। পুরুষজীব বহুল ও বিচিত্র ; বীর্য্য-সহায়তায় বিবিধ সৃজন-ব্যাপারে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ঘটায়, স্ত্রীজীবের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে, স্ত্রী বিজয়ীকেই বরমাল্যে গৌরবান্বিত করে, ইহার ফলে নবজাত সন্তান সংস্কৃত ও নবতর গুণাবলীতে ভূষিত হইয়া থাকে। পুরুষ-কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিবার গঠিত হইলে এ প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না—নির্ব্বাচন-ব্যাপারে ইতি, ও স্বয়ম্বরণের মরণ হয়। পুরুষ শারীরিক কিম্বা আর্থিক সামর্থ্যের জোরে হয় স্ত্রীহরণ করে নয়ত পণ্যের মত স্ত্রী ক্রয় করিয়া আনে ; তাহার পদ্মিনী কিম্বা হস্তিনী যে নারীকেই মনে ধরে তাহাকেই বাছিয়া লয়। প্রকৃতি কিন্তু নির্ব্বাচন-ভার তাহার হাতে দেন নাই, এ ক্ষমতা তাহার নাই ; স্ত্রীলোকও বরবরণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য জন্মে নাই—এ বিষয়ে সে শক্তিহীনা। পুরুষের মত জীবনসঙ্গী-সংগ্রহে সংগ্রাম করিবার শক্তি তাহার বিধিদত্ত ও স্বাভাবিক নয়। যদি সঙ্গিনীলাভ চেষ্টার দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিতে হয় তবে যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জয়মাল্য তাহারই ভাগ্যে জোটে, আবার যদি একটি পুরুষজীব দশটি স্ত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে তবে তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা মন্থরগতি সেই ধরা পড়ে—পুরুষ তাহাকে লইয়াই পলায়ন করে। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জাতির দ্রুতগামিতা বৃদ্ধি পায়, শেষোক্ত পন্থায় তাহা হয় না বরং ফল বিপরীত দাঁড়ায়। যদি অনেকগুলি পুরুষ একটি নারীর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তবে বীরশ্রেষ্ঠ তাহাকে অর্জ্জন করে ; কিন্তু পুরুষ যদি সঙ্গিনী লাভাশায় নারীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় (এরূপ অস্বাভাবিক ও বীভৎস ব্যাপার শুধু মানুষের মধ্যেই দেখা যায়), তবে সে সহজেই সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু ও অবলাকে পরাভব করে। পুরুষে পুরুষে যুদ্ধে জাতির শক্তি বর্দ্ধিত হয়, পুরুষ ও নারীর যুদ্ধে জাতির অবনতির পথ প্রসার পায়।

যে সময় হইতে নারী পুরুষের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বৈবাহিক সম্বন্ধে হয় পণ্যের, নয় পিতার অভিপ্রায় মত সম্প্রদানের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন হইতে সে তাহার বিধিদত্ত অধিকার, ও আদিম নির্ব্বাচনশক্তি হারাইয়া মূল্যহীন ও দরিদ্র হইয়াছে। এই বিষম পরিবর্ত্তনের দ্বারা, স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা লুপ্ত হওয়ায় পুরুষের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ ; নারীর অবনতির ক্ষেত্র অবারিত, কেন-না পুরুষের চক্ষে যাহা লোভনীয় তাহাই সে মনোনীত করিয়া লয়—জাতীয় উৎকর্ষের দিকে আর দৃষ্টি দেয় না।

উত্তর আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশে কিশোরীদিগকে লম্বোদরী, পৃথুজঘনা, স্থূলকটি করিবার জন্য তৈলবহুল বিশেষ কোন ফল খাওয়ান হয়, ফলে তাহারা বেশ ফুলিয়া ওঠে—বুদ্ধি ও রূপের ধারে নয়, মাংসের ভারে বিকায়। তখন তাহাদের বিবাহের খুব সুযোগ হয়, কেন-না সে দেশে পুরুষেরা ঐরূপ মাংসপিণ্ডের পক্ষপাতী। আফ্রিকার অন্যান্য স্থানেও সর্দ্দারের পত্নীদিগকে গৌড়ীয় খাদ্যে পরিপুষ্ট করিয়া পতিপ্রবরের

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও রোচক করিয়া তোলা হয়। জার্ম্মাণদেশীয় ঔদরিকগণও এই একই উপায়ে হংস পরিপুষ্ট করিয়া শূল্য-মাংসে রসনার পরিতৃপ্তি-সাধন করেন। স্থূলতা জাতীয় উৎকর্ষ-ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় উপাদান নয়। ইহার দ্বারা নারীর কিম্বা শিশুর সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পায় না। ইহা কেবল অধিকারী মহাশয়ের মনস্তুষ্টির উপায়স্বরূপ—চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়ের মত নারী-মাংসের রসালতা সম্ভোগের সামগ্রী।

এ সম্বন্ধে একেশ্বর কর্ত্তার মনোভাব, পাশ্চাত্য কবি সিল (Sill) পাঁচ-প্রাণ নামক আজব কবিতায় লিখিয়াছেন,

বরাঙ্গী সে রমণীর মরি মরি অরুণ অধর,
তনুকায়া তরুণীর টানা চোখ স্বপনের ঘর ;
খেলার পুতুল প্রিয়া, দিন কাটে তারে নিয়া,
আমায় মুঠার মাঝে দেহ-ঝারি রসের নির্ঝর।

নারীর অত্যধিক তনিমা, অতি রম্যতা, ইহা পুরুষ-চাহিদার ফলে আমদানী হয়—পুরুষকেন্দ্রীয় সভ্যতার পরিণাম।

ইহার পরে, অংশতঃ ইহারই ফলে মাতৃত্বের উপযোগিতার কথা আসিয়া পড়ে। এই মাতৃত্বের উপযোগিতাই পরিবার-নির্ম্মাণের বনিয়াদ, প্রথম ও প্রধান সার্থকতা বলিয়া বিবেচিত হইত। পরিবার তখন মাতৃত্বাধীন রাজ্য ছিল, পিতা সে রাজ্য পরিচালনায় সহায়ক, নায়ক কিম্বা সম্রাট ছিলেন না ; পরিবার যখন হইতে পিতৃত্বাধীন, পুরুষ যে কাল হইতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইল, তখন হইতেই পরিবার-নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। নারী পুরুষের বিলাস-সামগ্রীরূপে পণ্য ও গণ্য হইলেন—পুরুষের দেহ ও মনে রঞ্জনের প্রধানতম উপাদান। জননীহিসাবে মূল্যবান হইলেও মূলতঃ তাহাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। জনকই সন্তানের অধিকারী, তাহাদের জননীর মতই পুত্রকন্যাও তাহারই সম্পত্তি। পরিবারের সমস্ত শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য নারীর আদিম ও ন্যায়তঃ অধিকারচ্যুত হইয়া, পুরুষ-কর্ত্তৃত্বে হস্তান্তরিত, কবলিত ও তাহারই সেবায় নিয়োজিত হইল। আজ পর্য্যন্ত আমরা পুরুষ-কর্ত্তৃত্ব প্রভাবিত পরিবারে বাস করিতেছি, পত্নীকে পতিপুত্রের সেবিকারূপে বাস করিতে হয়—ইহাই তাহার বিশেষ কর্ত্তব্য। তবে মাতৃত্ব অপেক্ষা পাতিব্রত্য-কর্ত্তব্যই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য বেশী দূরে যাইবার আবশ্যক নাই। ভারতপ্রবাসী ইংরাজ-নারী পুত্রকন্যাকে শিক্ষার্থে অপরের হাতে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সেবা ও সাহচর্য্যের জন্য বৎসরের পর বৎসর ভারতবর্ষেই বাস করেন। সাধারণতঃ স্বামী কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচন করেন, স্ত্রী যদি পুত্রকন্যার হিতার্থে, শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিবার ভয়ে সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন, কিংবা না যান, তবে স্বামী পত্নীর এই অস্বীকৃতি, পরিত্যাগ করার সামিল করিয়া লইয়া আইনতঃ বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে পারেন।

আবার দেখ, স্বামী যদি মদ্যপ কিম্বা ব্যাধিগ্রস্ত হন, স্ত্রীকে তবুও বাধ্য হইয়া

তাঁহার সহিতই বসবাস করিতে হয়, ইহাতে তিনি যে সন্তানের সম্বন্ধে অপরাধী হন তাহা কেহ গণ্যই করে না। সম্প্রতি যদিও সাধারণের মত এ সমস্ত বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তবুও পুরুষ-আয়ত্তাধীন পরিবারের প্রভাব আজিও সমভাবে অক্ষুণ্ণ আছে।

বঙ্গলক্ষ্মী, ভাদ্র ১৩৩৬

৩য় অধ্যায় (স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য)

আমাদের এই মানবজীবন-ক্ষেত্রে, যেখানে বহুবাদ শুনিতে পাই, তাহার মধ্যে, স্বাস্থ্য-ব্যাখ্যান প্রধানতম। আমাদের স্বাস্থ্যের হীন আদর্শ লক্ষ্য করিবার বস্তু। সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য, শক্তি ও জ্ঞানের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। সমস্ত প্রাণীই পঞ্চভূতের অত্যাচারে বিব্রত, এতদ্ভিন্ন অন্তর-বহিঃশত্রুর অভাব নাই—নিশাচর জন্তু, অহর্নিশির আততায়ী রোগের বীজাণু, একটি নয়, অদৃশ্য কোটী কোটী!

বন্য জন্তুদের মধ্যে প্রধানতঃ, উৎকর্ষের একটি সাধারণ আদর্শ আছে। তুমি যদি কোন ঋক্ষ কিম্বা পক্ষীকে শীকার কর, তবে দেখিতে পাইবে, সেটি সেই জাতীয় জীবের সাধারণ আদর্শের প্রায় অনুরূপ ; ভালুক কিম্বা পাখীটি দেখিয়া তুমি কখনই বলিবার সুযোগ পাইবে না,— "মাগো, কি বিশ্রী কুৎসিৎ, কিম্বা কি ভয়ানক কাহিল, কি বেহাল !"

যখন আমরা কোন বন্য পশুকে গৃহপালিত জীবে পরিণত করি, তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি সকলে বাধা দিই, তখনি রোগ সৃষ্টি করি। মানুষের পরই তাহার পালিত কুকুর— উত্তরাধিকারসূত্রে যেন প্রভুর রোগ ভোগ-দখল করিতেছে ; ইহার পরই আসে ঘোড়া।

কিন্তু যাহারা বন্য অবস্থায় আছে, তাহারা সৌন্দর্য্যের ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে আমাদের লজ্জা দেয়। তাহাদের অবয়বের সম্যক বিকাশে, দেহসৌষ্ঠবের সুষমায় চমৎকৃৎ ও মুগ্ধ হইতে হয়।

সভ্যতার শৈশবাবস্থায় আমরা বিশ্বাস করিতাম, আধি-ব্যাধি দৈবদুর্বিপাক। এখনও অনেকের এ ধারণা যায় নাই,—তাহারা মনে করে, মানুষকে উৎখাত করাই দেবত্বের বিশেষত্ব।

আমরা বলি—হায় হায়, ব্যথা-পীড়া জন্মঅধিকার, অস্থি-মজ্জাগত, সৃষ্টিকারের অব্যর্থ দান! এই, সবে কিছু দিন হইল, অনেক গবেষণা, বহু সংগ্রামের পর মানুষ স্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছে, যে, রোগ বিধাতার বিধান নয় বরং তাহার বিপরীত। এই শত্রুকে দমন ও হনন করিবার বহুবিধ উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছে।

এটা কিন্তু নিতান্তই সত্য যে আমরা, মানুষরা প্রত্যেকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কিম্বা স্বাভাবিক নই। আমাদের মুখাবয়ব সুষম নয়, দৃষ্টিশক্তি অনেকেরি ক্ষীণ, পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল, স্নায়ু খামখেয়ালী, সংক্ষেপে আমাদের মধ্যে যাহারা স্বাস্থ্যবান বলিয়াও পরিচিত,তাহাদের স্বাস্থ্যও কাজ-চলা গতিকের। মাথাধরা, ঘাড়ে ব্যথা, কোমর-

কন্‌কনানি— এমনতর উপসর্গ প্রত্যেকেরি কিছু না কিছু আছে। তা ছাড়া অকালমৃত্যুর অভাব হয় না। ব্যাপারটা যদি নিতান্তই অনর্থক না হইত, তাহা হইলে জীবনটা প্রকাণ্ড বিভীষিকায় পরিণত হইত।

সৌন্দর্য্য পদার্থটা নিতান্তই অপার্থিব ও দুর্লভ,তাই সাধারণ ক্ষেত্রে তাহা প্রত্যাশা করা চলে না। জনতার মধ্যে মুখের গঠন, শারীরিক সৌষ্ঠবের প্রতি যদি লক্ষ্য কর দেখিবে,— সচরাচর পুরুষে ও নারীতে যাহা দেখি, সৌন্দর্য্যের আদর্শে, আলেখ্যে চিত্রিত কিম্বা ভাস্কর্য্যে গঠিত প্রতিমা ও মূর্ত্তির সহিত তাহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ ; তখন মনে হয়,এই কদর্য্যতার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

পরিচ্ছদে আবৃত, দৃষ্টির অগোচর, দেহের সৌন্দর্য্যহীনতার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু যে দেহ-সজ্জা চক্ষের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে, তাহা কি স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের সহায় ? কর্ম্মক্ষেত্রের অনুকূল পুরুষ-পরিচ্ছদের কদর্য্যতা এবং নারীগণের কাজের বাধা-উৎপাদক হাস্যজনক আচ্ছাদন সৌন্দর্য্যের কোনও পোষকতা করে কি ? আমাদের আবাসগৃহ, এমন কি ঐশ্বর্য্যশালীর অট্টালিকাও যদি লক্ষ্য কর, তবে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও কি ?

সৌন্দর্য্যবহুল জগতে বসবাস করাই যে মানবজীবনের সার্থকতা, সৌন্দর্য্য-সাধনায় সকল জীবাপেক্ষা আমাদের দায়িত্বই যে অধিক তাহা কি আমরা কখনো ভাবিয়া দেখি ? আমরা এই সৌন্দর্য্যহীন, কদর্য্য গৃহাভ্যন্তরে এমনি অভ্যস্ত, ম্লান, অনুজ্জ্বল বর্ণ-সাম্যে এমনি মুগ্ধ, এবং তাহাই সুরুচির পরিচায়ক প্রমাণ করিতে এতই উৎসুক যে এক শিশু ও বালক ভিন্ন কাহারো যথার্থ সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সাহস পর্য্যন্ত নাই : — তবে এ সাহস অধিক কাল স্থায়ী হয় না, সভ্য পিতামাতার শিক্ষার গুণে অচিরাৎ লোপ পায়।

আমাদের কুশ্রীতা ও স্বাস্থ্যস্বল্পতার কারণ, কতকগুলি ব্যবসাবাণিজ্যের ফল স্বরূপে দর্শান হয়। হলধর কৃষক বলবীর্য্যের সাহায্যে অত্যধিক হল-চালনার ফলেই না কি বৃষভসাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় ; গৃহপ্রাচীর-চিত্রকর সীর্ষক-বহুল রঞ্জন-বস্তুর ব্যবহার দ্বারাই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। প্রত্যেক ব্যবসায়ের অধ্যবসায়ের পশ্চাতে বহুবিধ ব্যাধি মুখব্যাদান করিয়া আছে ; পুস্তক পাঠে সে সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি।

এই সকল কারণ একান্ত মিথ্যা নয় বরং কতক দূর পর্য্যন্ত সত্যই— কিন্তু এই কারণ দর্শাইয়া সকল সংশয়ের মুখ বন্ধ করা যায় না। কৃষকের শরীর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ন্যুব্জ ও কুব্জ হওয়া সম্ভব কিন্তু তাহার অজীর্ণ কিম্বা বাতব্যাধির কারণ নিশ্চয়ই নয়।

সব দোষই আমরা দারিদ্র্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হাল্কা হই— কিন্তু কেবল দারিদ্র্যই যে সকল দোষের মূল তাহাই বা বলি কেমন করিয়া ? যখন আমরা দেখি— গরীব প্রজা, চিরকাল কেটে গেল অর্দ্ধাশনে যার, তার স্বাস্থ্য মোটা-মাহিনাওয়ালা খাজাঞ্জির চেয়ে অনেক বেশী ভাল, যখন দেখি— কাঙাল চাষার বউ, ধনী জমিদার-গৃহিণীর

চেয়ে সুস্থ ও সবল প্রসূতি, তখন তো আর দারিদ্র্যের দোহাই কি অজুহাতে চলে না।

তার পর আমরা বলি অজ্ঞতাই সব কৈফিয়ৎ দিতে পারে, কিন্তু আমরা তো দেখি বিদগ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও কুশ্রী ও শ্বাসরোগী। ভিষকপ্রবরকেও ক্বচিৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কি স্বাস্থ্যবান দেখিতে পাই। ধনীর দুলাল, ঐশ্বর্য্যের প্রশ্রয়ে পোষিত ও পুষ্ট, জন্মাবধি যে অভাব কাহাকে বলে কখনো জানে না, সেও সুন্দর কিম্বা সুস্থ নয় বরং বরমাল্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অনধিকারী। বিশেষত্ব সকল মানিয়া লইয়া আদর্শের অপকর্ষ কেন হয় বুঝিলেও, এতদ্ভিন্ন আরও ব্যাপক ও সার্ব্বজনীন কিছু আছে, মানিতেই হইবে। আমাদের বহুপূর্ব্ব-পুরুষ পশুদিগের প্রতি দৃকপাত করিয়া একবার লক্ষ্য করা যাক, কেমন করিয়া তাহারা এমন স্বাস্থ্যবান হইয়া, জাতি-গোত্রের মান রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এই জাতি-গোত্রের পরিমাণ, আদর্শ— সাম্যতা স্বয়ম্বরণেরই পরিণাম। বসবাসের চৌহদ্দিবদলের সঙ্গে সঙ্গে বাসিন্দা যদি আপন অভ্যাস-অভিরুচি বদল করিতে না পারে, তবে সে রক্ষা পায় না, তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। যাহারা বাঁচিয়া যায়, এই বাঁচিয়া যাওয়াই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ তাহা আর সন্দেহ করা চলে না। যে সকল প্রাণী আজও এই পৃথিবীতে টিকিয়া আছে, আর যাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মরিয়াছে, তাহার মধ্যে জীবিতাবশেষগণকেই বিজয়ী বলিতে হইবে। হরিণের ক্ষিপ্র গতি, ক্ষিপ্রতার নৈপুণ্যেই রক্ষা পাইয়াছে, এবং তাহাকে চিরন্তনের জন্যই সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান করিয়াছে। চিত্রকের বিচিত্র কর্ম্মকুশলতাই তার মজ্জা-পেশীর সুষম সৌন্দর্য্যের ও সাবলীল গতির মূলে বিরাজিত। আজীবন আহার্য্য-সংগ্রহচেষ্টা, নিয়মিত দৈনিক পরিশ্রমের ফলেই সে তাহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে সফল হইয়াছে। আর একটি প্রবল প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে জীবজগৎ তাহার সাধারণ আদর্শ রক্ষা করিতে পারে—সে শক্তি যৌন-নির্ব্বাচন। প্রাকৃতিক জীবনে পুরুষ জীবই একমাত্র পরিবর্ত্তনশীল। তাহার দৈহিক শক্তি অথবা বীর্য্যের প্রাচুর্য্য সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির উপায় স্বরূপে শরীরে নানাপ্রকার অলঙ্কারের সৃষ্টি করে। যথা—ময়ূরের চন্দ্রলেখামণ্ডিত সুদীর্ঘ পুচ্ছ, কুক্কুট প্রবরের দোলায়মান আরক্তশীর্ষ মুকুট। এ পরিচ্ছদবাহুল্য প্রেয়সীর মনোহরণের আকর্ষণী যন্ত্র, ইহা স্বয়ম্বরসভার যোগ্য সজ্জা হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে সহায় স্বরূপে অভিপ্রেত নয়।

অপর পক্ষে স্ত্রীজীব সৃজনকালের বিধিদত্ত রূপ ও সজ্জা অতিক্রম করে না। কেননা বরমাল্যদান তাহার স্বেচ্ছাধীন, জীবজগতে যে পুরুষ আত্মপ্রভাব রক্ষা করিতে সক্ষম, স্ত্রীজীব তাহাকেই মনোনীত করে। পুরুষকে প্রবল প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বস্থলে বিজয়ী হইতে হয়, বাঁচিয়া ও বাড়িয়া উঠিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আপনাকে যোগ্যতম প্রমাণ করিতে হয়, ইহার ফলে প্রত্যেক পুরুষ জীব উন্নততর প্রবলতর জীবন-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে ; তাহাতে কেবল যে তাহার জীবনযাত্রার সুযোগ ঘটে তাহা নহে, সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠবেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। যাহাদিগকে সন্তানের জন্ম দিতে হইবে, এই নির্ব্বাচনের ফলে তাহারা যে কেবল আপন জীবনের সাফল্যলাভ করে তাহা নয়,

আকর্ষণের কৌশলেই সহজেই কার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়, বেগ পাইতে হয় না, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ কাহাকেও কোনরূপ হীনতা স্বীকার করিতে হয় না।

বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন ১৩৩৬

৪র্থ অধ্যায় (স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য) (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মানবজীবনে সভ্যতার শৈশবযুগে, আমাদের নবজাত চেতনা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলে, একটা বিষম অনধিকারচর্চ্চা করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিয়া আজকার দিনের পুরুষ সর্ব্বস্ব, একমাত্র তাহারি কর্ত্তৃত্বাধীন পারিবারিক নিয়মের বশে, নারীকে দাসীরূপে, বন্দিনীস্বরূপ রাখিয়া, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম চালাইয়া, যে সকল শরীর-চালনার ফলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বজায় থাকে, জাতিগোত্রের আদর্শ রক্ষা হয়, তাহার সকল পথ রোধ করিয়াছি।

একটি অতি সাধারণ উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক :-- গতির ক্ষিপ্রতা। বিধাতা আমাদের ক্ষিপ্রগামী, স্বাধীনচেষ্ট, দেহ-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন জীব করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। অসভ্য অবস্থার বর্ব্বর মানবের মধ্যে এই আদর্শ এখনও অক্ষুণ্ণ। প্রহরের পর প্রহর, ক্রোশের পর ক্রোশ তাহারা দ্রুত গমনে সমর্থ। সরলমেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানবের পক্ষে, এই গতি বক্রমেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের মতই সহজ এবং স্বাভাবিক। মানবজীবনে যাহা ঘটিয়াছে, হরিণ-জাতীয় জীবের পক্ষে তাহারি পরিণাম ভাবিয়া দেখা যাউক না কেন। হরিণের যদি গিরিদরীঅরণ্যঅধিত্যকায় স্বাধীন বিচরণের অধিকার থাকিত এবং হরিণী সে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত ও ব্যাহত হইত, তবে তাহার পরিণাম কি দাঁড়াইত ? তবে হরিণ-জাতির দ্রুতগতির সমূহ ক্ষতি হইত সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই।

নারীদিগকে এইভাবে সীমাবদ্ধ কর্ত্তব্যের মধ্যে, কেবল মাত্র ; গৃহপ্রাচীর-অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখার ফলে যৌন-নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করায় তাহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের হানি করা হইয়াছে। যদি প্রত্যেক পুরুষকে অবগুণ্ঠনে কুণ্ঠিত, বহুল বস্ত্রভারে ভারাক্রান্ত অবস্থায়, অন্তঃপুরপ্রাচীর অথবা পুরু যবনিকার অন্তরালে কেবলমাত্র দাসোচিত গৃহকার্য্যে অভ্যস্ত করা হইত, তবে তাহার ফল যে কি দাঁড়াইত তাহা সহজবোধ্য ; বলিষ্ঠ শ্রমিক, দেহবলগর্ব্বিত সৈনিক, শারীরচর্চ্চানিপুণ, অঙ্গসৌষ্ঠবের আদর্শসম্পন্ন নও-জোয়ানকে দেখিবার সৌভাগ্যলাভ কখনই যে হইত না তাহা নিঃসন্দেহ। ঘরের মধ্যে ভরিয়া রাখা, নির্ম্মল বাতাস উন্মুক্ত আকাশ উজ্জ্বল সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত করাই অযথা অন্যায় ও হানিকর, তাহার উপর যে সকল কর্ত্তব্য তাহাদের ভাগ্যে পড়িয়াছে, তাহা স্বাস্থ্য অথবা সৌন্দর্য্যবিধায়ক নহে। এইরূপে আমরা যৌন-নির্ব্বাচন ব্যাপারে, সমগ্র জাতিকে বল ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান হইতে দূরে রাখিয়া বিষম বিপত্তি সাধন করিয়াছি।

কেবলমাত্র এই কারণেই সবিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না, কিন্তু ভ্রমবশতঃ যৌননির্ব্বাচনক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটাইবার দোষে ফল বিষময় হইয়াছে। যদি যৌন-নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা থাকিত তবে অবরোধ ও বাঁধাবাঁধির মধ্যেও জাতীয় আদর্শ কতক পরিমাণে রক্ষিত হইতে পারিত। মূলে পুরুষকেন্দ্রীয় সভ্যতার ফলে, অস্বাভাবিক বিবাহ ব্যাপারে মানববংশের বিশেষত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষ নারীর অধিকারী, প্রভু, স্বামী, বেচাকেনা করিবার সম্পূর্ণ কর্ত্তা, তাহারি খেয়ালে সব হয় ও হইতে বাধ্য বলিয়া যত অঘটন ঘটিয়াছে। মনোনয়ন করিবার কর্ত্তৃত্ব নারীর আর নাই, তাহা পুরুষেরি ইচ্ছা ও ক্ষমতাধীন। এ ব্যাপার আপাতঃ দৃষ্টিতে সহজ বলিয়া বোধ হয়। আদমের আদিম দিনে, যখন প্রাকৃতিক নিয়মের জ্ঞানলাভ হয় নাই তখন এ বিপরীত রীতিতে পরিণামে কি-পরিমাণ হানি হইবে, সে সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা মনে উদয় হয় নাই। অধুনাতন জ্ঞানালোকে আমরা সেই পুরাতন ভ্রমেরই পরিণতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। নারী যৌননির্ব্বাচন-ক্ষেত্রের কল্যাণকর স্বাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইবার ফলে পুরুষও বীর্য্যবিক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কঠোর পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

এখন নারীকে প্রভুর মনোহারিণী মোহিনী হওয়া ভিন্ন অন্য প্রয়াস করিতে হয় না, পুরুষেরও স্বেচ্ছাকারী ভাবে কর্তৃত্ব লাভ কিম্বা ক্রয় করিবার মত অর্থ-সামর্থ্য থাকিলেই চলিয়া যায়। সাধারণ নারীর প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাতে সহজেই উপলব্ধি হয়, গৃহস্থালী চালান কিম্বা দাসীবৃত্তি করিবার জন্য বড় বেশী বুদ্ধি, বল কিম্বা রূপের দরকার হয় না। পুরুষের পক্ষেও এই কর্ত্তৃত্বের জন্য অনুরূপ বীর্য্য, বুদ্ধি, বল, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য হইলেই চলিয়া যায়।

এইখানেই প্রাথমিক প্রাকৃত বিরোধ ঘটাইয়াছি। এখন তাহার ফলভোগ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, নির্ব্বাচন-ক্ষমতা পুরুষের হাতে থাকায় সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে এতটা ছিল না। তাঁহারা আমেরিকার আদিম-নিবাসী নারীদিগের তুলনায় বর্ত্তমানের মার্কিন সুন্দরীদিগের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার প্রথম উত্তর, আমেরিকার আদিমনিবাসীগণ, সম্প্রতি ক্ষীয়মান জাতি, তাহাদের নারী সকলও পুরুষকর্ত্তৃত্বাধীন। সত্য ও যুক্তিযুক্ত ভাবে সুবিচার করিতে হইলে, অধুনাতন নারীদিগের সহিত মাতৃত্বাধীন জাতির উপমাই সমীচীন, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। আজিকার দিনে পৃথিবীর কুত্রাপি কোনও নারীকে সহজ ও স্বাধীন অবস্থায়, যথেষ্ট স্বচ্ছন্দতায় কিম্বা পরিপূর্ণ দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণীরূপে দেখা যায় ; অবস্থা-পরম্পরায় কিন্তু আমরা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারি, নারী যদি তাহার স্বাধিকার, পরিমিত স্বাধীনতা, কার্য্য-সৌকর্য্য লাভ করিতে পারিত, তবে কি-পরিমাণে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও দৈহিক বল অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইত।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, পুরুষ যাহা সৌন্দর্য্য-পর্য্যায়ভুক্ত করেন, তাহা কেবলমাত্র শারীরিক অংশবিশেষের স্ফীতি এবং উন্নতি— পুরুষজন্তু হিসাবে যাহা কিছুতে তাঁহাদের দৃষ্টি ও চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া পারে না।

মেদের আধিক্য নারীসৌন্দর্য্য হিসাবে গণ্য হয় বটে— নবনীতকমনীয়া কামিনী পুরুষের নয়ন-মনোহারিণী হইলেও, মানবদেহের এ অবস্থা স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, ইহা দেহের দৌর্ব্বল্য, অক্ষমতা ও স্বাস্থ্যহ্রাসের পরিচায়ক। নিয়মিতভাবে প্রায়শঃই পীবরদেহা খর্ব্বাঙ্গী রমণী বিবাহক্ষেত্রে পক্ষপাত লাভ করে (সংস্কৃতসাহিত্য কিন্তু "তন্বী শ্যামার" প্রতি প্রীতিযুক্ত) ; ইহার ফলে, সর্ব্বপ্রকারে মানবজাতির উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এই সভ্যতার যুগে, আগে-চলিবার পথে, মানুষ ক্ষীণ ও খর্ব্ব হইলে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদিগকে আদিম যুগের খর্ব্ব মানবকে সর্ব্বপ্রকারেই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। পুরুষ কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে নির্ব্বাচনক্ষেত্রের কর্ত্তা হওয়ায়, এবং পত্নীবরণ ব্যাপারে বধূকে আপনার অপেক্ষা সুকুমার, কৃশ পেলব ও হ্রস্বরূপে মনোনীত করিয়া স্বেচ্ছায় মানবজাতির সৌন্দর্য্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবের হানি করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বতনদের লিখিত উপন্যাসে পড়িতাম, তিনি (অর্থাৎ নায়ক) পুরুষের দেহ-সৌষ্ঠবের আদর্শ, কবাট-বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, বিশালবপু ছিলেন, সুকেশী নায়িকার মস্তকটি কিন্তু বরের গ্রীবার ঊর্দ্ধে যাইত না— তিনি যেন পরীরাজ্যের অধিবাসিনী, লঘু তনু, ভার নাই বলিলেই হয়, একেবারে কোমল মলয়-পরিশীলিত ললিত লবঙ্গলতা। এমনি তো বরবধূর বৈষম্য, তবুও কেহ কেহ আশা করিতেন, (যে আশা করিবার পক্ষে কোনও কারণ কিম্বা যুক্তি দর্শান সম্ভবপর নয়) পুত্রেরা জনকের, এবং কন্যারত্নগুলি জননীর অনুরূপ হইবে। পশুপালন ক্ষেত্রে কিন্তু গবাদি চতুষ্পদ জন্তুর উৎকর্ষসাধন চেষ্টায় মানুষ সর্ব্বদাই পুরুষ এবং স্ত্রী-জন্তুর সম্মিলন ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সাম্যরক্ষা করিয়া চলিয়াছে, —যাহাতে জন্তুর জাতীয় আদর্শ কোনরূপ হীন না হয় সে সম্বন্ধে সাবহিত দৃষ্টিপাত করিতে ভোলে নাই।

অত্যধিক নারীসুলভ সৌকুমার্য্য পুরুষের মনে প্রভাব বিস্তার করায় জাতির পরিণাম সম্বন্ধে তাহাকে সতর্ক হইবার সুযোগ দান করে নাই। প্রকৃতি কিন্তু পুরুষকে নির্ব্বাচকরূপে নির্দ্ধারণ করেন নাই। পুরুষের দ্বারা লালিত-পালিত হইয়া এমন এক দুর্ব্বল অসহায় পীড়িত নারীজাতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহাদিগকে ভঙ্গুর তৈজসপত্রের মত অনায়াসে হস্তান্তর করিতে পারা যায়। তাহারা যেমন শারীরিক শক্তিবিহীন, মানসিক বলেও তেমনি অনধিকারিণী ; তাই এ নিরুপায় অবস্থায়ও ক্লেশ বোধ করে না, বরং এই পরনির্ভরতা তাহাদের ভালই লাগে। আমরা বর্ত্তমানে ইহাদের মনোবৃত্তি এমনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছি, যে, পুরুষ তাহাদের দেহে মনে যাহা দেখিলে তুষ্ট হয় তাহারা তাহারই চর্চ্চা করিয়া প্রীতিলাভ করে— মানবতার সম্পর্কে তাহা যে কত অনর্থকর, সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে।

উদাহরণতঃ, গৃহসীমানায় দিনের সমধিক কাল আবদ্ধ থাকায়, গুরুভার পরিচ্ছদ-পরিধান, এবং তদপেক্ষা গুরুতর ভার দেশাচারে অভ্যস্ত হওয়ায় নারীজাতির দেহমনের পায়া খাটো হইয়া গিয়াছে। এই পরিণাম অসম্মানজনক ও হানিকর, পুরুষ-লালিত নারী-প্রসূত পুরুষও উত্তরাধিকারে জননীর এই অক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। ইহা বিশেষতঃ

অন্তঃপুর-প্রভাবিত দেশে অধিক করিয়া দেখা যায়। যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, ভাগ্যবশতঃ কোনও নারী দেহআদর্শোচিত দৈর্ঘ্যে, সৌষ্ঠবে, আপাদমস্তকের সুঠাম সুষমায়, সাবলীলগতিতে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করে তবে পীবরদেহা গজেন্দ্রগামিনীরা তাহার তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়েন না, বলেন, "মাগো কি ছিরি, ঢ্যাঙা, দেহ নয়তো পাকাটির খড়ি!"

ডাক্তার সার্জ্জেন্ট (Sergeant— কোনও মার্কিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-রাজধানী পারিনগরীর বিশ্ব-প্রদর্শনীতে এই দেহাবনতির দৃষ্টান্তস্বরূপ যে-সকল ভাস্করমূর্ত্তি গঠিত করাইয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার বহু ব্যায়ামাগার হইতে বহু নরনারীর এই দেহ-পরিমাপ সকল সংগৃহীত হইয়াছিল। তরুণীগণ মুখ-সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রাণী শচী, অনঙ্গমোহিনী রতির তুল্য হইলেও, ইঁহাদের হাত-পা সুগঠিত কিন্তু ছোট ছোট, খাটো খাটো, অশক্ত। গ্রীবা হইতে প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত বাহুলতা দেখিতে ভাল হইলেও দুর্ব্বল ও পেশীবর্জ্জিত। উরু হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্তের আকার স্থূল ও খর্ব্ব, সামর্থ্যবর্জ্জিত। কণ্ঠমূল হইতে কটিতট পর্য্যন্ত দেহাংশ বিশেষরূপে শক্তিবিহীন। প্রদর্শিত ভাস্করমূর্ত্তিগুলিতে কিন্তু পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অধিকতর সমঞ্জস ও সুশোভন।

যৌন-নির্ব্বাচনক্ষেত্রে পুরুষের অনধিকার-চর্চ্চার ইহাই পরিণাম।

বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৩৭

সম্প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য

গত বড়দিনের ছুটার মধ্যে এখানে সর্ব্ব-ভারত-নারী-সম্মেলন দেখে, তার প্রস্তাবাদি শুনে, সভানেত্রীর মন্তব্য পাঠ করে আমার যা মনে হয়েছে তারি কথা বঙ্গলক্ষ্মীর পাঠিকাদের জানাতে চাই।

প্রথম ঘরের কথা। এক সময় এই বাংলাদেশের গৃহলক্ষ্মীদের ঘর নিয়ে থাকলেই চলে যেতো, তাতে তাঁরাও সুখী হতেন, বাড়ীর কর্ত্তারাও খুশী থাকতেন। কেননা তখনও সে সব দিনের জীবনযাত্রা ছিল সহজ-ব্যয়-সাধ্য —মেয়েরা অধিকাংশ কি ধনী কি নির্ধন গৃহকাজে অভ্যস্ত ছিলেন, পরিবার ছিল একান্নবর্ত্তী : একত্র বস-বাস জন্য পরস্পর পরস্পরের বাধা সৃষ্টি না করে সহায়ক ছিলেন : আমার দিদিমার কাছে তাঁদের বধূ ও গৃহিণী-জীবনের যা বর্ণনা শুনেছি তাতে এই ধারণাই আমার মনে স্থান পেয়েছে। তারপর হ'ল আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন, ইংরাজী সভ্যতার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব অনুসারে একান্নবর্ত্তীত্বের ভিত্তি আলগা হয়ে আসতে লাগ্‌ল, আগের মত অর্থস্বাচ্ছল্য রইল না, সকলেই অনুভব করতে লাগ্‌লেন, একের অন্নে দশের প্রতিপালন সমীচীন নয়, সুখের তো নয়ই। কাজেই আগে যাদের জমি-জমা হ'তেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হ'ত, তাদের চাকুরে হ'তে হ'ল, ক্রমে তাঁরা আপন

আপন পরিবার নিয়ে ভিন্ন হয়ে গেলেন,যাঁরা তা করলেন না বা পারলেন না, তাঁরা কষ্টে পড়লেন।

এখন এলো বাহিরের কথা, বিদেশের জীবন-যাত্রা স্বভাবতঃই পরদেশীয় ভাবাপন্ন হ'ল। পুরুষ ভাঙেন বেশী গড়েন কম। ছেলেদের শিক্ষা ক্রমে গুরুমশায়ের পাঠশালা ছেড়ে, ইংরাজী পড়ান স্কুলে প্রবেশ করল, আগে যা ছিল তা' রইল না। ছেলেদের পড়াশোনার দেখা-দেখি মেয়েদের লেখাপড়ার বাসনা মনে জাগল, মেয়েদের জন্যেও বিদ্যালয় হ'ল, সেখানে গুরু-মা শেখাতেন সেলাই, নামতা, অক্ষর পরিচয় হ'ত তাঁরি কাছে, পণ্ডিত মহাশয় পড়াতেন বাংলা ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি— শেখাতেন অঙ্ক। প্রাথমিক ও উচ্চ পাঠশালাতে বাংলাতেই শিক্ষা হ'ত বহুকাল, ইংরাজী পুঁথির সঙ্গে সংশ্রবে আসতে হ'ত না। আমরা পড়েছি এই সব বিদ্যালয়ে, কাজেই এখন যে আন্দোলন চলছে, —মাতৃ-ভাষায় পঠন-পাঠন, তার উপকারিতা অভিজ্ঞতা-লব্ধ— সে সব প্রশ্নের মীমাংসা পরে অপরে করবেন। বাড়ীর মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়তে গেলে অনেকটা সময় ঘরের বাইরে কাটে, তার উপর গৃহকর্ম্ম শিখবার সুযোগও কমে যায়। পড়াই হয় তাও ছেলেদের মতই, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনযাত্রার উপযোগী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা চলে না। এতে পরবর্ত্তী জীবনে গৃহিণী হয়ে নূতন শিক্ষার অপেক্ষায় থাকা প্রয়োজন। এ বিষয় ভুক্তভোগী মাত্রেই তখন জানতেন— এখন তা' নাই, সেই কারণে এ প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। ক্রমে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হ'ল। উদার মতাবলম্বী পুরুষেরা পুত্রকন্যার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা সমভাবাপন্নই করলেন। তখন বিচার বিবেচনার সময় ছিল না, গতানুগতিকের প্রভাব রয়ে গেল। আমাদের এ বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারিণী দুইটি নারী বহু অভিনন্দন লাভ করেছিলেন, সে আজ প্রায় ৬০ বৎসরের কথা— ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারিণী নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পথও প্রশস্ত হয়ে এসেছে। তা তো হয়েছে, তবে সর্ব্বানুমোদিত হয়নি। এ প্রবন্ধে সে ইতিবৃত্ত লিখবার আবশ্যক নাই, এখানে যাঁরা আছেন, সেটা তাঁদের জানা কথা।

শিক্ষা হতেই আসে দীক্ষা, অর্থাৎ ধর্ম্ম, যা ধরে আমাদের থাকতে হয়, জীবনের চিরানুচরিত পন্থা, অবলম্বনও বটে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পূর্ব্ব পূজিত দেবদেবীর প্রতি আমাদের সরল অহেতুকী প্রীতি-ভক্তি হ্রাস হয়ে এল, পিতামহী মাতামহীরা যে ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করে সন্তুষ্ট থাকতেন, আমাদের মন তাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি কি সন্তোষ পেত না। আমার নিজের জীবনের কৈশোর দিনের কথা স্মরণ আছে,সর্ব্বদাই মনে হ'ত, কোথায় যেন মস্ত বড় একটা অভাব রয়ে গেল ; নিরাকার উপাসনার দিকে মনের অনুরাগ থাকলেও দেখতাম, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি, সংশয়রহিত চিত্তবৃত্তিলাভ যেন সুদূরপরাহত।

তখনও আমাদের মন রাষ্ট্রীয় অধিকার কিম্বা পুরুষের সমকক্ষ হবার জন্যে উৎসুক কি উৎসাহিত হয়ে ওঠেনি, এখন যেমন আমরা বালিকা-বনিতা-বৃদ্ধা সকলেই স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে জাগরূক-মন, তখন তা ছিলাম না, এ সব কথা ঢিলেভাবেই ভাবা

হ'ত ; আর ঢিলে পোষাক পরিচ্ছদ যেমন সহজে খসিয়ে ফেলা যায়, আমাদের মনও যেন দৃঢ় অধ্যবসায়ে সেসব কথা চিন্তা করত না, খানিকটে যেন একথা কল্পনারাজ্যেই বিরাজ করত।

এখন নারী-সংঘ স্বদেশে বিদেশে, রাষ্ট্রে গৃহধর্ম্মে উত্তরাধিকার, বিবাহনীতি, বিবাহবিচ্ছেদ, নারীজীবনে বিবিধ স্বাধীনতা, এমন-কি জন্মনিরোধ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় শুধু ইয়ত্তা নয়, আয়ত্ত করবার জন্য প্রায়শঃই একমত পোষণ করেন। এ সম্বন্ধে শুধু আন্দোলন নয়, রাজকীয় বিধিবিধান প্রবর্ত্তিত করে বাধ্যতামূলক করতে ঐক্য-বদ্ধ, যথা বিবাহের কাল নির্দ্ধারণ, নারীর রূপজীববৃত্তির উচ্ছেদ,কন্যাসন্তানের পৈতৃক বিষয়ে সমানাধিকার, বিধবার স্বামীর মৃত্যুর পর ধনসম্পদে পুত্র কন্যার ন্যায়ই স্বতঃ অধিকার প্রাপ্তি, —এ সকল অধিকার লাভ করতে হলে শুধু গলার জোরে আর লাঠির ঘায়ে হবে না, যদিও একেবারেই হবে না, তাও নয়। বিশেষ পুরুষের পাষণ্ড ব্যবহারের বিরুদ্ধে পুরুষে আমাদের রক্ষা করবেন সে ভরসায় না থেকে নিজেদেরই সদা সতর্ক থাকতে হবে, আর আবশ্যক মত লাঠি, তলবার, সড়কি মারতেও শিক্ষা করতে হবে, আধুনিক বালিকা-বিদ্যালয়ে এ প্রথার প্রচলন হয়েছে, এটা খুবই প্রশংসার ও আশার কথা—নারী একালে যথার্থ শক্তি-স্বরূপিণী হতে সক্ষম হবেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতামত অর্থাৎ ভোট যাতে দিতে পারেন আর পুরুষের মতই দিতে পারেন তার অবাধ অধিকার লাভ করতে হবে, ন্যায্য অধিকার মানসিক কি শারীরিক দুর্ব্বলতায় ছাড়া অন্যায় মনে করি। কিন্তু ও সব চেষ্টার প্রকৃষ্ট পন্থা শিক্ষা দীক্ষা, মেয়ের কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের সাহচর্য্য আবশ্যক, পুরুষেরও তাই। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও "যুদ্ধং দেহি" ভাব পোষণ করলে চলবে না— বিরোধ নয়, প্রীতি।

সমগ্র হিন্দুস্থানের নারী সঙ্ঘবদ্ধ হলে ভাষা-বিভ্রাট দূর করা দরকার। আজকালকার দিনে ইংরাজী রাজকীয় ভাষা বলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় এটা কইতে লিখতে জানেন। এতে অভাব দূর হলেও, মন বিদেশী ভাষায় মনোভাব জানাবার পক্ষপাতী নয়। মাতৃভাষার অপরাধ কি ? তবে আমাদের সকলেরি মাতৃভাষা এক নয়। আমি বলি বাংলা, তুমি বল হিন্দী কি উর্দ্দু, তিনি বলেন গুজরাটি কি মারাঠি, মাদ্রাজি বলেন তামিল, তেলেগু, তাই মনে হয় সবাই যদি লিখতে বলতে শিখি হিন্দী— ভাষা-বিভ্রাট মেটে। সেই জন্যে এই হিন্দী আবাল্যপাঠ্য ও লেখ্য হতে হবে, কি বাংলা দেশে কি অন্যত্র।

ভেবে দেখতে গেলে সব গিয়ে দাঁড়ায় সেই শিক্ষা ও দীক্ষায়। অথচ এ দু'টোরই অভাব আমাদের এ দুর্দ্দশা দূর করতে হবে আমাদেরি স্ত্রী পুরুষে মিলে মিশে।

আমাদের জীবনের প্রথম প্রগতি যে মহাপুরুষ দিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁর শক্তিতে ভাবতে ও বলতে শিখেছি, এমন-কি জীবনধারণের অধিকার হতে বঞ্চিত হইনি, শতবর্ষ পর তাঁকেই প্রথম প্রণাম জানাব, পরবর্ত্তী যাঁরা নারীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চেষ্টিত হয়েছিলেন তাঁরাও আমাদের নমস্য, চিরদিন যেন সে অতীত ঋণ স্মরণ রাখি

ও পরিশোধের জন্য অগ্রসর হই। সব কথা বলা হ'ল না, হওয়াও সম্ভব নয়। মূলকথা যা, বলবার চেষ্টা করেছি, অঙ্কুর কোথায় তা'ও দেখতে পাচ্ছি, এখন একে বাঁচাতে হবে সলিল সেচনে, বাতাতপ হতে রক্ষা করতে হবে, একে খোঁচালে হবে না, স্নেহে সযত্নে পরিপুষ্ট করতে হবে— এই হবে সাধনা, সিদ্ধি দেখা হয়ত সৌভাগ্যে নাই, তবু তো লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হবে— অতএব নারীশক্তি-জাগৃহি— "সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং।"

বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন ১৩৪০



তৃতীয় পর্ব

পড়া-লেখা

তৃতীয় পর্ব : পড়া-লেখা

লাপ্লাটার প্রাণীতত্ত্ববিৎ*

দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ হড্‌সন্ সাহেবের রচিত "লাপ্লাটায় প্রাণীতত্ত্বসন্ধায়ী" এবং "পাটাগোনিয়ায় অলস পর্য্যটন" নামক গ্রন্থদ্বয় যথা স্থান হইতে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে।[১]

বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই পুস্তক দুটি মূল্যবান, কিন্তু সাহিত্যরস-পিপাসু সাধারণ পাঠকগণের নিকট এই বই দুখানির মূল্য ততোধিক।

লেখক তাঁহার জন্মভূমি দক্ষিণ আমেরিকার বিচিত্র ভূভাগের নানা প্রকার অপূর্ব্ব জীবের বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সেই সকল বর্ণনার মধ্য হইতে তাঁহার নিজের চিত্র উজ্জ্বল সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা যে কেবল তাঁহার বর্ণিত জন্তুদিগকে দেখিয়াছি তাহা নহে কিন্তু কেমন করিয়া তাহাদিগকে দেখিতে হয়, অন্তঃকরণের সমস্ত অনুরাগ এবং বহিরিন্দ্রিয়ের সমুদয় শক্তি সম্পূর্ণ উন্মুখ রাখিয়া প্রকৃতির কোলের মধ্যে কেমন করিয়া বাস করিতে হয় এই দুটি পুস্তকের মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লাভ করিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠে।

আমেরিকার জনশূন্য বিপুল প্যাম্‌পাস প্রান্তরে কখনো অশ্বপৃষ্ঠে কখনো তৃণশয়নে তিনি কেমন সজীব আগ্রহ, কেমন সজাগ চিত্তবৃত্তি, কেমন গভীর আনন্দের সহিত দিনরাত্রি যাপন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বাঙ্গালী পাঠক একটি সম্পূর্ণ নূতন মানসিক অবস্থার সহিত পরিচয় লাভ করেন।

আমরা মনুষ্যসঙ্গ মনুষ্যসমাজের ধাত্রীক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদের আদি মাতা বসুন্ধরার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করি। ক্রমে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। আমরা বেদ বেদান্ত পুরাণ উপপুরাণ ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে নানা কথাই জানি কিন্তু জানি না, আমাদের চতুর্দ্দিকে যিনি চিরকাল অচলা হইয়া আছেন সেই শ্যামলা পৃথিবীকে।

আমরা যদি একবার আমাদের সেই কৃত্রিম অন্তরাল দূর করিয়া দিয়া একেবারে মাটির ছেলে হইয়া পৃথিবীর বুকের কাছে আসিয়া বসিতে পারি, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের

**The Naturalist in La Plata,*
Idle Rambles [sic] *in Patagonia.*[২]

মধ্যে এক নূতন জগৎ, এক বিচিত্র জীবলীলা আমাদের চখের সমুখে খুলিয়া যায়।

কিন্তু হায়, আমরা বৈরাগ্যমন্ত্রে পুরুষানুক্রমে দীক্ষিত ; —আমরা মানুষকেই মানুষ জ্ঞান করি না, তা' পোকা মাকড় পশু পক্ষী তৃণ গুল্ম কত সামান্য ! আমাদের শাস্ত্র আমাদিগকে দেশ ছাড়িয়া সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিয়াছে, আমাদের দার্শনিক সংস্কার আমাদিগকে সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া সমস্ত জগৎসংসারের মধ্যে কেবল আমাদের নিজের ভ্রূযুগের মধ্যবর্ত্তী বিন্দুর উপরে অভিনিবিষ্ট হইয়া বাস করিতে নিশিদিন অনুরোধ করিতেছে, সেই দুর্লভ বিন্দুটুকু আমরা সকলে লাভ করিতে পারি নাই কিন্তু ইন্দ্রিয়দ্বার প্রায় রোধ করিয়া বসিয়াছি এবং এই বিশাল বিশ্বসংসার হইতে স্বতন্ত্র হইতে আর বড় বেশি বাকি নাই।

এইজন্য আমাদের মত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট হড্‌সন্ সাহেবের এই বই দুটি হঠাৎ আমাদের মনোদুর্গের একটা জান্‌লা খুলিয়া দেয়— পৃথিবীর সমস্ত মর্ম্মর ধ্বনি এবং নীলাকাশের সমস্ত উন্মুক্ত বাতাস যেন চিরবন্ধুর মত হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসে। এই বিপুল পৃথিবীর বক্ষের উপর পাঠশালামুক্ত বালকের মত ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু হড্‌সন্ সাহেব যে,কি কৌশলে তাঁহার অসামান্য প্রকৃতিপ্রেম আমাদের অন্তঃকরণে সঞ্চারিত করিয়া বিশ্বের অত্যন্ত সন্নিকটে আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছেন তাহা কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-দ্বারা আমরা বুঝাইতে পারিব না। বই দুখানি সমস্ত পড়িতে হয়।

বাঙ্গালীরই এইরূপ বই পড়া বিশেষ আবশ্যক। পড়িলে আমাদের চতুর্দ্দিকের প্রতি আমাদের সুপ্ত প্রেম জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই প্রেমের একান্ত অসাড়তাবশতঃ আমরা কাছের জিনিষকে বড় তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমাদের পরিচিত জীবজন্তু চাযবাস মাঠঘাট প্রান্তরের ত কথাই নাই, আমাদের অন্তঃপুরের মধ্যে, যে সকল সঙ্গীত, পল্লীর মধ্যে যে সমস্ত উৎসব, জনসাধারণের মধ্যে যে সকল পুরাতন প্রিয় প্রথা প্রচলিত, তাহার বিবরণ আমাদের নিকট হাস্য ও বিরক্তির উদ্রেক করে। সজাগচিত্ত য়ুরোপীয়ের নিকট প্রকৃতির এবং মানবসমাজের এমন কিছুই নাই যাহা যত্ন এবং অনুসন্ধান এবং যাথাতথ্যের সহিত তন্নতন্ন করিয়া আলোচ্য নহে।

লেখক দক্ষিণ আমেরিকার যে ভূখণ্ডের পশু পক্ষীদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন সেখানে এই ভূভাগের অধিক অংশই বহুযোজন-বিস্তৃত একখানি সমতল প্রান্তর। এই বিশাল প্রান্তরখানি সুদীর্ঘ, পত্রবহুল, অনতিস্থূল বংশদণ্ডের ন্যায় কাশজাতীয় এক প্রকার তৃণশ্রেণীতে আচ্ছাদিত ; এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে ভূমিসংলগ্ন লতা এবং গুল্মাবলি জন্মিয়া থাকে। এই তৃণদণ্ডের শীর্ষদেশে শ্বেত পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হয়, অতিস্ফুট শিমূল শিম্বীর ন্যায় তাহার শুভ্র সুকুমার লাবণ্য। অন্যান্য ফুল অতি অল্প। নদীতীরে কিম্বা জলাভূমির পার্শ্বদেশে কখনো কখনো জলজ পুষ্পাদি দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তে এই তৃণপুষ্পগুচ্ছ সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেই বহুযোজনবিস্তৃত, পবনান্দোলিত পুষ্পরাজির উপর যখন সন্ধ্যার আরক্ত সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়ে তখন

দৃশ্যটি বড়ই মনোহর হয় ; কতই বিচিত্র বর্ণ সমাবেশ, কোথাও বা অতি সুকুমার গোলাপী ; কোথাও বা নাতিহরিত নীলাভাস ক্রমশঃ মিলাইয়া আসিয়া নবনীতশুভ্রতায় পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য সময়ে পুষ্পহীন, সমবর্ণ, সমদৃশ্য দিগন্তস্পর্শী এই শ্যামল সমুদ্রটি দেখিতে সুন্দর লাগে না। ইহার অনবচ্ছিন্ন সমতা, অক্ষুণ্ণ নির্জনতা দিবা দ্বিপ্রহরেও মনকে কেমন অবসন্ন করিয়া ফেলে। তাহার প্রধান একটি কারণ জীবনের চাঞ্চল্য কিম্বা কোলাহলের অভাব। দীর্ঘতৃণশ্রেণীর অন্তরাল থাকায় নিতান্ত নিকটবর্ত্তী না হইলে ভূচর জন্তুগণকে দেখিতে পাওয়া যায় না ; সমভূমি বলিয়া পাখীরা তাহাদের সঙ্গীগুলিকে সর্ব্বদাই দেখিতে পায়, চীৎকার করিয়া ডাকিবার আবশ্যক হয় না, কাছাকাছি বসিয়া যে মৃদুকূজনে মনোভাব ব্যক্ত করে তাহা দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায় না— সহসা ভ্রম হয় এ বুঝি কোন জীবজন্তুবর্জ্জিত মৃত প্রদেশ, তাই এত নীরব। কেবল বাতাস এখানে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নহে, অবিশ্রাম অসংযতরূপে প্রবাহিত ; বংশদণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষে শুস্ক পত্রাবলির আন্দোলনে কেবল একটি আর্ত্ত উদাস মর্ম্মর নিরন্তর ধ্বনিত হইতে থাকে।

আমেরিকার এই তৃণমরুনিবাসী জন্তুদিগের মধ্যে "পিউমা"র চরিত্র বড় বিস্ময়াবহ। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ 'নূতন জগৎ' আমেরিকা খণ্ডের সিংহ "পিউমা" অশেষ গুণের অধিকারী হইয়াও যথেষ্ট আদৃত হয় নাই বরং অকারণে ভীরু নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহার ন্যায় দুর্দ্দান্ত সতর্ক জন্তু আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া দুস্কর। ইহা ব্যাঘ্র ভল্লুক অশ্ব, মহিষ, গবাদি সকল পশুকেই নিমেষের মধ্যে মারিয়া রাখিয়া যায়। ইহার অসাধারণ হিংস্র প্রবৃত্তি কিছুতেই নিরস্ত হয় না। পাম্পা প্রান্তরের সমস্ত জীবকে একেবারে উৎখাত করিয়া বেড়ায় ; ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নহে, অকারণে তাড়না করিয়া বিনাশ করিয়া কেবল মাত্র আপনার অসীম জিঘাংসা চরিতার্থ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা কোন্ মোহিনী শক্তির প্রভাবে মানুষের নিকট নিতান্ত অসহায় দুর্ব্বলের ন্যায় আত্ম সমর্পণ করে— আক্রমণ করা দূরে থাক আক্রান্ত হইলে পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা হইতে নিরস্ত থাকে। তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অসাধারণ নির্ভীকতা নিপুণ সতর্কতা কোথায় তিরোহিত হইয়া যায়, আর্ত্তকণ্ঠে কম্পান্বিত কলেবরে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে। পিউমা এমনি মনুষ্যভক্ত যে, নিদ্রিত অবস্থায় নিতান্ত অসহায় শিশুটিকে পর্য্যন্ত কখনো আক্রমণ করিতে শোনা যায় না। বরং এমন অনেক ঘটনা শ্রুত হওয়া যায় যে, পিউমা মানুষকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনা হইতে অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বিনাশ করিয়াছে। এক সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার সালা ডিল্লো নামক নগরে কয়েকটি যুবক একত্রে শীকার করিতে গিয়াছিল। যখন সকলেই মৃগয়ার উৎসাহে মত্ত ছিল সেই সময় একজন শীকারী কিরূপে আঘাত পাইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়াছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। রাত্রে যখন সকলে ঘরে ফিরিয়াছে তখন জানিতে পারিল যে সেই শীকারীর ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে অথচ সে ব্যক্তির কোন সন্ধান নাই। পরদিন প্রাতে সঙ্গীরা একত্র হইয়া অনেক খুঁজিয়া দেখিল তাহাদের সেই সঙ্গীটি একখানি পা

ভাঙ্গিয়া এক স্থানে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। সেই ব্যক্তি সঙ্গীদিগের নিকট গল্প করে যে অন্ধকার হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে একটি পিউমা তাহার কাছে আসিয়া বসিল কিন্তু আকার ইঙ্গিতে কিছুই প্রকাশ করিল না যে সে তাহার অস্তিত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত আছে। ক্রমশঃ রাত্রি যখন অধিক হইতে লাগিল তখন সে কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল, চলিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসে, পরিশেষে একবার ফিরিতে তাহার এতই অধিক বিলম্ব হইল যে সে ব্যক্তি ভাবিল আর বুঝি আসিবে না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে তখন অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনি শুনিয়া সে একেবারে জীবনাশা ত্যাগ করিল। আস্তে আস্তে হাতে ভর দিয়া উঠিয়া দেখিল যথার্থই একটি বাঘ তাহার খুব কাছাকাছি আসিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। অল্পক্ষণ পরেই পিউমার গভীর গর্জ্জন শুনিয়া বুঝিতে পারিল উভয়ে যুদ্ধ করিয়াছে। রাত্রিশেষ হইবার পূর্ব্বে যতবারই সেই ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে তত বারই পিউমা তাহাকে পরাস্ত করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পর আর তাহাদিগকে দেখা গেল না। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা বিবৃত আছে।

১৫৩৬ সালে Buenos Ayres-এর স্প্যানিস উপনিবাসীদিগের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসী ইন্ডিয়ানদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়াতে ক্রমশঃ রসদ ফুরাইয়া আসিল অথচ ইন্ডিয়ানদিগের দৌরাত্ম্যে নগরের বাহির হইবার কোন আশা রহিল না। তাহারা ক্রমে আধপোয়া ময়দা খাইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল, এবং তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল তখন ক্ষুধার্ত্ত নগরবাসী ছোট ছোট জন্তু ধরিয়া খাইতে লাগিল। একদিন এইরূপ আহার্য্যের অনুসন্ধানে মালদোনাদা নাম্নী একটি যুবতী নগর হইতে কিছু দূরে বনের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল, ইন্ডিয়ানগণ সেই স্থান হইতে তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কিছুকাল গত হইল, অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে মালদোনাদা ইন্ডিয়ান পল্লীতে বাস করিতেছে। তখন উপনিবেশকর্ত্তা কাপ্তেন রুইজ অনেক কৌশল করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনাইয়া ইন্ডিয়ানদিগের নিকট উপনিবাসের অবস্থা ভেদ করা অপরাধে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। আজ্ঞা প্রচার হইল মালদোনাদাকে বনের ভিতর বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধিয়া হিংস্র জন্তু দ্বারা আহার করান হউক। আজ্ঞামত সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাকে লইয়া গিয়া বৃক্ষকাণ্ডে বাঁধিয়া রাখিয়া আসা হইল। দুই দিন দুই রাত্রি সেই অবস্থায় ছিল, তৃতীয় দিন প্রভাতে সৈনিকগণ তাহার অস্থিখণ্ডটুকু দেখিতে পাইবে না ভাবিয়া যখন দেখিল তাহার একটি মাত্র কেশ নষ্ট হয় নাই তখন আর তাহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। এই অপূর্ব্ব রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মালদোনাদা বলিল প্রতিদিন রাত্রে একটি পিউমা তাহার পাহারা দিয়াছে এবং যতবারই অন্য হিংস্র জন্তু নিকটে আসিবার চেষ্টা করিয়াছে ততবারই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। কেন যে নির্ম্মম শোণিতলুব্ধ দুরন্ত পিউমা নিতান্ত অসহায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মনুষ্যের নিকট পরাভব স্বীকার করে, আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষণ হইতে নিরত থাকে, বিপদকালে বহু পুরাতন ভক্ত ভৃত্যের ন্যায়

নিঃস্বার্থ সহিষ্ণুতার সহিত অপরাপর হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করে ইহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার বলেন অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে কোন জন্তু বিশেষের আকৃতি বর্ণ এবং গন্ধ অপর একটি জন্তুর উপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। হয়ত বা সেইরূপ কোন বিশেষ শক্তির প্রভাবে পিউমা মনুষ্যের নিকট বশ মানিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বানর জাতির সহিত মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য, তাহাদের নিকট পিউমার এরূপ সুশীল ব্যবহারের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না বরং তাহাদের প্রতি আক্রোশ এবং অত্যাচার যেন একটু অধিক। কুক্কুর জাতি পিউমার দু চক্ষের বিষ, তাহাদের দেখিলে রাগে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়া পড়ে। যখন কোনও মৃগয়ায় কুক্কুর মনুষ্যের সহচর হয় ও তাহার আজ্ঞামত পিউমাকে আক্রমণ করে তখন পিউমা আর্ত্ত চীৎকার ও অশ্রুবর্ষণ সকল ভুলিয়া একেবারে উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। মানুষের আক্রমণ লক্ষ্যই করে না, একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে কুক্কুরকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে।

এই পাম্পা প্রান্তরে স্কাঙ্ক্ নামে একটি ক্ষুদ্র জন্তু আছে যাহার ভয়ে পিউমা পর্য্যন্ত তটস্থ। দেখিতে জন্তুটি কিছুমাত্র ভয়ঙ্কর নহে— নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ শিরোভাগ এবং দীর্ঘ পুচ্ছটি তুষারশুভ্র : দূর হইতে তাহাকে লোভনীয় বলিয়াই বোধ হয়— কিন্তু যে একবার ইহার কাছে আসিয়াছে, ইহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত তাহার প্রয়াস আর কখনো শিথিল হয় না। এই নিরীহ জন্তুটির যতই নিকটবর্ত্তী হও না কেন সহজে আপনা হইতে আক্রমণ করে না কিন্তু যখন দেখিতে পায় বড়ই অধিক বাড়াবাড়ি, তখন সে আপনার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে। এক প্রকার তীব্র বিষাক্ত পূতিগন্ধময় জলীয় পদার্থ আক্রমণকারীর সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করে। ইহার এমনি দাহশক্তি, ত্বকের যেখানে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে সেখানে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের ন্যায় জ্বালা ধরাইয়া দেয়— চক্ষে পড়িলে তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইতে হয়। এই বিষরসের বিকট দুর্গন্ধ যে কিরূপ প্রবল এবং সুতীব্র গ্রন্থকার তাহার বহুল বর্ণনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই।

গ্রন্থকার কতকগুলি জন্তুর অদ্ভুত জন্মসংস্কারের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডের হিউনাকো রক্ষাভ কপিশ বর্ণের, আকৃতিতে উষ্ট্রের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে,—কেবল পৃষ্ঠ দেশে কুব্জ নাই এবং গতিবিধিতে অমন শ্রীহীন নহে। বরং ইহার প্রতি পদক্ষেপে বন্য হরিণের চঞ্চল বঙ্কিম বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণাচ্ছাদিত পর্ব্বতগাত্র, শ্যামল অধিত্যকা ইহাদের প্রিয় বিচরণ ভূমি, এইখানে অন্যূন চারি পাঁচ শত একত্রে দল বাঁধিয়া বাস করে। তাহারি মধ্যে একজন কিঞ্চিৎ উচ্চ ভূখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া প্রহরীর কার্য্য করে, শত্রুর আগমনের কোনও লক্ষণ দেখিবামাত্র দলপতি উচ্চ হ্রেষাধ্বনির দ্বারা সেই সংবাদ জ্ঞাপন করে, অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে কে কোথায় লুকাইয়া যায় তাহার কোন চিহ্নও থাকে না। ইহারা অত্যন্ত ভীরু এবং সতর্ক কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের কৌতূহল বৃত্তি বড় কম নয়। কত সময়ে কোন অশ্বারোহীকে একক যাইতে দেখিলে তাহার খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া

সকল পর্য্যবেক্ষণ করে. এমন কি ক্রোশের পর ক্রোশ তাহার অনুসরণ করে, বেশ জানে যে সেই সঙ্গীহীন অশ্বারোহীটি তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। গৃহস্থের ঘরে লালিত হইলে ইহারা দিব্য বাধ্য হয়। এই ক্রীড়াশীল সামাজিক জীবটির এক অদ্ভুত অভ্যাস, মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিলেই স্বদলবল ছাড়িয়া একাকী ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, অসহায়, অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে মরিতে যায়। কত যুগ যুগান্তর হইতে সেইখানে মৃত হিউনাকোর অস্থিরাশি সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন : জন্মাবধি চিরকাল যাহারা একত্রে বিচরণ করে বিপদ্‌কালেও সঙ্গীগণকে ছাড়িয়া পলায়ন করে না, যাহারা চিরকাল দিগন্তবিস্তৃত উদার প্রান্তরে বাস করে তাহারা মৃত্যুকালে চিরবিচ্ছেদমুখে, সকল ছাড়িয়া নদীতীরে খর্ব্ব গুল্ম, কন্টকাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যভূমিতে প্রতিপদে বাধা সহ্য করিয়া কেন যে প্রাণত্যাগ করিতে যায় তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। হয়ত বা বহু পুরাতন যুগে এই জন্মসংস্কারের কোন সার্থকতা ছিল, কিন্তু প্রকৃতি স্বরচিত কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে এমনি নারাজ, এখন কোনও সার্থকতা থাকুক বা না থাকুক তবুও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

হডসন্ সাহেব পক্ষী জাতির প্রতি একটু সমধিক স্নেহশীল ; ইহাদের গঠনলালিত্য, বর্ণ সৌকুমার্য্য, বিচিত্রভঙ্গী, সুবঙ্কিম নৃত্য, সুমধুর কলগীতি, সলীল গতি সকলি ইঁহার চক্ষে পড়িয়াছে। নব বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি যখন যৌবনশ্রী ধারণ করেন, পত্রে পুষ্পে পতঙ্গপুঞ্জে চতুর্দ্দিক বাসর গৃহের ন্যায় সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন ইহাদের যৌন নির্ব্বাচনের সময়, নীড় রচনা করিয়া এই চিরভ্রমণশীল চঞ্চল জীব গুলি কিছুকালের জন্য গৃহী হইয়া বসে। বসন্তের প্রথম আগমনে তাহারি উদ্যোগ হইতে থাকে। তখন শ্যাম বনভূমিতে কত সঙ্গীত কত আনন্দ নৃত্যের আয়োজন হয়— বহুবর্ণ বিচিত্র সুন্দর পক্ষ দুইটি বিস্তার করিয়া, গ্রীবাটি সুবঙ্কিম ভঙ্গীতে বাঁকাইয়া, প্রকৃতির নিপুণ হস্তরচিত চূড়াটি দোলাইয়া, পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছটি বিস্ফারিত করিয়া, আনন্দ গানে কিম্বা করুণ আর্ত্ত ক্রন্দনে কোনরূপে একটি বিহঙ্গিনীকে মুগ্ধ করিতে হইবে ইহাই উদ্দেশ্য - একক নহে অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী একত্র হইয়া আপন আপন নৃত্য কৌশল ও সঙ্গীত নিপুণতার পরিচয় দেয়, ভাগ্যলক্ষ্মী যাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন তাহারি অদৃষ্টে পত্নী লাভ ঘটে। কখনো বা বিহঙ্গিনীকে বেড়িয়া বেড়িয়া গান গাহিতে থাকে। যেন এইরূপে তাহার চারিদিকে সঙ্গীতের একটি গণ্ডী রচনা করিতেছে, তাহার বাহিরে যায় সাধ্য কাহার। কেবল মাত্র যৌন নির্ব্বাচনের সময়ই যে তাহাদিগকে এইরূপ সুকুমার কলার চর্চ্চা করিতে দেখা যায় এমন নহে— যখন নীড় রচনা করিয়া গৃহী হইয়াছে বিহঙ্গিনী আপনার বক্ষ-উত্তাপে কুলায়রক্ষিত ডিম গুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে তখনও মুগ্ধ প্রেমিক নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় বসিয়া কতই সুললিত সঙ্গীতে তাহার ক্লান্তি দূর করিবার চেষ্টা করে— কত সময়ে কেবলমাত্র নবজীবনের আনন্দ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। কত রকমেরি নৃত্য, কখনো একক, কখনো বহুসঙ্গী একত্রিত হইয়া।

দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডের রুপিকোলা কিম্বা পার্ব্বত্য কুক্কুট একক নৃত্য পছন্দ করে।

শৈবাল-আচ্ছাদিত গুল্মশ্রেণীবেষ্টিত পরিচ্ছন্ন একখানি প্রান্তরে অনেক গুলি রুপিকোলা একত্র সমবেত হয়— প্রথমে একটি পক্ষী নৃত্য করে ; উজ্জ্বল স্বর্ণাভ হরিদ্রা বর্ণের পক্ষ এবং পুচ্ছ বিস্তার করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া মৃদু সুন্দর ভঙ্গীতে নাচিতে আরম্ভ করে, ক্রমশঃ এতই উৎসাহিত হইয়া উঠে যে তখন আর তাল লয় জ্ঞান থাকে না, একেবারে উন্মত্তের ন্যায় অসংযত বেগে ছুটাছুটি করিতে থাকে। যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন অন্য আর একটি পাখী আসিয়া আবার সেই নৃত্য আরম্ভ করে। গ্রন্থকার দক্ষিণ ব্রেজিলে এক সময়ে কতকগুলি ক্ষুদ্রকায় নীল বর্ণের পক্ষীদিগের নৃত্য দেখিয়াছিলেন। প্রান্তরটি চতুষ্পার্শে বৃক্ষশ্রেণী সমাকীর্ণ, সেইখানে কতকগুলি পক্ষী কেহ উপলখণ্ডে কেহ অনুচ্চ বৃক্ষ শাখায় বসিয়া আছে— সংখ্যায় অনেকগুলি ; তাহারি মধ্যে একটি পাখী স্থির হইয়া বসিয়া উচ্চকলকণ্ঠে গান গাহিতেছে, অন্যান্য গুলি পক্ষ দুলাইয়া পা দুখানি নাচাইয়া তাল রাখিয়া মৃদু গুন গুন স্বরে সেই গানে যোগ দিতেছে ; কিছুক্ষণ এইরূপ চলিল তাহার পর সহসা কেমন ভীত হইয়া উড়িয়া পলাইয়া গেল। ইহারা সচরাচর একেলা চড়িয়া বেড়ায়, কেবল মাত্র এইরূপ নৃত্যকালে একত্রিত হয়।

একবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রন্থকার একটি নদীতীরে উপস্থিত হইয়া উভয় তীরে সমবেত জলচর পক্ষীশ্রেণীর যে একতান সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তখন আকাশে অস্তমান তপনের আরক্ত স্তিমিত রশ্মি, পূর্ব্ব গগনপ্রান্তে অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছে। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরখানি জনমানবহীন, নিঃশব্দ নির্জ্জন, প্রকৃতি যেন ধ্যাননিমগ্না, স্থির, সমাহিত। অকস্মাৎ একটি উচ্চ সুমিষ্ট কণ্ঠে গান আরম্ভ হইল, ক্রমে দুইটি তিনটি, অবশেষে একেবারে লক্ষ কণ্ঠে সেই গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল, অবিশ্রাম গম্ভীর সুসংযত সঙ্গীত স্রোত তরঙ্গে তরঙ্গে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল, আবার ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া দূর দূরান্তরে মিলাইয়া গেল। গ্রন্থকার বলেন এই সঙ্কীর্ত্তন কি ভূমানন্দে কি অসীম বিস্ময়ে তাঁহার সমগ্র হৃদয় পরিপ্লুত করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা হড্‌সন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে কয়েকটি অপূর্ব্ব প্রাণীর বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম, কিন্তু স্থানসংকীর্ণতা ও অক্ষমতাবশতঃ তাঁহার চমৎকার বর্ণনানৈপুণ্য ও ভাবুকতার আভাষ দিবার চেষ্টামাত্র পরিত্যাগ করিলাম।

ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫

সাইবিরিয়া

আমরা বঙ্গ সন্তান নিতান্তই ঘরের ছেলে। দেশ ছাড়া দূরের কথা, গ্রামখানি ছাড়িয়া দুপা নড়িতে মন সরে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধেও বিদেশযাত্রা সহজসাধ্য নয়। কেবলমাত্র কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে, প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক অনুরোধের অনিবার্য্য আকর্ষণে, দেশ দেশান্তরে ভবঘোরে ঘুরিতে যাওয়া তো নিতান্তই উন্মাদের কাজ বলিয়া গণ্য হইবার কথা। তাই Meigrien [Meignan] সাহেব প্রণীত "From Paris to Pekin Over

the Siberian Snows" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে বড়ই বিস্মিত হইতে হয়।[৩] তদ্ভিন্ন গ্রন্থকার এমনি এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশের অজ্ঞাত জাতিসমূহের জীবন এবং কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে কৌতূহলী পাঠকের হৃদয় অধ্যায়ে অধ্যায়ে তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্তের শেষ পর্য্যন্ত গিয়া তবে পরিতৃপ্ত হয়।

গ্রন্থকার বলেন জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত দেখিলে ব্যক্তি-বিশেষকে যেমন সম্যকরূপে জানা যায় তেমনি স্থানবিশেষ সময়-বিশেষে দেখিলে তবে তাহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সম্ভব। পূর্ব্বে একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সীরিয়া এবং নিউবিয়ায় উপনীত হইয়া, সেখানকার পরিপূর্ণ নিদাঘ শ্রী, নিবিড় শ্যামল পত্র-পল্লব, পরিস্ফুট আরক্ত কুসুমলাবণ্য, দিগন্তবিস্তৃত মরুবালুকা রাশির সূর্য্যকিরণপ্রতপ্ত অতিশ্বেত তীব্র নেত্রদাহকর প্রচণ্ড রুদ্র মহিমা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এবার দারুণ শীতে অনন্ত তুহিনাচ্ছাদিত সাইবিরিয়া কিরূপ নিশ্চল নিস্পন্দ, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র সৌন্দর্য্যধারণ করে, কলনাদিনী চিরচঞ্চলা নৃত্যপরা নদী নির্ঝরিণী হিমানীর দুরন্ত দুর্জ্জয় শাসনে স্তম্ভিত হইয়া স্তব্ধ অসাড় মৃতবৎ প্রস্তরকঠিন তুষার স্তূপে পরিণত হয় তাহাই দেখিবার জন্য আয়োজন করিয়া ১৮৭৩ সালের আশ্বিন মাসে পারিস পরিত্যাগ করিয়া রুষিয়ার রাজধানী সেন্টপিটার্সবর্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন তিনি সেন্টপিটার্সবর্গ গিয়া পৌঁছেন তখন নগরীর দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিতা শুক্লা পূর্ণিমার রাত্রি। শ্বেত সৌধমালার স্বর্ণচূড়াবলি, ভজনালয়ের উত্তুঙ্গ শীর্ষ-শ্রেণী চন্দ্রকিরণপাতে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল প্রশান্ত নদী-বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া দ্বিগুণতর সুন্দর, নেভার প্রশান্ত স্থির বক্ষে কৃষ্ণবর্ণের ভিনীসীয় গণ্ডোলাসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীমালা পশ্চাতে এক এক খানি জ্যোৎস্নাশুভ্র গতিচিহ্ন রেখা রাখিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, লাভোসা হ্রদের পরিপূর্ণ অগাধ বারিরাশি অবাধে গৌরবমন্থর গতিতে প্রবাহিত, চারিদিক সুগম্ভীর নিস্তব্ধ, থাকিয়া থাকিয়া ভজনালয়ের গভীর সুমিষ্ট ঘন্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকের সেই প্রশান্ত নীরবতাকে আরো পরিপূর্ণ এবং প্রসারিত করিয়া তুলিতেছিল।

সেন্টপিটার্সবর্গে থাকিয়া সাইবিরিয়া প্রবেশের অনুমতি পত্র এবং এই দুরূহ যাত্রার একটি সঙ্গী সংগ্রহ করিতে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এদিকে শীতও ক্রমশঃ অগ্রসর, পথ ঘাট তুষারাচ্ছন্ন হইতেছে দেখিয়া অগত্যা একাকী যাত্রাই মনস্থ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার বন্ধুর পত্রে জানিতে পারিলেন একজন রুষীয়ান কর্ম্মচারী সাইবিরিয়া কাইকটা প্রদেশে যাত্রা করিতেছেন, তিনি গ্রন্থকারের সঙ্গী হইতে পারেন। রুষীয়ার ধনী দরিদ্র, প্রভু ভৃত্য, ভদ্র, অভদ্র, সকলেই সম্রাটের নামে কিরূপ তটস্থ তাহারি প্রমাণ স্বরূপে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার পত্রখানি পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, দেখিলেন কর্ম্মচারীটি আহার করিতেছেন, নিকটে অর্দ্ধ মোগল মুখশ্রী একজন ভৃত্য তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহস্বামী ভৃত্যকে সমাগত অতিথির নিমিত্ত আসন দিতে আজ্ঞা করিলেন, নিকটে কোনও আসন ছিল না, কক্ষান্তর হইতে আনিতে গেল, ততক্ষণ অতিথি দণ্ডায়মান থাকিলেন। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল গৃহস্বামী ততই ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন, ভৃত্য যখন আসন লইয়া

উপস্থিত হইল তখন তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াও তুষ্ট হইলেন না। মুষ্টি উদ্যত করিয়া প্রহার করিতে যাইতেছিলেন— গ্রন্থকার প্রাচ্য প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া এরূপ দৃশ্যে অভ্যস্ত থাকায় বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। অকস্মাৎ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন— প্রভুকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া ভৃত্য সম্মুখীন হইয়া গম্ভীর ভাবে অক্ষুণ্ণ আত্ম সম্মানের সহিত বলিল, "মহাশয়, আপনি কি তবে ভুলিয়া গেলেন যে আমিও রুষীয় সম্রাটের প্রজা?" প্রভুর কঠিন উদ্যত মুষ্টি শিথিল হইয়া নিরুপায় ভাবে পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল।

প্রত্যেক রুষীয়ান নগরীতে একটি করিয়া ক্রেমলিন থাকে, সেটি সম্রাটের আবাসগৃহ। মস্কোর ক্রেমলিন সুবৃহৎ প্রশস্ত এবং বহুবিধ ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ থাকায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। একদিন সেখানকার বিচিত্র কারুকার্য্য দেশ বিদেশ হইতে আনীত বিবিধ চিত্র এবং মর্ম্মর মূর্ত্তি সকল দেখিতে দেখিতে তাহার মধ্যে নেপোলিয়ানের প্রতিকৃতি এবং মর্ম্মর মূর্ত্তি যত্নে রক্ষিত দেখিয়া গ্রন্থকার বড়ই বিস্মিত হয়েন। নেপোলিয়ান রুষীয়ানদিগের বিশেষতঃ মস্কো মহানগরীর কি দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন তাহা কাহারো অবিদিত নহে। তবু সেই জাতীয় বিদ্বেষ ভুলিয়া কেবল মাত্র বীরত্ব এবং প্রতিভা সর্ব্বদা প্রশংসনীয় জানিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জাতীয় মহানুভাবের যথার্থ পরিচয়। মস্কো অবস্থিতিকালে গ্রন্থকার ট্রইটসা ধর্ম্মনিবাস দেখিতে যান। তথাকার অতুল ঐশ্বর্য্য মণি মুক্তা হীরকের স্তূপ দেখিলে আরব্য উপন্যাসের অসম্ভব কাহিনী সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। ধর্ম্মপূজকগণ পর্ব্বোপলক্ষ্যে যে সকল মুকুট এবং দণ্ড ধারণ করেন তাহার এক একটির মুক্তা পরিমাণ করিলে অন্ততঃ আট দশ সের হয়। তদ্ভিন্ন সে সকল যে কত মণি মাণিক্য কত হীরক কত নীলকান্তখচিত তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। ঐশ্বর্য্যের এই অক্ষয় ভাণ্ডার স্তূপাকার বিবিধ বর্ণের মহার্হ রত্নরাজি দেখিতে দেখিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মনিবাসে একটি অতি সামান্য পুস্তকাগার নাই।

মস্কো হইতে রেলপথে নভগরোড যাত্রা করেন। এখান হইতে কাইকটা পর্য্যন্ত বরফের উপর দিয়া শ্লে গাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। পৌঁছিয়া দেখিলেন ওকা নদী জমিয়া গিয়াছে, তাহার উপর শ্লে গাড়ীর যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। সহরটি বড সুন্দর বিশেষতঃ তাহার দূর এসিয়াখণ্ড হইতে আনীত বিবিধ বিচিত্র পণ্যসামগ্রীসজ্জিত বিপণী মণ্ডপটি বহুজনসমাগমে বিভিন্ন জাতির বেশবিন্যাসে নানাবিধ বর্ণবাহুল্যে সর্ব্বদাই সুদৃশ্য। নগরীর উপান্তে ভল্‌গা এবং ওকা নদী একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, সঙ্গমস্থল বিস্তারে অন্যূন দুই ক্রোশ হইবে। এই বিশাল নদীস্রোতের দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া ইউরোপের সীমান্ত-সম্মিলনভূমিতে এক বিরাট পর্ব্বত উভয় রাজ্যের সতর্ক প্রহরীর ন্যায় গর্ব্বিত মস্তক ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া আছে।

এই পর্ব্বত-গাত্রে নভগরোডের গৃহাবলি নির্ম্মিত, নবাগত প্রবাসী উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে রুষীয়ান হেমন্তের শীতার্ত্ত নিস্পন্দ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন— বহুযোজনবিস্তৃত জীবসমাগমশূন্য তুষারাচ্ছাদিত তরঙ্গায়িত প্রান্তর, পুষ্পপল্লববিহীন নগ্নশাখ হিমভারগ্রস্ত স্তম্ভিত অরণ্য, স্তব্ধ-কল্লোল তুষারকঠিনা স্রোতস্বিনী।

পর্য্যটক নভগরোড হইতে শ্লে গাড়ীতে যাত্রা আরম্ভ করেন। শ্লে গাড়ী দেখিতে অনেকটা ছৈ-ঢাকা নৌকার মতন, সম্মুখে খোলা, রাত্রিকালে সেখানে খুব মোটা পর্দ্দা ফেলিয়া দিতে হয়, কোন চাকা নাই, নীচেটা একেবারে সমতল— দুই বা ততোধিক ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যায়। ভিতরে দুইজন মাত্র আরোহীর সঙ্কুলান স্থান থাকে। যে ব্যক্তি গাড়ী হাঁকাইয়া যায় তাহার বসিবার কিম্বা বিশ্রাম করিবার মত কোন স্থান নাই। কায়কষ্টে অনতিপ্রসর একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিয়া গাড়ী চালাইতে হয়। যাত্রাকালীন শীত নিবারণের জন্য তাঁহাদিগকে এতই অধিক বস্ত্র পরিধান করিতে হইয়াছিল যে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রথমে চার জোড়া খুব পুরু পশমের মোজা, তাহার উপর হাঁটু পর্য্যন্ত আর এক জোড়া মোজা, শীতকালে ইউরোপীয়গণ স্বদেশে যে বেশ ধারণ করেন তাহার উপর তিনটি পশুলোমের লম্বা কোট, মাথায় পশুলোমের টুপি, কেবলমাত্র তাঁহাদের চক্ষু দুইটি আর নাসিকার অগ্রভাগটুকু অনাবৃত ছিল। ইহাতেও হয় নাই, গাড়ীতে উঠিয়া আরো চারখানি কম্বল ঢাকা দিয়া তবে শীত নিবারণ হয়। যাত্রার প্রথম দিন দিব্য আরামে কাটিয়াছিল, সবই নূতন অননুভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব, পিচ্ছিল কঠিন তুষারের উপর দিয়া বায়ুবেগে অশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে দিগন্ত বিস্তৃত শ্বেত তুষারাচ্ছাদিত প্রান্তর, শীতের তীব্র বাতাসে দ্রুতগতিতে উত্তপ্ত অধীর রক্তসঞ্চালনে সর্ব্বাঙ্গে যেন নব যৌবন বিস্তার হইতেছিল। নিমেষে নিমেষে নূতন দৃশ্য কৌতূহল বৃত্তিকে সজাগ রাখিয়া হৃদয়ে শৈশব-নির্ম্মল আনন্দ সঞ্চার করিতেছিল। নভগরোড হইতে কাজান পৌঁছিতে তাঁহাদের দুইদিন লাগে।

রুষীয় সম্রাট ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাতারগণকে পরাজয় করিয়া কাজান অধিকার করেন। এই দীর্ঘকালস্থায়ী পরাধীনতায় তাতারগণের আত্মগৌরব কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কাজান সহর তাহারাই স্থাপন করে, অনেক বার রুষীয়গণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করে, অবশেষে শত্রুপক্ষ ভলগা নদী হইতে পানীয় জল পর্য্যন্ত আনয়নের সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধ জয়ের আশা শেষ পর্য্যন্ত যখন মিটিয়া গেল তখন তাতার রাজ্ঞী অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখর হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন . শত্রুপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ তাঁহার এমনি অসহ্য অপমানজনক বোধ হইয়াছিল। তাতার পুরুষগণের নির্ভীক উজ্জ্বল মহত্ত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিয়া অধিকতর কমনীয় তাতার রমণীগণকে দেখিবার জন্য গ্রন্থকার উৎসুক হয়েন, অবরোধ প্রথার কঠিন শাসনে তাঁহার সে স্বাভাবিক কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় নাই। তাতারদিগের বাহ্যাকৃতি যেমন সুন্দর তাহাদিগের মহৎ অন্তঃকরণবৃত্তিও তদনুরূপ। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া রুষেরা ইহাদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করে, মুখে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করে না, তবে মনে মনে ইহাদিগের মহত্ত্ব স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। সৎলোকের উদাহরণ দিতে হইলে চলিত কথায় বলে, "বিশ্বাসে এবং সততায় তাতারের মত"।

সাইবিরিয়ার পথে কাজান শেষ ইউরোপীয় সহর। ইহার পথ ঘাট গৃহ পান্থশালা সকলি ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত। কাজানের আদিম নিবাসীগণের নাম ভোটিয়াক। তাতারদিগের পূর্ব্বে হইতে এ সকল স্থান ইহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। আকৃতিতে

কর্কশ, ব্যবহারে, বেশ ভূষায় ইহারা দ্বিপদ জন্তুবিশেষ, কিন্তু ইহাদিগের মনগুলি নিস্কলঙ্ক শিশুর মত সহজ সরল এবং সুকোমল!

অরণ্যচর জীবের ন্যায় ইহাদের স্বাধীন গতিবিধি ; মৃগয়া করিয়াই ইহারা জীবন নির্ব্বাহ করে। অরণ্যের সুদৃশ্য শ্যামল আশ্রয়ে তাম্বু খাটাইয়া বাস করে, তাম্বুগুলি সর্ব্বদাই দক্ষিণ মুখ করিয়া স্থাপন করা হয় এবং সেই দিকে কেবল মাত্র একটি প্রবেশ দ্বার থাকে, এইখানেই ইহাদিগের পূজা প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মার্চ্চনা প্রভৃতি সকল কার্য্যই হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সেনসসে ইহারা সংখ্যায় ৫০,০০০ ছিল। ইহার মধ্যে অনেকেই খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি অধিকাংশই কুসংস্কারান্ধ পৌত্তলিক। ভোটিয়াকেরা তিনটি প্রধান দেবতার পূজা করে, একজন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বময় প্রভু, তাঁহার নাম ইনমার, দ্বিতীয় দেবতা ভূমিভাগ এবং উৎপন্ন শস্যরাজির রক্ষাকর্ত্তা, তৃতীয় জলদেবতা, নদ নদী হ্রদ সমুদ্রে তাঁহার অধিকার। ইনমার সূর্য্যে বাস করেন তাই ইহারা সূর্য্যকে বড় ভক্তি করে।

শরতের প্রারম্ভে ইহাদিগের সর্ব্বপ্রধান বাৎসরিক উৎসব হয়। তখন পুরোহিতদিগের কর্ত্তা টুয়া কোনও একটি তাম্বুর সম্মুখীন হইয়া ক্রমান্বয়ে একটি হাঁস একটি রাজহাঁস একটি ষাঁড় এবং একটি ঘোড়া বলিদান করে। লালরং এর ঘোড়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি, তাহার অভাবে কাল ভিন্ন অন্য সকল রংএর ঘোড়া পূজাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। বলিদানের পর উপস্থিত ভক্তগণ তাহার মাংস আহার করে, পুরোহিত রক্ত মেদ অস্থি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, মস্তকটি নিকটবর্ত্তী কোনও গাছে বাঁধিয়া রাখা হয়, চর্ম্মখানি বিক্রয় করিয়া পুরোহিত তাহার মূল্য গ্রহণ করে। মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে স্নান করাইয়া বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি পরাইয়া দেয় : কবর বন্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার মধ্যে গুটিকত রৌপ্য মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া বলে, "অদ্যাবধি এ ভূমিখণ্ড তোমার হইল।" প্রত্যেক রুষীয় সম্রাটের অভিষেক সময়ে ভোটিয়াকদিগকে নূতন করিয়া বশ্যতার শপথ গ্রহণ করিতে হয়। মাটীর উপরে একখানি ভালুকের চামড়া বিছাইয়া তাহার উপর একটি কুঠার একখানি ছুরী এবং এক বৃহৎখণ্ড রুটী রক্ষিত হয়, প্রত্যেক ভোটিয়াক এক এক টুকরা রুটি কাটিয়া লইয়া আহার করিতে করিতে বলে, "যদি আমি তাঁহার জীবিতকালে আমার রাজার নিকট অবিশ্বাসী হই, যদি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি, যদি তাঁহার দত্ত কর্ত্তব্য সম্যকরূপে সম্পন্ন না করি, যদি তাঁহাকে কোনরূপে অসন্তুষ্ট করি তবে যেন এমনি ভালুক বনের ভিতরে আমার হৃৎপিণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। এই রুটীখণ্ড এখনি আমার কণ্ঠে আবদ্ধ হইয়া আমাকে নাশ করে, এই ছুরিকা যেন আমার অঙ্গ বিদ্ধ করে, এবং এই কুঠার যেন আমার হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলে।" ধর্ম্মের জন্য রাজহস্তে প্রভূত অত্যাচার সহ্য করিতে হয় তবু কখনো ইহাদিগকে সত্যভঙ্গ করিতে শোনা যায় না।

কাজান হইতে পার্থের পথে নিবিড় অন্তহীন বন শ্রেণীর মধ্য দিয়া যাইতে হয়। শীতকালে হিমভারাক্রান্ত বৃক্ষসমূহ অবনত আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, বাতাসে একটি পল্লবও কম্পিত হয় না, অস্ফুট মধুর মর্ম্মরধ্বনি শ্রুত হয় না, পাখীর গান নাই,

জীব জন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র ক্রোশের পর ক্রোশ স্তম্ভিত নিস্পন্দ অরণ্যানী, শ্বেত তুষারস্তূপ, মূর্ত্তিমান ভীষণ মৃত্যুর ন্যায় হৃদয়কে শঙ্কিত আর্ত্ত এবং বিষণ্ণ করিয়া ফেলে।

সাইবিরিয়ার পথের হোটেলে সকল বন্দোবস্ত থাকে, কেবল মাত্র স্নানের কোন ব্যবস্থা নাই। গ্রন্থকার নিজে ব্যবস্থা করিয়া স্নান করিলে হোটেল-অধিকারীগণ বড় চটিয়া ছিল ; ঘরে জল ছিটাইয়া পড়ায় তাঁহার অপরিস্কারের নিন্দা রটিয়া যায়। এই শীতার্ত্ত দেশে সহজে কেহ জলস্পর্শ করিতে চাহে না, অনেক সময় সুদীর্ঘ বৎসর অস্নাত অবস্থায় কাটাইয়া দেয়। সাইবিরিয়ার দুরন্ত শীতে সকল দ্রব্যই জমিয়া প্রস্তরকঠিন হইয়া যায়, নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকেও আহার্য্য সম্মুখে করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হয়। যতক্ষণে গৃহের উত্তাপে সে সকল কোমল অবস্থা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ ব্যস্ত হইয়া কোন লাভ নাই, সে সকল কঠিন পদার্থে দন্তস্ফুট করা কাহারো সাধ্য নহে। এই কঠিন অবস্থায় মৎস্য মাংস কিম্বা ফল কোন দ্রব্যেরি স্বাভাবিক স্বাদ কিম্বা গন্ধ নষ্ট হয় না ; বহুকাল পরে আহার করিলেও সদ্য আহরিত পদার্থের ন্যায় সুস্বাদু থাকে। এই প্রদেশে স্যামপেন সহজলভ্য নয় বলিয়া ইহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক ; তবুও যাত্রাকালে স্যামপেন ঢালিয়া অশ্বক্ষুর ধৌত করা এখানকার এক অদ্ভুত রীতি।

ওমস্ক নগরী একটি অনতিউচ্চ পর্ব্বতের শীর্ষভাগে নির্ম্মিত। এই পর্ব্বতের পাদ দেশ ধৌত করিয়া ইর্টিস নদী প্রবাহিত। সম্মুখে দক্ষিণে বামে মধ্য এসিয়ার দিগন্তস্পর্শী যোজনবিস্তৃত সমতল প্রান্তর ; দিবাভাগে সূর্য্যকিরণপাতে এই তুষারাচ্ছাদিত প্রান্তরে ক্ষণে ক্ষণে এমনি অপূর্ব্ব সুন্দর বর্ণ সমাবেশ হয় যে অপার সমুদ্রের নিত্য নূতন তরঙ্গভঙ্গী, অনন্ত অবিরত চাঞ্চল্যের ন্যায় তাহা দেখিয়া দেখিয়া কখনো শ্রান্তি হয় না। গ্রীষ্মকালে এই প্রান্তরটি দেখিতে অধিকতর সুন্দর লাগে। তখন সুদীর্ঘ শ্যামল তৃণশ্রেণী বায়ুবশে নিরন্তর আন্দোলিত হইতে থাকে, সূর্য্যকিরণে কোথাও স্বর্ণোজ্জ্বল হরিত বর্ণ কোথাও বা ছায়াপাতে সুগভীর কৃষ্ণবর্ণ দূর হইতে তমসাচ্ছন্ন সুবৃহৎ গহ্বর বলিয়া ভ্রম হয়। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন সৌন্দর্য্য। আরববাসী বেদুয়িনগণ যেমন মরু ভূমিকে ভালবাসে, সুইজারল্যাণ্ড বাসীগণ যেমন আলপস পর্ব্বতের পক্ষপাতী, ওমস্ক বাসীগণ তেমনি এই ষ্টেপস প্রান্তর প্রিয়। এইখানে তাহারা মেষপাল চরাইয়া বেড়ায় ; দিনের পর দিন এই মৃগয়াপ্রিয় জাতি অশ্রান্ত উৎসাহে শীকার করে ; পর্ব্বোপলক্ষ্যে উৎসবের দিনে আমোদ প্রমোদ করে ; দিনের মধ্যে একবার এখানে বেড়াইতে যাওয়া ইহাদিগের নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। ওমস্কের আদিম নিবাসী খার্গিজগণ রুষীয় সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি তাহাদের উদ্দাম স্বভাব বিদ্রোহ-প্রিয়তা দূর হয় নাই, সর্ব্বদাই চেষ্টা করে কেমন করিয়া পূর্ব্ব স্বাধীনতা উদ্ধার করিবেণ ইহাদিগের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা প্রধান কর্ম্মচারীর একমাত্র কাজ কিন্তু সে এমনি দুরূহ ব্যাপার যে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে বহু চেষ্টার পর এখন স্থির হইয়াছে কোনও খার্গিজ যদি নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে যায় তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী পুষ্পপল্লব-প্রচুর, দ্রাক্ষা-উদ্যান-বহুল, রম্য

ভূভাগ ইহাদিগের আদিম নিবাস ভূমি। সেখান হইতে তাড়িত হইয়া তাতার প্রান্তরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে ; অনেকবার স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল, প্রত্যেক বারই পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহে দলপতি সৈন্য মনোনীত করে এবং কাহাকে কত অশ্ব এবং অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। অপরাধীদিগের বিচার এবং দণ্ড বিধানের ভার গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে। হত্যা অপরাধে অনুযুক্ত হইলে প্রথমে বিচারকর্ত্তা নিজহস্তে শাস্তিবিধান করেন ; তৎপরে তাহাকে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় দিগের হস্তে সমর্পণ করা হয়, তাহাদিগের ইচ্ছানুরূপ প্রাণদণ্ড হয় নতুবা আমরণ কাল পদানত দাস হইয়া থাকিতে হয়। প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত হইলে দণ্ড স্বরূপ একশত অশ্ব এবং দুইটি উষ্ট্র উপহার দিতে হয়। শিশু কিম্বা স্ত্রী হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হয় না ; একশত অশ্ব এবং দুইটি উষ্ট্র উপহার দিলে অব্যাহতি পাইতে পারে। ইহারা যাদুকর এবং গণৎকারদিগের বড় ভক্ত। দেখিতে উন্নতাকৃতি, গৌরবর্ণ গর্ব্বিত মুখশ্রী, যুদ্ধ এবং মৃগয়া ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়, বেশ বিন্যাসও তদনুরূপ। পরিধানে পশু চর্ম্মের পায়জামা ; রক্তবর্ণ উল্কামুখী শৃগালের চর্ম্মের আঙ্‌রাখা, পশু লোমাচ্ছাদিত রক্তবর্ণ টুপি, তৃণনির্ম্মিত পাদুকা, পৃষ্ঠদেশে বাণপরিপূর্ণ শরাসন এবং ধনুক লম্বমান, কটিদেশে বৃহৎ গদা, দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটি শ্যেনপক্ষী। প্রান্তরবাসী হইয়াও ইহারা অবরোধ প্রথা রক্ষা করিয়া চলে।

টোমস্ক নগরী টম নদীর উভয় পার্শ্বে নির্ম্মিত, দেখিতে বড় সুন্দর। চতুষ্পার্শ্বের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। টোমস্কবাসীগণও দিব্য পরিশ্রমী। এখানে প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় ; নিকটবর্ত্তী নদী হইতে মৎস্য চালান দিয়াও ইহারা অনেক পয়সা উপার্জ্জন করে। গ্রীষ্মকালে টোম নদীতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকলের পণ্য বহন করিয়া অনেক জাহাজ যাতায়াত করে। শীতে ব্যবসা বাণিজ্য সকলি স্থগিত থাকে। টোমস্কবাসীদিগের সৌজন্য প্রকাশের কতক গুলি অদ্ভুত রীতি আছে। গৃহের একপার্শ্বে যীশুমাতা মেরীর একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হয়, সর্ব্বদাই তাহার সম্মুখে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে, অতিথি গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সেখানে গিয়া তিনবার নমস্কার করেন, তৎপরে গৃহস্বামীকে অভিবাদন করেন। গৃহস্বামী আহারে নিযুক্ত থাকিলে বলেন, "আশা করি আপনার চায়ে চিনি দিতে সমর্থ হইয়াছেন", এ দেশে চিনি বড় সুলভ নহে। বিদায় কালীন বলেন, "শান্তিতে থাক", দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়, "যাহা কিনিব আশা করি তাহাতে তোমার লাভ থাকিবে।" টোমস্কের পর হইতে ষ্টেপস প্রান্তরের নিতান্ত অক্ষুণ্ণসমতা দূর হইয়া ক্রমশঃ তরঙ্গায়িত অধিত্যকা এবং গিরিশ্রেণী দেখা দেয়, দুই গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া সাইবিরিয়ার অন্যতম রাজধানী ইর্কুটস্ক প্রবেশ করিতে হয়। এখানে একদিকে স্বর্ণখনি-অধিকারীদিগের যেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য্য এবং ভোগবিলাস, অন্যদিকে নির্ব্বাসিত বন্দীদিগের তেমনি অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা। একটি অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে অন্ততঃ ৭০/৮০ জন বন্দী আবদ্ধ থাকে, তাহাদিগের আহার্য্য দ্রব্য কদর্য্য, পরিধেয় বস্ত্র অতিশয় মলিন, অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে অতি নির্ম্মম শাস্তি সহ্য করিতে হয়। অনেক

সময় এই বন্দীদিগের স্ত্রীগণ এখানে আসিয়া বাস করে, তাহাদিগের কতকটা স্বাধীনতা আছে, রাজকীয় অর্থে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ চলে কিন্তু তাহার বিনিময়ে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। একবার আসিলে স্বামীর মুক্তিকাল পর্য্যন্ত আর দেশে ফিরিয়া যাইবার অধিকার থাকে না। যে সকল বন্দী চির জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত তাহাদিগের পত্নী-দিগকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানেই বাস করিতে হয়। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য নির্ব্বাসিত পোলাণ্ডবাসীদিগের জীবন কতক পরিমাণে সহজ এবং সুখের। নগরবাসীদিগের ন্যায় তাঁহাদের স্বাধীন ব্যবহারের এবং গমনাগমনের কোন বাধা নাই, তবে আমরণকাল সাইবিরিয়া ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পান না, অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন, কখনও কৃতকার্য্য হয়েন নাই, —অর্দ্ধ পথেই অনেকে প্রাণত্যাগ করেন। যাঁহারা জীবিত থাকেন তাঁহারাও ধৃত এবং পুনরানীত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নরহত্যা-অপরাধী নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ এই বিদ্রোহীদিগকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখে, নরহত্যা অপেক্ষা রাজদ্রোহিতা অধিক দোষের বলিয়া মনে করে। সাধারণতঃ রুষীয়ানগণ সম্রাটকে দেবতা অধিক বলিয়া মনে করে।

ইর্কটস্কের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎখাত হয়। ধনী দরিদ্র সকলেই এই স্বর্ণব্যবসায়ে ব্যাপৃত। চতুর্দ্দিকের উর্ব্বরা শ্যামলা ভূমি অনাদরে পড়িয়া থাকে, তাহা হইতে মুষ্টি পরিমাণ শস্যও উৎপাদিত হয় না। আবশ্যকীয় অতি সামান্য দ্রব্যাদিও বহুদূর হইতে আনীত এবং দুর্ম্মূল্য, মিস্ত্রী কারিকরদিগের দৈনিক বেতন অত্যন্ত অধিক। সামান্য একটি চাবি খুলিয়া দিবার জন্য গ্রন্থকার ৩০ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াও কোন কারিকর পান নাই। ইর্কটস্কবাসী ধনী স্বর্ণখনি-অধিকারীদিগের বিলাস এবং বাহ্যাড়ম্বরে অর্থব্যয়ের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহারা ঘোড়ার ডাক বসাইয়া বহু যোজন দূরে ভল্গা নদী হইতে জীবন্ত মৎস্য আনিয়া আহার করেন। চুরুটের ছাই ফেলিবার জন্য লক্ষমুদ্রার অধিক মূল্যের বৃহৎ স্বর্ণখণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকেন। একবার বর্ষার দিনে কোনও ধনী ব্যক্তির গাড়ী করিয়া হাওয়া খাইতে যাইবার সখ হয়। কিন্তু সেদিন পথ পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত, অশ্ব কিম্বা শকটে পঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে ; ধনী ব্যক্তির তাহা সহ্য হইবে কেন ; সমস্ত পথ কার্পেটে মুড়িয়া গাড়ী হাঁকাইয়া বিন্দুমাত্র কর্দ্দমহীন অক্ষুণ্ণ পরিপাট্যে সানন্দচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইঁহাদিগের বেশ বিন্যাস প্রসাধনবাহুল্যে স্ত্রী-জাতিও হার মানিয়াছেন। পুরুষেরা যখন সাজসজ্জার বিলাসে প্রমোদে বাহ্যাড়ম্বরে অর্থনাশ করিতে ব্যস্ত, স্ত্রীগণ তখন নির্জ্জন নিভৃতে সহজ সাহিত্য চর্চ্চা করেন, সকলেরি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, জীবনে সেন্টপিটর্সবর্গবাসিনী ধীশালিনী ভগিনীগণের সমকক্ষ হইবেন— কতদূর কৃতকার্য্য হয়েন সাহিত্যে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পরিব্রাজক বৈকাল হ্রদ পার হইয়া, মোঙ্গলিয়ার গবি মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যখন চীন রাজধানীতে উপনীত হইলেন তখন বসন্তের প্রারম্ভে দিকে দিকে বিশ্ব বিজয়ী দক্ষিণ পবনের তোরণ সজ্জা। গ্রামে নগরে বনান্ত ভূমিতে প্রচুর পুষ্প পল্লবের বিচিত্র শোভন সৌন্দর্য্য, বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল পরিপক্কশীর্ষ শস্যরাজির শ্যামল তরঙ্গে আন্দোলিত,

নদী সৈকত নবোদ্ভিন্ন দূর্ব্বা আস্তরণে সুকোমল, নির্ঝর সঙ্গীতে মুখরিত। তুষারস্তম্ভিত নিঃশব্দ জনপ্রাণীবিরল স্বল্পালোকিত কুজ্‌ঝটিকা পরিব্যাপ্ত সাইবিরিয়ার অন্তহীন অরণ্য প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া, অসংখ্য কর্ম্মকুশল মানবের নিত্যকর্ম্মে উৎসবে আনন্দে কলরবে পরিপূর্ণ চীনরাজ্যে আসিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল বহু পুণ্যফলে মৃত্যুর বৈতরণী পার হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবধাত্রী ধরণীর অঙ্কে যেন নূতন জন্ম লাভ করিলেন। তটান্তশায়ী সমুদ্রের বিচিত্র কল্লোলে তরঙ্গমালার নিত্য উৎক্ষিপ্ত আন্দোলনে এই সুচির প্রবাসীর হৃদয় সুদূর সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সুন্দরী জন্মভূমির নিমিত্ত একান্ত কাতর হইয়া উঠিল।

ভারতী, কার্ত্তিক ১৩০৫

ঔপনিবেশিকের জীবন-সংগ্রামঃ

পৃথিবীর নিভৃত নেপথ্যবাসী ঔপনিবেশিকের হৃদয়ে রুষিয়ার রাজ্যবিস্তার মন্ত্রণা, পার্লামেন্টের উত্থান অধিবেশন সম্বাদ, চীন জাপানের রাজনৈতিক অবস্থা—ইহার কোনটাই কোনরূপ তর্ক বিতর্ক উত্থাপন করে না। হড্‌সন নামক একজন ভাবুক লেখক তাঁহার রচিত একখানি সরস পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন একবার দুই মাস পরে একখানি সংবাদ-পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। পত্রিকাখানি দেখিবা মাত্র তিনি ব্যগ্র ভাবে সেখানি উঠাইয়া লইয়া উত্তেজক সংবাদের সন্ধানে প্রতি সংবাদ-স্তম্ভ প্রত্যেক প্রস্তাবনা আগ্রহের সহিত অন্বেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ পরে সরাইয়া রাখিলেন, ঘরে যে গল্প গুজব হইতেছিল অন্যমনস্ক ভাবে তাহাই শুনিতে লাগিলেন, অবশেষে সেখানি অপঠিত ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। মার্জ্জার যেমন ক্ষুধিত না থাকিয়াও সম্মুখ দিয়া ক্ষুদ্র মূষিকটিকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিলে একটি থাবা মারিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে না, তিনি তেমনি কোন চিন্তা না করিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে কাগজ খানি তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেটি পুরাতন দৈনিক অভ্যাসের লুপ্তাবশেষ মাত্র।

কাগজ খানি ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া হড্‌সন বুঝিতে পারিলেন, সভ্য জগতের নিত্য নূতন সংবাদ রাজনৈতিক উত্থান পতনের কৌতূহল এবং মোহ তাঁহাকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে কারণে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না, কিম্বা আশ্চর্য্য হইলেন না— যদিচ এতকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক চাল গুলি বড়ই আগ্রহ এবং আনন্দের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এ দুইটি মাস কাল কি ভাবে যাপন করিয়াছিলেন যাহাতে এ পরিবর্ত্তন ঘটিল? কোন কুহকের পাত্র হইতে অপূর্ব্ব অমৃত রস পান করিয়া মহানন্দে সকল বিস্মৃত হইয়া বসিয়া আছেন! এ প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন প্রকৃতির সুধা পাত্রে পিপাসা মিটাইয়া তাঁহার এই দিন গুলি কাটিয়াছে।

রাজনৈতিক সংবাদের নিমিত্ত উৎকট আগ্রহ, নিত্য নূতনতার নিমিত্ত ঐকান্তিক ঔৎসুক্য, এ গুলি জ্বররোগীর দুরন্ত তৃষ্ণার ন্যায় অস্বাভাবিক, অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। সভ্যতা আমাদের চারিদিকে যে সকল কৃত্রিম অভ্যাসের প্রাচীর রচনা করিয়াছে এ অস্বাস্থ্য তাহারি পরিণাম। একটু দূরে যাইয়া এই অস্বাভাবিক পিপাসার সহায়তা না করিয়া

কিঞ্চিৎ মাত্র চেষ্টা করিলেই রোগ মুক্ত হইতে অধিক বিলম্ব লাগে না। সভ্যতাপ্রসূত জীবনসংগ্রামের মাদকতার মোহ দূরে থাকিলেই কাটিয়া যায়।

কিন্তু নির্জ্জন দুর্গম বনপ্রদেশেও কি জীবন সংগ্রাম নাই? আছে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। স্বধর্ম্মী স্বজাতির সঙ্গবর্জ্জিত, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ভয়ে নিরন্তর সন্ত্রস্ত, চতুর্দ্দিকে যোজনবিস্তৃত জনশূন্য কন্টকাকীর্ণ বনস্থলে, অসীম নির্জ্জনতায় ঔপনিবেশিকগণ আমরণকাল বাস করে, শ্যামল শষ্পমণ্ডিত প্রান্তরপ্রদেশে শৈশবকালে নিরুদ্বেগ উচ্ছ্বসিত আনন্দে খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু যৌবন এবং বার্দ্ধক্যে তাহাদের নিত্য সূর্য্যালোকিত জীবনে একখানি মেঘ একটি আশঙ্কা জাগিয়া থাকে, —কে জানে কখন বর্ব্বর জাতিরা আসিয়া আক্রমণ করে। তাই নিয়ত সতর্কতা, নিরন্তর উদ্যত অবস্থা, অশ্বশালে অশ্ব সর্ব্বদাই প্রস্তুত; মূহূর্ত্তের ইঙ্গিতে অশ্বক্ষুরতাড়নে শ্যামল প্রান্তর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, দুর্গ প্রাকার হইতে উদ্‌গীর্ণ কামানের ধূমে দিঙমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন হয়, বজ্রনাদে দিক্ দিগন্তর ধ্বনিত হইতে থাকে।

অবিরাম যুদ্ধ দ্বন্দ্ব করিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপন করিতে হয়। কেবল মাত্র আদিম বর্ব্বর জাতির সহিত যুদ্ধ নহে, তাহারা তো পৈতৃক সত্ত্বাপহারী শ্বেত দস্যুদিগের সহিত বিরোধ জাগাইয়া রাখিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। তদ্ভিন্ন স্বয়ং প্রকৃতির সহিত জীবনের প্রতিদিন সংগ্রাম করিতে হয়। কেননা যে মুহূর্ত্ত হইতে তাহারা ভূমি খণ্ড চষিতে আরম্ভ করে, বন্য গোমহিষাদি পালন করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার উদ্যোগ করে, আহার্য্য সংগ্রহার্থে আবশ্যকের অধিক পশু হত্যা করে তখনি প্রকৃতি রাজ্ঞী তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে অশেষ রূপে লাঞ্ছনা করিতে থাকেন। যদিও একটি দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া যে ঔপনিবেশিকের জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় তাহাকে আর উৎখাত করা সহজ নহে। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও আদিম আমেরিকাবাসী অকস্মাৎ অশ্বসজ্জার রৌপ্য ঘন্টিকাধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত করিয়া উদ্যত শাণিত বর্ষাফলক আস্ফালন করিতে করিতে সুতীব্র লাঞ্ছনাবাক্যে দরিদ্র ঔপনিবেশিককে সন্ত্রস্ত করিয়া বাৎসরিক রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। এখন তাহাদিগের সংখ্যা ও সাহস উভয়ই হ্রাস হইয়া যাইতেছে। আরো কতিপয় বৎসরান্তে তাহাদিগের অস্তিত্বের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই প্রকৃতি এখন সে উদ্যত যুদ্ধ-প্রমুখ আদিম মানবের সহায় হারাইয়াছেন। তবুও সংগ্রামের বিরাম নাই; পঞ্চভূত তাঁহার সেনার নায়ক; বিহঙ্গ, শ্বাপদ, পতঙ্গকুল তাঁহার সৈন্যবল— এই সকল একত্র করিয়া স্বয়ং সংহার বেশে নিত্য নূতন বাধা সৃজন করিয়া সভ্যতাসপত্নীর অনধিকার চর্চ্চাশীল শ্বেত সন্তানগণকে পদে পদে দলিত পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন।

দূর হইতে আরামে গৃহকোণে বসিয়া প্রকৃতির নিত্য সংগ্রাম বড়ই অসুখের বলিয়া বোধ হয়, ঔপনিবেশিকগণও সে ধারণা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু তবুও বলিতে হইবে এ ধারণা সত্য নহে, ভ্রান্ত। কথাটা শুনিতে অত্যন্ত অদ্ভুত তাই বলিয়া নিরর্থক নহে। জীবন পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকা যায় বিবিধ বিচিত্র ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমশঃ চরিত্র গঠিত হইয়া উঠে, তখন দেখিতে

পাওয়া যায়, শৈশবের অনেক বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, অনেক ভ্রান্তি কাটাইয়া উঠিয়াছি, কেবল শৈশবে যে ভাষা শিখিয়াছিলাম, ভাব প্রকাশের জন্য যে বাক্য ব্যবহার করিতাম, তাহা কিছুমাত্র ভিন্ন হয় নাই। শৈশবের সুখ এবং যৌবনের সুখ এক নহে,অথচ উভয়কে এক নামেই অভিহিত করা হয়। মাতৃমুখে, বিদ্যালয়ে, বুদ্ধগৃহরচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকি এবং তাহাই ব্যবহার করি। প্রকৃতি আমাদিগকে কারামুক্ত করিয়া নূতন শিক্ষা দান করেন, হৃদয়ে অভিনব ভাব ও ধারণা অঙ্কুরিত বিকশিত হইতে থাকে, পরিবর্ত্তন ঘটে সত্য ; কিন্তু সে বিষয়ে আমরা এক প্রকার অজ্ঞ থাকি, কোন প্রশ্ন কিম্বা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিয়া সুস্পষ্ট ধারণায় উত্তীর্ণ হই না। যখন আমরা কোন ব্যক্তির জীবন আরম্ভের বাধা বিপত্তি ঝড় ঝঞ্ঝার বিবরণ শুনি তখন সহৃদয় কারুণ্যের সহিত আহা উহু করিয়া উঠি, সে ব্যক্তিও নির্ব্বিচারে আমাদের সহানুভূতি গ্রহণ করে। বুদ্ধির দ্বারা সুস্পষ্ট বিচার করিতে সমর্থ হয় কিনা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তবুও সেও অন্তরে, অন্তরে অনুভব করিতে থাকে, সেই গুলিই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দের দিন, যেদিন প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় প্রতিপদে শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সগৌরবে অভীষ্ট লাভ করিয়াছিল। শৈশবে যেদিন শান্তিতে কাটে পর জীবনে তাহার কোন স্মৃতিই জাগরুক থাকে না ; কিন্তু যেদিন ফল পাড়িতে গিয়া গাছ হইতে পড়িয়া আঘাত পাইয়াছি, পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া কন্টকাঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, মধু লুণ্ঠন করিতে মক্ষিকার দংশনে নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, উত্তর কালে সেই দিনগুলির স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর বলিয়া বোধ হয়। সুস্থ সত্তাবান পুরুষের পক্ষে যুদ্ধই যথার্থ আনন্দ, হয় তাহা অন্তঃশত্রু পরাভব করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়কে পদানত করিয়া আত্মজয়ের নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ, অথবা পদে পদে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহিঃশত্রু বিনাশ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্য অনুভব করিবার দৃপ্ত সুখ। নিরবচ্ছিন্ন অগাধ শান্তি শারীরিক হউক অথবা মানসিকই হউক দিন দিন আমাদিগকে অবনত করিতে থাকে, চিত্ত বৃত্তির সহজ তীক্ষ্ণতা চলিয়া যায়, মজ্জা সকল শ্লথ-গ্রন্থি, অবসাদগ্রস্ত, ক্ষীণবল হইয়া পড়ে ; তাই ভাবিয়া দেখিতে গেলে ঔপনিবেশিকের এই নিত্য সংগ্রাম ব্রত দুঃখের অবস্থা নহে, বরং সুখেরই অবস্থা বলিতে হইবে।

যে দেশে প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন, সভ্যতার কোন বন্ধনেই আপনাকে ধরা দেয় নাই, কিম্বা যে দেশে মানব সন্তান তাহাকে কেবলমাত্র আংশিক ভাবে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে দেশে বাস করিয়া আরাম নাই ; কিন্তু সে জীবনে যে অপূর্ব্ব আনন্দের স্বাদ লাভ করা যায়, তাহা সভ্য জগতে একান্ত দুর্লভ। ধৈর্য্যশীলা, ক্লিষ্ট শ্লথগতি অপ্রসন্ন মুখচ্ছবি পরিচারিকা দ্বিরুক্তি না করিয়া অশেষ কর্ত্তব্য ভার বহন করে, নীরবে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর হৃদয়হীন প্রভুর অন্যায় আক্রোশের বিরুদ্ধে কোন অনুযোগের উত্থাপনা করে না, কেবল শরীর যখন আর নিতান্তই বহে না, তখন ভাঙ্গিয়া পড়ে। সভ্যজগতে প্রকৃতি এই হীন দাসীবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু সুদূর সমুদ্রপারে দুর্গম মরু প্রান্তরে একি পরিবর্ত্তন ? সেই আনত কুণ্ঠিত দৃষ্টি, ক্লিষ্ট তনু, ভীরু সঙ্কুচিতগতি, বিনীতা দাসীমূর্ত্তি কোথায় ? এ কোন্ আলোকলাবণ্যময়ী অনন্তলীলাময়ী বন্ধনহীনা

উর্ব্বশী ? সোহাগ বিদ্রূপ অভিমান সাধনার অন্ত নাই ! কখন মুক্ত উচ্ছসিত হাস্য উৎসের অমৃত সিঞ্চনে মরু প্রান্তর নন্দন কাননের শুভ্র উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করে, কখনও বা অবারিত অশ্রু-নির্ঝরে অভিষিক্ত হইয়া শ্রাবণ দ্বিপ্রহরে আর্দ্র বসুধার ন্যায় ম্লান হইয়া আসে, কখনও গর্ব্বিতা সাম্রাজ্ঞী, কখনও শুশ্রূষাপরায়ণা পদানতা সেবা দাসী ! কাল যাহা বহু যত্নে বহুল আয়োজনে সম্পূর্ণ করিয়াছে, আজ তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে ছিন্ন ভিন্ন নষ্ট করিতেছে ! আজ একান্ত ব্যয়কুণ্ঠা, অপরিসীম দানভীরুতা, কাল আবার মুক্ত হস্তের অজস্র বিতরণ, প্রচুর বদান্যতা !

এই সকল দ্রুত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, এই অনুরাগ বিরাগ, যখন উদ্‌ভ্রান্ত ভগ্নমনোরথ করিয়া দেয়, বহু দিনের চেষ্টা এবং যত্ন নিতান্ত ব্যর্থ করিতে থাকে, তখনি হৃদয়ে এক অভিনব মোহ সঞ্চার করিয়া অনিবার্য্য আকর্ষণে ব্যাকুল করিয়া তুলে। এই নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনাকে পরাভূত করিয়া আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত সমগ্র অন্তরাত্মা চঞ্চল হয়, তাহার নিত্য নূতন লীলামাধুর্য্যে স্নিগ্ধ সুখে সুমধুর কৌতুকরসে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাই বলিয়া নিশ্চিন্ত নিরাকুলচিত্তে বাস করিবার প্রয়াস পাইও না, স্নিগ্ধ হাস্যমুখ সকরুণ তরুণ মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রলয়ঙ্করী সংহারকালীকে বিস্মৃত হইও না। নিতান্ত নির্ভয়ে যখন তাহার স্নেহ-লালিত বৃক্ষ শ্রেণী কুঠারাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ভূলুণ্ঠিত করিতেছ, বিস্তৃত সুকোমল তৃণশয্যাখানি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হল চালনা করিতেছ, যখন পেলব লতামূল সুকুমার পুষ্পরাজি উৎপাটিত করিয়া আবর্জ্জনাস্তূপ পূর্ণ করিতে থাক, তখনি একদিন অকস্মাৎ স্নিগ্ধ হাস্য কোথায় মিলাইয়া যায়, প্রলয়ের মেঘে নীলকান্ত নভস্তল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। সুন্দরী নারী অভিমান কালে আপনার সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া যেমন সকল অলঙ্কার খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দেন, সেও তেমনি নিদারুণ আক্রোশে উন্নত সুন্দর বৃক্ষ সকল উৎপাটিত করিয়া ফেলে, হুহুঙ্কার শব্দে ঝঞ্ঝাবাত্যা ছুটাইয়া ধূলিজালে সমগ্র আকাশ অন্ধকার করিয়া দেয়, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণের তীব্র তীক্ষ্ণ রশ্মিতে দশদিক প্রপীড়িত করে, নিরন্তর বজ্রনাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পান্বিত হইতে থাকে। যখন মনে হয় প্রলয়ের আর বিলম্ব নাই, দারুণ সন্ত্রাসে আর্ত্তকণ্ঠে করযোড়ে দীন ঔপনিবেশিক ভূমিশায়ী হইয়া পড়ে, তখন সহসা প্রলয়ের মেঘ কাটিয়া গিয়া দিগন্তপ্রসার নভোমণ্ডল স্নিগ্ধ নীলরাগে সুকুমার সূর্য্যালোকে অনুরঞ্জিত হয়, অভয়ার মঙ্গল মুখশ্রী প্রকাশ পায়। এ প্রলয় মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায় না, তাই বিস্মৃত হইতেও অধিক দিন লাগে না। ইহা যে প্রলয় নহে প্রলয়ের অভিনয়, উদ্দেশ্য হীন তাড়না মাত্র, ঔপনিবেশিক সে কথা ক্রমশঃ বুঝিতে পারে, আবার বৃক্ষ শ্রেণী নষ্ট করিয়া লতা গুল্ম তৃণ কুসুম উৎপাটন করিয়া আপনার কার্য্যে লিপ্ত হয়। অধ্যবসায়শীল অভিজ্ঞ সভ্য নর স্থির জানে এই উদ্দাম প্রকৃতি অবশ্যই একদিন তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে। তবে সে অভীষ্ট লাভ এখনও সুদূরপরাহত, এখনও বহুকাল তাহাকেই কৌশলময়ীর চিরন্তন নিপুণ অধিকারের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে।

প্রকৃতি যখন দেখে ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার হইল না, তখন নূতন উপায় অবলম্বন করে, গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের জন্য বশ্যতা-স্বীকার করে, অনুগত ভৃত্যের

ন্যায় নিত্যকর্ম্ম সাধন করিতে থাকে। অবশেষে একদিন ডাকিয়া তাহার সাড়া পাওয়া যায় না, উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহীর মত সকল কর্ত্তব্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়, পীড়নের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঔপনিবেশিকের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। অসংখ্য মক্ষিকার অবিশ্রাম গুঞ্জনে বধির প্রায় করে, নিরন্তর তীক্ষ্ণ দংশনে সর্ব্বাঙ্গে বহ্নিজ্বালা ধরাইয়া দেয়, বন্য কুসুমের তীব্র মদগন্ধে মূর্চ্ছাহত, মধুরসের সহিত বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলে, দীর্ঘ দিবসের কর্ম্মশেষে শ্রান্ত শরীরে যখন সে শয্যা আশ্রয় করে, তখন শিয়র পার্শ্বে দুইটী পল্লবহীন, রক্ত চক্ষু, লোলজিহ্ব, বিস্ফারিতফণা উদ্‌গ্রীব সর্প মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সমস্ত রাত্রির সুনিদ্রার বিশ্রাম-সুখ হরণ করিয়া লয়। বহু যত্নে বীজ বপন করিয়া যখন সে উৎসুক চিত্তে অঙ্কুরোদ্‌গম প্রত্যাশা করে, তখন চারিদিকে ভূমিতল ফাটিয়া উঠে, লম্বমুখ অসংখ্য পীতবর্ণ পতঙ্গম বাহির হইয়া আসে, প্রত্যেক নবোদ্ভিন্ন হরিত অঙ্কুরটি নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। সে যখন গলদঘর্ম্মে বহু কষ্টে ভূমি চাষ করিতেছিল, তখন প্রকৃতি অদৃশ্যে থাকিয়া তাহারই পার্শ্বে আপন ধ্বংসবীজগুলি বপন করিতেছিলেন তাহা সে জানিত না। তবে সেও পরাভব মানিবার পাত্র নহে, উপদ্রব যতই অধিক হয়, তাহার উদ্যম ততই বাড়িয়া উঠে। দণ্ডাঘাতে রেখাচক্রাঙ্কিত মসৃণ জীবগুলির প্রাণনাশ করে, জলাশয় সকল শুষ্ক করিতে থাকে, বিস্তৃত বন্যভূমিতে অগ্নি প্রয়োগ করে, প্রকৃতির আদরের লক্ষ লক্ষ সন্তান ধ্বংস হইয়া যায়, তখন সে মহানন্দে প্রান্তরপথে মহিষ গবাদি চরাইয়া বেড়ায়, মরুপ্রদেশে আপক্ব শালিধান্যের কনক হিল্লোল বিস্তার করে, দাবদগ্ধ বনভূমি সুসজ্জিত উদ্যানে পরিণত হয়, চারিদিকে তরুণ তরুশ্রেণী বিচিত্রবর্ণ পরিপুষ্ট ফলভারে আনম্র হইয়া আসে, ঘণবেণীবদ্ধ কুসুমিত লতিকাপুঞ্জ স্নিগ্ধ প্রচ্ছায় আরামনিকুঞ্জ রচনা করে।

প্রতিদ্বন্দ্বীর এই সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া প্রকৃতি তীব্র ঈর্ষাবিষে মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া মরিতে থাকে, গোপনে একদিন সুনিস্তব্ধ নিশাশেষে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে জয়শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া যুদ্ধ-সহায় সন্তানগণকে আহ্বান করে। তাহাদিগেরও শুনিতে বিলম্ব হয় না। দেখিতে দেখিতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে ভূমিতল আচ্ছন্ন করিয়া আকাশ মণ্ডল অন্ধকার করিয়া অসংখ্য সৈন্যবল আসিয়া উপস্থিত হয়। তীক্ষ্ণদন্ত মূষিক সকল মহা উৎসাহে শস্য রাজি কর্ত্তন করিতে থাকে, লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল উড়িয়া পড়িয়া মহা আগ্রহে আহারে মনোনিবেশ করে, কোথাও আর এতটুকু হরিদ্বর্ণের চিহ্নমাত্র রাখে না। দেশবিদেশের বিহঙ্গকুল মহা কলরব করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়ে, টানিয়া টানিয়া বহুযত্নরচিত বেড়া ভাঙ্গিয়া লয়, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য শুষ্ক তৃণপত্রনির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্তির চারিদিকে পড়িয়া টানাটানি করিতে থাকে, তৃণ পত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পলায়ন করে, কুলায় রচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের মন্ত্রণে আস্ফালনে বিদ্রূপ চীৎকারে আনন্দ কোলাহলে স্তব্ধ প্রশান্ত আকাশ চকিত হইয়া উঠে। নির্দ্দয় চঞ্চু আঘাতে কোমল পাটল বৃক্ষত্বক ক্ষত বিক্ষত করিয়া উৎপাটন করে, শুষ্ক শ্বেত বৃক্ষকাণ্ড সকল শীর্ণ নরকঙ্কালের ন্যায় প্রকাশ হইয়া পড়ে, সূর্য্য কিরণ অসহ্য প্রখর হয়, শাদ্বলভূমির শ্যাম শষ্পদল শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া যায়, ধরণীতল

শতধা বিদীর্ণ হইয়া নগ্ন শ্রীহীন মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়। অসহ্য উত্তাপে ফল শস্য শুকাইয়া পড়ে, জলাশয় সকল শুকাইয়া উঠে, মহামারী উপস্থিত হয়, ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া একে অপরকে হত্যা করিয়া আহার করে, তখন কিছু কালের জন্য সন্ধি স্থাপিত হয়।

ঔপনিবেশিক ক্ষতিপূরণ চেষ্টায় দ্বিগুণ পরিশ্রমে কর্ত্তব্য পালন করে, প্রকৃতিও কিছু কাল একাকিনী দূরে বসিয়া নীরবে মৃত সন্তানগণের জন্য শোক করিতে থাকে। ক্রমে চক্ষুজল মুছিয়া একদিন নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠে, এতদিনে ঔপনিবেশিককে পীড়ন করিবার উপযুক্ত অস্ত্র-সংগ্রহ করিয়াছে। আপনার অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে এক নূতন বিষবল্লরী সৃজন করিয়া প্রতিক্ষেত্রে প্রতি গৃহে প্রাঙ্গণে রোপণ করিয়া চলিয়া যায়। অতি অল্প দিনে তাহা সমস্ত দেশ ছাইয়া পড়ে, প্রতি ক্ষেত্রের উৎপাদনী শক্তি শোষণ করিয়া লয়, তাহার সুবৃহৎ পত্র পুষ্পভারে সমস্ত শস্য ভূলুণ্ঠিত হইয়া শুকাইয়া যায় ; প্রভাতে নষ্ট কর পুনরায় সন্ধ্যাকালে অঙ্কুরিত হয়, যেন অপরূপ কুহক মন্ত্রে বাড়িয়া উঠে, রক্তবীজের বংশের ন্যায় কিছুতেই ধ্বংস হইতে চাহে না। প্রতিদিনের যত্ন এবং চেষ্টা ব্যর্থ হয়, প্রতিদিন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ক্লিষ্ট শ্রমভারক্লান্ত ঔপনিবেশিক সিদ্ধিলাভে যখন একান্ত নিরাশ হইয়া পড়ে, তখন আবার প্রকৃতির কৌতুক হাস্য শ্রুত হয়, সগর্ব্বে শঙ্খনাদ করিয়া সন্তানগণকে যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার আদেশ ঘোষণা করে।

এই নিত্য বিরোধ, অসংখ্য তাড়না লাঞ্ছনার চিত্র কবিকল্পনা নহে, প্রকৃতির অবিকল প্রতিকৃতি, ইহা সত্য ইতিহাস। এমনি করিয়া সুদীর্ঘ সাধনায় নিরন্তর অবিরাম পরিশ্রমে অসংখ্য জীবন বলিদান করিয়া তবে এক একখানি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঔপনিবেশিকের জীবনে বিলাস নাই, অবসর নাই, হয়ত শান্তি নাই, কিন্তু তবুও তাহা সুখের। যাহার জীবনে আশার উত্তেজনা, কর্ম্মের উন্মাদনা, সাধনার আগ্রহ এবং সিদ্ধির দুর্লভ পরিতৃপ্তি বিরাজিত সে জীবন একান্ত বাঞ্ছনীয়। সিদ্ধিলাভ সকল অদৃষ্টে ঘটে না সত্য, তবুও সেই সুখী যে প্রতিদিন অক্ষুণ্ণ চিত্তে অদম্য উৎসাহে জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছে, সুখী সেই অপরাঙ্মুখ বীর, ক্ষুব্ধচিত্তে অবসাদপীড়িত শরীরে ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়া এই বিপুল বিশ্বরচনা ভ্রান্তি বলিয়া বিচার করিবার অবসর যাহার কখনো ঘটে নাই।

ভারতী, কার্ত্তিক ১৩০৬

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

(১)

প্রধানতম বৈজ্ঞানিক সভায় (Royal Institute) স্যার রবার্ট-বল বলিয়াছেন যে, আমাদের সূর্য্যমণ্ডল দিন দিন ছোট হইয়া আসিতেছে— প্রতিদিন ৯ ইঞ্চ করিয়া সঙ্কুচিত হয়।[৫] আর বিংশতি বৎসর পরে ইহার পরিধি প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমাণ কমিয়া যাইবে, কিন্তু, তাই বলিয়া ভয়ের কোন কারণ নাই। উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ইহার

পরিধি বর্ত্তমান অপেক্ষা আরো আড়াই ক্রোশ এবং খৃষ্টাব্দের আরম্ভ কালে আরো পঞ্চাশ ক্রোশ বৃহৎ ছিল। সূর্য্য মণ্ডলের ব্যাস রেখার দৈর্ঘ্য ৪৩০০০০ ক্রোশ, ৪০০০০ সহস্র বৎসর পরে সূর্য্য মণ্ডল আরো ১০০০ ক্রোশ কমিয়া যাইবে— কিন্তু এখনও সূর্য্যকে আমরা যত বড় দেখিতে পাই, তখনকার লোকও এত বড়ই দেখিতে পাইবে।

(২)

মিষ্টার টেস্‌লা কোলডোরাডো নামক স্থানের অতি উচ্চ প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ বৈদ্যুতিক তত্ত্বানুসন্ধানে রত ছিলেন, —সেই সময় তিনি কতকগুলি আশ্চর্য্য নূতন সত্য আবিস্কার করিয়াছেন।[৬] তিনি যখন এই সকল পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন দেখেন যে, তাঁহার কোন একটি যন্ত্র ক্রমান্বয়ে অতি মৃদুভাবে কম্পিত হইতেছে— প্রথমে ইহার কোনই কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই— ক্রমশঃ তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে, আকাশমণ্ডলে অন্যান্য গ্রহগণ হইতে যে বিবিধ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তাহারি প্রভাবে যন্ত্রটি কম্পিত হইয়াছিল।

তিনি বলেন, যন্ত্রটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া যদি বৃহৎ এবং নূতন আকারে নির্ম্মাণ করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ অন্যান্য গ্রহবাসীদিগের সহিত সংবাদের আদান প্রদান সম্ভব-পর হইবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কোলডোরাডো বাস কালে এমন একটি যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন,যাহাদ্বারা অতি দূরতর সমুদ্র ব্যবধানেও বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যায়। এতদিনে তাঁহার যন্ত্রটি এমনি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে যে, তিনি আশা করেন যে, তাহাদ্বারা মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীদিগের যদি টেলিস্কোপ টেলিগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্রের ন্যায় কোন যন্ত্র থাকে, তাহা হইলে তাঁহার যন্ত্রদ্বারা প্রেরিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সেখানে পর্য্যন্ত সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। তিনি বলেন,— আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহটি যদি জন্মকাল হইতে ক্রমবিকাশের নিয়মে এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা হইলে এই সৌর জগতের অন্য বিশ পঁচিশটি গ্রহের মধ্যে, এক বা ততোধিক গ্রহ আমাদের মত কিম্বা আমাদের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যেখানে উত্তাপ যেখানে আর্দ্রবাষ্প সেখানেই জীবনের উৎপত্তি হইয়া, ক্রমশঃ সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে— তাহা অবশ্যম্ভাবী। নিকোনা সাহেবের বিশ্বাস মঙ্গল গ্রহে বিবিধ প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অভাব নাই।

(৩)

মানব জাতি প্রথম কোথায় বাস করিতেন এই প্রশ্নের আজও কোনও মীমাংসা হইল না। নানা মুনির নানামত ; সম্প্রতি "উনবিংশ শতাব্দি" নামক বিলাতের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকায় এ বিষয়ে ওয়াডিংটন সাহেব আপন মত প্রচার করিয়াছেন।[৭] তিনি বলেন এক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানব জাতির প্রথম জন্ম হইয়াছে বলিয়া আমাদের যে ধারণা আছে, তাহা ঠিক নহে। তাঁহার মতে এক লক্ষ কেন দুই কোটি বৎসর পূর্ব্বে মানব জাতির প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ভূস্তরে কোন প্রকার নরঅস্থি পাওয়া যায় না বলিয়া, অনেকে এ মত গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে চার্লস পারেন সাহেব দেখাইয়াছেন, যে সকল ভূস্তরে

মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত বিবিধ অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সকল স্তরেও অনেক সময় নর-অস্থির চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় নাই— কিন্তু সেই কারণে সেকালে নর জাতির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। লক্ষকোটি বৎসর তো সুদূরের কথা, ১৮৫৩ সালে হলাণ্ড দেশে রাজকীয় আদেশে হার্লাম নামক সুবৃহৎ হ্রদের জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া, তাহাকে শুষ্ক ভূতলে পরিণত করা হয়। এই হ্রদে কতবার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল, কতবার পর্তুগিজ এবং ওলন্দাজ সৈন্য, জলযুদ্ধে জয় পরাজয় করিয়াছে, কত মৃত শরীর সেই হ্রদে সমাহিত হইয়াছে। তাহাতে ভগ্ন অর্ণবযান, অস্ত্র শস্ত্র এমন কি কয়েক খণ্ড সাময়িক মুদ্রা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু আদৌ কোন নর অস্থি পাওয়া যায় নাই। যদি এত অল্প কাল মধ্যেই নর অস্থির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন সম্ভব হয়, তবে কোটি বৎসরপূর্ব্বে, তুষার যুগে, তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পৃথিবীর কোন কোন জাতি উন্নতির পথে অধিক অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহাদের বাস ভূমি তথাকার জল বায়ু উত্তাপের কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে সকল জাতি নাতিশীতোষ্ণ দেশে বাস করে, তাহারাই সভ্যতায় শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর জাতি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে, যাহারা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করে, তাহারই সর্ব্বাংশে হীন। আজ কালও, এত কোটি বৎসর পরেও, বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি যখন উত্তাপাধিক্যে মনুষ্য বাসের এমন অযোগ্য, তখন চারকোটি বৎসর পূর্ব্বে, সৃষ্টির প্রথম যুগে এই সকল স্থানের উত্তাপ আরো কত অধিক ছিল তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নয়— আর সে সময় এই সকল দেশ মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আর আদিম মানবজাতি এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া বহু উত্তরে শীতপ্রধান দেশে বাস করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব-পর বোধ হয়। ওয়াডিংটন সাহেব বলেন, তাঁহার বিশ্বাস, সৃষ্টির আদি যুগে মানব জাতি উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু প্রদেশে বাস করিত। ইউরোপ আসিয়া আমেরিকা খণ্ডের যে সকল প্রদেশে আদিম মানবের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা তাঁহার এই নূতন মতের স্বপক্ষে বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য এসিয়ার সুবিশাল প্রান্তর মানব জাতির আদিম বাসস্থান বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। তাহার শেষ উত্তর সীমা উত্তর মেরুর অত্যন্ত নিকট। ইহা হইতে জানা যায় জীবের বসতি পৃথিবীর কেন্দ্রভূমিতে না হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মেরু প্রদেশেই হইয়াছিল।

অন্তঃপুর, চৈত্র ১৩০৭ (ক্রমশঃ)

মেঘের কথা (৪)

কত শত সহস্র বৎসর হইল আমাদের মাথার উপর এই অনন্ত নীলাকাশ বহিয়া অবিশ্রাম মেঘের স্রোত ভাসিয়া চলিয়াছে। কেমন তাহার বিচিত্র আকার, কত তাহার বিবিধ বর্ণ। কবিগণ এই মেঘের শোভায় মুগ্ধ হয়ে কত কবিতা রচনা করেছেন, চিত্রকর

কত বৈচিত্র্য সুনিপুণ বর্ণ সমাবেশে ইহার উদার গম্ভীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করেছেন। আর আমরা দশজন যাহারা কবিতাও লিখিনি, ছবিও আঁকিনি, আমরাও কতবার একাগ্র মনে এর গতিবিধি দেখে সময় কাটিয়ে দিয়েছি। কত দুঃখ অসন্তোষে এর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে সব কথা ভুলে গিয়েছি। কিন্তু তবুও আমরা মেঘের বিষয় অতি অল্পই জানি।

এত দিনে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৈজ্ঞানিক সভার যত্নে ও পরিশ্রমে মেঘের বিষয় জানিবার কথা কিছুই আর অজ্ঞাত নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকা এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান বায়ুবৈজ্ঞানিকগণ (Meteorologist) স্থির করিয়াছিলেন যে কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিত ভাবে মেঘের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এতদিনে তাঁহাদের কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগের সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও তত্ত্বানুসন্ধানের অভ্রান্ত ফল সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিতে প্রস্তুত আছেন। শুনা যায় তাঁহারা যাহা আবিস্কার করিয়াছেন তাহা দ্বারা ঝড় বৃষ্টি মেঘের কার্য্য কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের যে সকল ধারণা ছিল তাহা একেবারে বিপর্য্যয় হইয়া যাইবে। তাঁহারা দুইটি নূতন যন্ত্র আবিস্কার করিয়াছেন, একটির দ্বারা মেঘের ভাসিয়া যাইবার মুহূর্ত্তে তাহার ছবি উঠিয়া আসে এবং সেই সঙ্গে তাহার গতির বেগ নির্দ্ধারিত হয়; এবং অন্য যন্ত্রটির দ্বারা এই সকল মেঘ পৃথিবী হইতে কত উর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছে তাহা অতি পরিস্কার রূপে জানা যায়। এক আমেরিকাতেই ১৫টি বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে এবং সেখানকার প্রধান বায়ু-বৈজ্ঞানিক বিগ্‌লো (Bigelow) সাহেব তাঁহাদের অনুসন্ধানের একখানি বিবরণী প্রকাশ করিতেছেন— এই বিবরণী ৮০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।[৮] মেঘ সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কৌতূহলজনক তত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমাদের ধারণা আছে যে উত্তাপের প্রভাবে এবং উচ্চপ্রদেশে মেঘ অতি দ্রুতগতিতে ভাসিয়া চলে, তাহা ভুল, বরং শৈত্যের গুণে নিম্নতর স্থানেই মেঘ অতি সহজে দ্রুতগতিতে ভাসিয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝে যে অতি-শুভ্র সুকুমার তুষারাকৃতি মেঘ বৃত্তাকারে নীলাকাশে পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাই সেই মেঘ আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিতি করে। এই মেঘ শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ পরিমাণ করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহা পৃথিবী হইতে পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধে স্থিত। ইহার নাম সিরাস্। সর্ব্বশুদ্ধ প্রধান দশটি ভিন্ন জাতীয় মেঘ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম মেঘের নাম স্টাটাস। ইহা আকাশে তির্য্যগ্‌ভাবে ভাসিয়া থাকে, দেখিতে কুয়াশার মত, কুয়াশারি মত অত্যন্ত বর্ষার দিনে আকাশ ছাইয়া থাকে, কেবল মাত্র প্রভেদ এই যে, ইহা কুয়াশা অপেক্ষা অনেক উচ্চে থাকে, ইহার গভীরতা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ। পৃথিবী হইতে ইহাব ব্যবধান দুই তিন শত ফিটের অধিক নহে।

কামানের শব্দ (৫)

কতদূর হইতে কামানের শব্দ সুস্পষ্ট শোনা যায় এবারে তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের স্বর্গীয়া মহারাণীর সমাধি দিবসে বিলাতে স্পিটহেড (Spit-

head) নামক স্থানে তাঁহার সম্মানে কামান আওয়াজ করা হয়। স্পিটহেড হইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অক্সফোর্ডের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই শব্দ দৃঢ় বদ্ধ গৃহের মধ্যেও শোনা গিয়াছিল, সেই স্থানের মুক্ত প্রান্তরে এই শব্দ অতি পরিস্কার শোনা গিয়াছিল। এই শব্দ ত্রিশ ক্রোশ দূরে বীচিহেডে (Beachyhead), একত্রিশ ক্রোশ দূরে রিচমণ্ড শৈলে (Richmond Hill), তেত্রিশ ক্রোশ দূরে টানব্রিজ ওয়েল্‌সে (Tunbridge Wells) এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, লিট বাজার্ড (Leight Buzzard) নামক স্থানে ৪২ ক্রোশ দূরে শুনা গিয়াছিল। রিচমণ্ড শৈলে এই শব্দের প্রকোপে গৃহের দ্বার এবং বাতায়ণ শ্রেণী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

অন্তঃপুর, বৈশাখ ১৩০৮

চা-গ্রন্থ৯

ভূমিকা

জাপানী লেখক ৺কাকুজো ওকাকুরার পুস্তক গুলির সহিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের পরিচয় আছে কিনা জানি না। তিনি স্বীয় মাতৃভাষায় কি রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা জ্ঞাত নহি : তবে তাঁহার প্রথম ইংরাজী পুস্তক "Ideals of the East"-এর ভূমিকায় আর্য্যা নিবেদিতা তাঁহাকে পাঠক সমাজে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন।[১০] এই প্রাচ্য লেখকের ইংরাজী রচনা-ভঙ্গী বড়ই সুন্দর। চায়ের অনুষ্ঠান তাঁহাদের মধ্যে শুধু একটি দৈনিক জাতীয় অনুষ্ঠান নহে, ইহার সহিত তাঁহাদের সমাজ ধর্ম্ম শিল্প সকলেরি সংযোগ আছে। এই সম্বন্ধে তিনি একখানি বড় মনোরম ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাই আমরা 'মানসী'র জন্য অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহাতে মূলের রচনা-কৌশল রক্ষিত হইল কিনা সন্দেহ, তবুও ইহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সুধীসমাজ যদি মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র আভাষ লাভ করেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

১
বিশ্বমৈত্রীর পেয়ালা
(চা-গ্রন্থ)

চা অনুপানে জন্মগ্রহণ করিয়া পানীয়ে পরিণত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে চীনে সুভদ্র আমোদ স্বরূপে কাব্য-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাপান তাহাকে চারু রুচিধর্ম্ম, চা-ধর্ম্মের মহিমায় উন্নীত করিয়াছে। দৈনিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে বাস করিয়াও সৌন্দর্য্য উপাসনাই চা-ধর্ম্মের সাধনা। ইহার মন্ত্রবলে মানবমনে পবিত্রতা এবং সাম্য প্রবেশ লাভ করে, একের প্রতি অপরের সমবেদনার, দয়া ধর্ম্মের রহস্য ব্যক্ত হয়, সমাজ-নিয়ম কাব্যের ন্যায় সুমধুর হইয়া উঠে। ইহা বিশেষ করিয়া অপূর্ণের পূজা, কেন না জীবন স্বরূপ অসম্ভব ব্যাপারে কোন কিছু সম্ভব করিবার জন্যই এই সুকুমার প্রয়াস।

সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য উপাসনা বলিলে যাহা বোঝায়, চায়ের দর্শন কিন্তু শুধু তাই নয়। কেন না ইহা ধর্ম্ম এবং নীতিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের (অর্থাৎ জাপানীদিগের) মানবপ্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ করে। ইহা স্বাস্থ্য-নীতি, কেন না শুচিতা ইহার অনতিক্রমণীয় বিধান ; ইহা অর্থশাস্ত্র, মিতব্যয়িতা ইহার বিশেষত্ব : জটিল ও মহার্ঘের প্রত্যাহার, এবং সরলতার মধ্যে আরাম সঞ্চয় করাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। ইহা নৈতিক জ্যামিতি বলিলেও চলে, কেন না ইহারি মধ্য দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্যক্তিগত পরিমাপ বুঝিতে পারি। ইহা প্রাচ্য গণতন্ত্রের যথার্থ পরিকল্পনা, কেন না এই উপায়ে, চা-ধর্ম্ম-দীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুরুচির আভিজাত্য প্রদান করা হয়।

পৃথিবীর আর সকল দেশ হইতে বহু বৎসর ধরিয়া জাপানের এককাবস্থান ধ্যান ধারণার সহায় হইয়া, চা-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। আমাদের গৃহ এবং অভ্যাস, আমাদের বেশবিন্যাস এবং রন্ধন-বিলাস, আমাদের শঙ্খের মত শুভ্র, ঝিনুকের মত সুকুমার, চন্দ্রালোকের মত নিরাময় দীপ্তি চীনামাটির তৈজস পত্র, কাষ্ঠে লাক্ষার বিচিত্র কারুকার্য্য, চারুচিত্র-লিখন এমন কি আমাদের সাহিত্যে পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব গ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে। জাপানী সভ্যতা বুঝিতে হইলে কিছুতেই ইহাকে উপেক্ষা করা চলিবে না, কেন না ইহা যেমন ধনাঢ্যের সুসজ্জিত অট্টালিকায়, তেমনি দরিদ্রের নিরলঙ্কার কুটীরেও স্থান লাভ করিয়াছে। আমাদের কৃষকগণ ফুল সাজাইতে শিখিয়াছে, আমাদের দীনতম শ্রমজীবিগণ ইহারি প্রসাদে পর্ব্বতের মহিমা এবং নদীধারায় সৌন্দর্য্যের সম্মুখে ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণতি জানাইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে যে লোক মানব-জীবনের দুঃখ সুখের লীলায় একেবারেই চঞ্চল হয় না, যে বড় বিজ্ঞ তাহার কথা বলিতে, আমরা বলি, বেচারীর মধ্যে এতটুকুও, চা নাই। আবার যে পাগল সৌন্দর্য্য-প্রেমিক পার্থিব নাটকের বিয়োগান্ত পরিণাম ভুলিয়া, যৌবন-বসন্তে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ফেরে, তাহার মধ্যে চায়ের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক বলিয়াই সন্দেহ করিয়া থাকি। বাহিরের লোক যথার্থই মনে করিতে পারে, এ আমাদের একটু বেশী বাড়াবাড়ি, ধান ভানিতে শিবের গীত। ছোট্ট চায়ের পেয়ালায় মাগো, এ কি ঝড়, সে ত বলিবেই। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি, অসহায় মানবের আনন্দ উপভোগের পেয়ালাটি কত ছোট, কত অল্প সময়ের মধ্যে অশ্রুতে ভরিয়া ওঠে, অনন্ত পিপাসায় কাতর আমরা কত সত্বর তাহার সমস্ত মধুরতাটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলি, তখন, যদি চায়ের পেয়ালাটিকে একটু অধিক আদর করি তবে এমনি কি দোষ হয় ? মানুষ তো এর চেয়ে আরো অনেক বেশী অন্যায় করিয়াছে। বারুণী-সেবায় আমরা কতই না বলিদান করিয়াছি, রণনিপুণ দেবসেনাপতিকেও মদমত্ত হলধরে পরিণত করিতে ত্রুটি করি নাই। তবে ক্যামেলিয়ার রাণীর উদ্দেশে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতে বাধা কি ? সেই সুন্দর পুষ্পবেদিকা হইতে সহানুভূতির সুখোষ্ণ আনন্দধারা নিরন্তর প্রবাহিত, তাহাতে একেবারে মস্‌গুল হইয়া যাই না কেন ? দ্বিরদ-রদ-চিক্কণ পানপাত্রে উজ্জ্বল কাঞ্চনধারায় দীক্ষিত সৌভাগ্যবান, কন্‌ফুসিয়োর মৌনমাধুর্য্য, লৌৎসের কশায় স্বাদ এবং শাক্যমুনির স্বর্গীয় সৌরভের স্পর্শ লাভ করিতে পারেন।

যাহারা আপনার মধ্যে বৃহত্ত্বের তুচ্ছতা অনুভব করে না, তাহারা প্রায়ই অপরের মধ্যে ক্ষুদ্রতমের মহত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। পান ভোজনে দিব্য পরিতৃপ্ত, পরিপুষ্ট সাধারণ পাশ্চাত্য জীব, এই চা-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীবাসী আমাদিগের অনেক অদ্ভুত খেয়াল, ছেলেমানুষি এবং বৈচিত্র্যপ্রিয়তার পরিচয় পাইবে সন্দেহ নাই। জাপান যতদিন শান্তিপ্রিয় ছিল, চারুশিল্পের চর্চ্চা করিত, ততদিন তাহারা আমাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া জানিত ; মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য জীবনের সর্ব্বনাশ করিয়া যে দিন রক্তনদী বহাইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমরা সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইতেছি। সামুরাইগণের রণসংহিতার অনেক ভাষ্যই আজকাল প্রতীচ্যে প্রচারিত হইয়াছে : আমাদের সে মৃত্যু অনুশাসন কাব্যের মতই মনোহর, তাহার মহিমায় মুগ্ধ প্রত্যেক সৈনিক আত্মত্যাগের উৎসাহে প্রাণ বিসর্জ্জন করা মহানন্দ স্বরূপ জ্ঞান করে। কিন্তু জীবন-কাব্যস্বরূপ চা-ধর্ম্মের প্রতি কোনও মনোযোগই দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধজয়ের ঘোর রক্তাক্ত গৌরবই যদি আমাদিগকে সভ্য মনে করিবার একমাত্র দাবী হয়, তবে আমরা চিরদিনই যেন অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হই। যতদিন আমাদের আদর্শ, আমাদের কাব্য-সৌন্দর্য্য এবং চারুশিল্প সমুচিত সম্মান লাভ না করে, তত দিন অসভ্য আমরা প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।

কবে প্রতীচ্য প্রাচ্যকে বুঝিবে— কিম্বা বুঝিবার চেষ্টা করিবে? আসিয়াবাসী আমাদিগের সম্বন্ধে যে অদ্ভুত সত্য এবং কল্পনার জাল রচিত হয়, তাহা দেখিয়া আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাই। হয় আমরা পদ্মসুগন্ধ সম্ভোগে অথবা ছুছুন্দরী এবং তৈলপায়িকা ভোজনে জীবনধারণ করিয়া থাকি, এমনি জনশ্রুতি শুনিতে পাই। হয় আমরা অদৃষ্টবাদের প্রভাবে অক্ষম জর্জ্জরীভূত, নয় ত নীচ ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় তন্ময়। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মভাব অজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষিত, প্রাচীন চীনের চিরন্তন সংযম এবং গাম্ভীর্য্য বুদ্ধিহীনতা এবং জাপানী স্বদেশপ্রীতি অদৃষ্টবাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমরা যে শান্ত ভাবে অস্ত্রাঘাত, বেদনা, দৈন্য, প্রিয়জনবিচ্ছেদ সহ্য করিয়া থাকি, জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যেও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা কেবল আমাদের শক্তির স্বল্পতা, স্নায়ুজালের হীনতার প্রভাবে হইয়া থাকে ; তাহার সম্যক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে, শুনিলাম।

আমাদের লইয়া একটু আমোদ, তা কর না কেন? তাহাতে আপত্তি নাই, আমাদেরও আমোদ করিবার স্বাধীনতা আছে! যদি জানিতে পারিতে তোমাদের সম্বন্ধেও আমরা কত কথা, কেমন বানাইয়া বর্ণনা করি, তবে হাসির কারণের অভাব হইত না। সে পরিকল্পনায় গোধূলি-ছায়াচ্ছন্ন রহস্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান, বিস্ময়ের সহজ ভক্তি, অনিশ্চয়ের ক্ষুব্ধ নিস্তব্ধতারও অভাব নাই। এমনি পরিপাটী সূক্ষ্ম মার্জ্জিত অতীন্দ্রিয় গুণ সমূহে তোমাদের অলঙ্কৃত করা হইয়াছে যে ঈর্ষা করিবারও অবসর নাই, এমনি সুন্দর ললিত চারু চমৎকার বসনে অভ্যস্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নিন্দা করা অসম্ভব। আমাদের অতীত কালের লেখকগণ সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ বলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের পরিচ্ছদ অন্তরালে বেশ সুন্দর এক একটি পরিপুষ্ট রোমশ লাঙ্গুল আছে— আর তোমরা প্রায়শঃই নবজাত শিশুর দেহের কাবাব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া

থাক। শুধু তাই নয়, ইহার অধিক নিন্দাবাদও শোনা গিয়াছে। তোমাদের আমরা নিতান্ত বিষয়বুদ্ধি বলিয়াই জানিতাম ; কেন না শুনিয়াছি, তোমরা যাহা প্রচার কর, তাহার অনুযায়ী কার্য্য কখনই কর না।

কিন্তু এসব ভুল ভ্রান্তি ক্রমশঃই অন্তর্ধান হইতেছে। বাণিজ্য প্রভাবে অনেক প্রাচ্য বন্দরেই ইউরোপীয় ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। আসিয়াবাসী যুবকগণ, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা আয়ত্ত করিবার জন্য দলে দলে প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করিতেছে। আমাদের অন্তর্দ্দৃষ্টি তোমাদের সভ্যতার মর্ম্মভেদ করিতে পারে না সত্য, তবুও আমরা শিখিতে অনিচ্ছুক নহি। আমার স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের ধরণ ধারণ, ভাব ভঙ্গী অত্যধিক পরিমাণে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে ; বিশ্বাস কঠিন কলার (Collar) এবং সমুচ্চ হ্যাট (Hat) হস্তগত হইলেই, তোমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম পদবীতে উন্নীত হইব। এ ভ্রান্তি যতই শোচনীয় এবং দুঃখজনক হউক না কেন, ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রতীচ্যের দরবারে আমরা বিনয়াবনত-জানু হইয়া অগ্রসর হইতে সম্মত। আক্ষেপের বিষয় প্রাচ্যপরিচয় গ্রহণ ব্যাপারে প্রতীচ্যের ভাবটি এমন প্রীতিমধুর নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারকগণ শিক্ষাদান করিতেই আইসেন, আদৌ গ্রহণ করিতে নহে। আমাদের বিশাল সাহিত্য-বারিধির পরিচয় হয় অনুবাদের গণ্ডূষে, নয়ত পর্য্যটকের আজগুবি গল্প হইতেই তোমরা গ্রহণ করিয়া থাক। স্বর্গগত লাফকাডিও হার্ণ কিম্বা আর্য্যা নিবেদিতার মত এমন মহানুভব ব্যথার ব্যথী লেখক লেখিকা আর পাওয়া যাইবে ? তাঁহারা যে আমাদের ধর্ম্মবল, এবং প্রীতি-অনুভূতির দীপ্তি বিস্তার করিয়া, ঘনীভূত প্রাচ্য অন্ধকারে জাগরণের জীবন সঞ্চার করিয়াছেন।

এমন অসংযতবাক হইয়া হায় আমি চা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রকাশ করিলাম সন্দেহ নাই। কেন না চা-ধর্ম্মের মর্ম্ম-শক্তি আমাদিগকে সেই কথা বলিতেই বাধ্য করে, অপরে যাহা আমাদের নিকট শুনিবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়া আছে ; তাহার অধিক আর একটি কথাও বলিবার অধিকার থাকে না। আমি কিন্তু তাই সে অনুশাসন মানিব না। ইউরোপ এবং আসিয়া উভয়তঃ আপনাদিগকে ভুল বুঝিবার নিমিত্ত এক শত অনাসৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে ; এত অনর্থ সংঘটন হইয়াছে যে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি যদি দুচারিটি কথা বেশী করিয়াই বলিতে চাই, তবে তাহার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতে আমি কোন ক্রমেই বাধ্য হইব না। রুশিয়া যদি জাপানকে বুঝিবার জন্য তিলমাত্র অনুগ্রহ-চেষ্টা করিত, তবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ববাসীকে এমন লোমহর্ষণ, রক্তপ্লাবন সমরাভিনয় দেখিতে হইত না ! প্রাচ্য সমস্যা সকল উপেক্ষা করিবার পরিণাম কি ভয়ানক, তাহার ফলে বিশ্বপরিবারের নিমিত্ত কেমন অনর্থের বীজ নিহিত থাকে, তাহা সহজে অনুমেয় নহে। ইউরোপীয় ইম্পিরিয়ালিজম হাস্য-জনক "পাণ্ডু" বিপদের আশঙ্কার হুঙ্কারে দিক্‌বিদিক মুখরিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, আসিয়ার পক্ষে অকস্মাৎ দুরারোগ্য ধবল-বিভীষিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তোমরা হয়ত আমাদের মধ্যে চায়ের মাত্রা কিঞ্চিদধিক দেখিয়া বেশ একটু হাসিতে পার ; কিন্তু আমরাও কি তোমাদের শুষ্ক কাষ্ঠ তিষ্ঠত্যগ্রে ভাবিয়া একেবারেই অগ্নিশর্ম্মা হইতে পারি না ?

আইস, আমরা উভয় মহাদেশকে পরস্পরের প্রতি তূর্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করি; উভয়তঃই আপনাদিগকে কেবলমাত্র অর্দ্ধ গোলকের অধিকারী জানিয়া, জ্ঞানী যদি নাই হইতে পারি, তবু বিষাদ সৌম্য বৈরাগ্য অর্জ্জনের চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? আমরা ভিন্ন উপায়ে, স্বতন্ত্র চেষ্টায় জাতীয় পরিণতি লাভ করিয়াছি: তাই বলিয়া একে অপরের সহায় হইবার পথে কোনও ব্যাঘাত দেখিতে পাই না। তোমরা শান্তি-বিযুক্ত, চাঞ্চল্য-পরিণাম ঐশ্বর্য্য-বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছ, আর আমরা যে তাললয় রাগ সংযুক্ত সঙ্গীতের মত নির্ব্বিরোধ অনাহত শান্তির সৃজন করিয়াছি, তাহা নিতান্ত সুকুমার বলিয়াই একান্ত আত্মরক্ষা-অসমর্থ। তবুও বলিলে প্রত্যয় যাইবে কি, অনেক বিষয়েই প্রাচী প্রতীচি অপেক্ষা আছে ভাল।

আশ্চর্য্যের কথা, আজ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত বিশ্ব পরিবারই ক্ষুদ্র চায়ের পেয়ালাটির মধ্যে আত্মীয়তার আনন্দস্বাদ পাইয়াছে। আসিয়ার এই একমাত্র অনুষ্ঠানই সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইউরোপীয় গৌরাঙ্গগণ আমাদের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই; কিন্তু এই পাটল পানীয়টির সন্ধান পাইবামাত্র সাদরে স্বাগত জানাইয়াছে। বৈকালীন চা প্রতীচ্য ভদ্র সমাজের বিশেষ একটি অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান। চায়ের চামচ পীরিচের মৃদুনিক্বণে সুকুমারী গৃহস্বামিনীর ক্ষৌম পরিচ্ছদের চিক্কণ শব্দে ক্ষীর শর্করা সম্বন্ধে মধুরপ্রশ্নের নিরতিশয় মাধুর্য্যে চায়ের পূজা যে স্থির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। নকলের নাকাল নিশ্চিত জানিয়াও নিমন্ত্রিত অতিথি যে প্রকার সাধু ঔদাস্যের সহিত প্রস্তুত পানীয়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, সেই নম্র বৈরাগ্যই প্রাচ্য প্রভাবের অগ্রগণ্য পরিচয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যে চা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ ৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পরে একজন আরবীয় পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, চীন রাজধানী ক্যান্টনে রাজস্বের প্রধান আমদানী চা এবং লবণের শুল্ক হইতেই হয়। মার্কো পাওলো লিখিয়াছেন— ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান কোনও চীন রাজস্বসচিব স্বেচ্ছায় চায়ের শুল্ক বৃদ্ধি করা অপরাধে, পদচ্যুত হইয়াছিলেন। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারকালে ইউরোপীয়গণ দূরান্ত পূর্ব্বের সংবাদ জানিতে আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজগণ সংবাদ আনিলেন যে, প্রাচ্য দেশে কোনও গুল্মবিশেষের পাতা হইতে বড় চমৎকার পানীয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরিব্রাজক Giovanni ১৫৫৯, আলমিড ১৫৭৬, মাগিনো ১৫৮৮, এবং তারিরা ১৬১০ খৃঃ অব্দে চায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত বৎসরে ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম চায়ের আমদানী করে। ফ্রান্সে ১৬৩৬ খৃঃ অব্দে চায়ের পরিচয় হয়, ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে রুশদেশে তাহার আবির্ভাব দেখা যায়। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বলে "সর্ব্ব ভিষক অনুমোদিত চমৎকার পানীয়, চীনবাসীগণ তাহাকে, চা, নামে অভিহিত করিয়াছেন, ভিন্ন দেশবাসীগণ তাহাকে টে, কিম্বা 'টী' বলিয়া থাকে।"

পৃথিবীর সব ভাল কিছুর মতই চায়ের প্রচারপথে অনেক বাধা ঘটিয়াছিল। নিসন্দিগ্ধ নিন্দুকের ন্যায় হেনরী স্যাভিল ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে চায়ের অনুষ্ঠান অতি অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার

বলিয়া উল্লেখ করেন। জোনাস হ্যানওয়ে বলেন চা পান করিলে পুরুষের শরীরের আয়তন ও শৌষ্ঠব হ্রাস হইয়া যায়, রমণীর রমণীয় লাবণ্য আর থাকে না। সেকালে আধসের চায়ের দাম আট দশ টাকার অধিক ছিল ; কাজেই জনসাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য হইত না। রাজকীয় কিম্বা সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের উৎসব অনুষ্ঠানে চায়ের ব্যবহার হইত ; দূরান্তর হইতে রাজদর্শনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ ইহা উপঢৌকন স্বরূপ আনয়ন করিতেন। দুর্ম্মূল্য হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্য্য এই যে, চায়ের ব্যবহার অত্যল্প কালের মধ্যেই সাধারণ্যে প্রসর লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে লণ্ডনের বাহিরের আড্ডাগুলি ক্রমে চায়ের দোকানে পরিণত হয়। সাহিত্য-রসরসিক Addison এবং Steele প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সেই সকল স্থানে প্রকাণ্ড পাত্রে চা লইয়া, দিবা রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত করিতেন। এই পানীয়টি বিলাস সামগ্রী হইতে ক্রমে জীবনের দৈনিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নয়, ইহার উপরে আবার লবণ আর অহিফেনের মত শুল্কও ধার্য্য হইয়া গেল। এই পানীয়টি অধুনাতন ইতিহাসগঠনে কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহা এই সংস্রবে স্মরণ না করিয়া থাকা যায় না। যতদিন পর্য্যন্ত চায়ের শুল্ক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মানব সহ্য-শক্তির সীমা অতিক্রম না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ঔপনিবেশিক আমেরিকা অত্যাচারের হস্তে আপনাকে একান্ত ভাবেই সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিল। বোষ্টন বন্দরে চায়ের সিন্দুকগুলি যেদিন সিন্ধুর গ্রাসে নিক্ষেপ করা হয়, সেই দিন হইতেই আমেরিকান স্বাধীনতার সূত্রপাত।

চায়ের স্বাদে এমন একটি চতুর মাধুর্য্য আছে যে, ইহার মোহে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না এবং কল্পনার সাহায্যে ইহাতে কল্পলোকের সৌন্দর্য্য আরোপ করিতেই হয়। রসিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার মৃদু সৌরভের সহিত আপন আপন চিন্তার পরিমল মিলাইতে বড় অধিক বিলম্ব করেন নাই। এই পানীয়ের সুগন্ধে সুরার মদগর্ব্ব, কফির আত্মম্ভরিতা এবং কোকোর আত্মবিশেষত্ব-বর্জ্জিত দুর্ব্বল নির্দ্দোষিতা নাই। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই Spectator পত্রিকায় দেখিতে পাই, "যে সকল সুনিয়মিত পরিবারে প্রতি প্রভাতের প্রহরেক কাল চায়ের সহিত রুটি মাখনের সদ্ব্যবহারে ব্যয়িত হয়, তাঁহাদের আমি একান্ত নির্ব্বন্ধানুসারে এই অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন এই সংবাদপত্রখানিকে সেই চা-অনুষ্ঠানের অভিন্ন অঙ্গ স্বরূপ জ্ঞান করেন।" Samuel Johnson আপন চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিতে লিখিয়াছেন ; "একজন নির্লজ্জ চা-খোর আজ বিশ বৎসর ধরিয়া এই সুন্দর মোহকর পানীয়ের সাহায্যে আহার্য্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি চায়ের সহায়তায় সায়াহ্ন রমণীয়, নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহর রাত্রি সান্ত্বনাময় এবং প্রভাতের প্রথম আলোককে স্বাগত জ্ঞাপন করিতেন।" চার্লস ল্যাম্ব যখন বলিয়াছিলেন স্বকৃত সৎকার্য্য সঙ্গোপনে রাখিয়া এবং অপরের সুকৃত সহসা প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহার আনন্দ লাভ হয়, তখনি তিনি চা-ধর্ম্মের বীজমন্ত্র আবিষ্কার করেন। কেন না লুক্কায়িত সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারই চা-ধর্ম্মের শিল্প ; সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির অপেক্ষা আভাষের প্রকাশই তাহার নীতি। স্বীয় স্বভাবের অক্ষমতা কিম্বা দুর্ব্বলতা দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারাই ইহার সাধনা, ইহার রহস্য, ইহার রসবোধ এবং ইহার ন্যায় ও দর্শন। যথার্থ রসজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চা-দার্শনিক বলা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ থ্যাকারে একজন, আর সেক্ষপীয়র অবশ্যই প্রথম এবং প্রধান। Decadence কালের কবিগণ (হায় পৃথিবীর অবস্থা Decadence ভিন্ন আর কবেই বা কি ছিল ?) পৃথিবীতে বিষয়-বিষ-বিস্তারের বিরুদ্ধে যখনি কোনও কিছু বলিয়াছেন, তখনি চা-ধর্ম্মের অগ্রসর হইবার পথ পরিস্কার করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি অসম্পূর্ণের অর্থাৎ জীবন-ব্যাপারের চিন্তা করিতে করিতে আমরা একটি ক্ষীণ আশা পোষণ করি যে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য হয়ত একই সান্ত্বনা স্থলে সম্মিলিত হইবে। 'তাও' ধর্ম্মীগণ বলেন, সেই অনাদি কালের বিশাল প্রারম্ভে আত্মা এবং পরমাণু বিষম সংগ্রাম-নিরত হইয়াছিল। অবশেষে পীত সম্রাট আকাশের সূর্য্যদেব অন্ধকার এবং পৃথিবীর দানবকে পরাভব করেন। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর এই অসুর মস্তকের আঘাতে চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত আকাশ-গম্বুজ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। নক্ষত্রেরা আপন আপন কুলায় আশ্রয় হারাইয়া ফেলিল, লক্ষ্যভ্রান্ত চন্দ্রমা অন্ধকারের দুর্গম গিরিদরীতে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল। নিরাশা-কাতর বিপদগ্রস্ত পীত সম্রাট আকাশ-সৌধের পুনঃ সংস্কারের জন্য দূর দূরান্তরে স্থপতি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুল অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল না। পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে স্বর্গীয় দেবী রাজ্ঞী নিউকা উত্থিত হইলেন। তাঁহার ললাটদেশে চন্দ্রকলার দীপ্তি, সর্ব্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল অগ্নিরাগ বর্ম্মে আচ্ছাদিত। তিনি তাঁহার দিব্য কটাহে পঞ্চ বর্ণের সংমিশ্রণে বাসব-ধনুর সৃষ্টি করিয়া ভগ্ন আকাশ আবার সুনির্ম্মিত করিলেন। কিন্তু হায়, দেবতার কার্য্যও ভ্রমবর্জ্জিত নহে ; ক্ষুদ্র দুইটি ছিদ্র সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন। সেই হইতে প্রেমের দ্বৈত-ভাবের সৃষ্টি হইল। দুইটি আত্মা অন্তহীনের দেশে কেবলি ভাসিয়া চলিয়াছে ; যত দিন উভয়ের একত্র সম্মিলনে বিশ্বের সম্পূর্ণতা সাধন না হয়, তত দিন, এ গতির আর নিবৃত্তি নাই। আমাদিগের প্রত্যেককেই তাই ত জন্মে জন্মে নূতন করিয়া আপন আপন আশা ও শান্তির আকাশ গড়িয়া তুলিতে হয়।

বর্ত্তমানে হায়, বিশ্বমানবের স্বর্গলোক ক্ষমতা এবং অর্থ এই দুই অসুর শক্তির সংঘর্ষে বারম্বার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাই আজ নিখিল বিশ্ব আত্মম্ভরিতা এবং রুচিহীনতার অন্ধকার ছায়ায় উদ্‌ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমান। বিকারগ্রস্ত বিবেকের বিনিময়ে আমরা জ্ঞানার্জ্জন করিতেছি। দয়াধর্ম্ম স্বার্থচেষ্টার নামান্তর মাত্র। প্রাচী এবং প্রতীচি ফেনোদ্বেল সমুদ্রে ভীষণ দুইটি গ্রহের ন্যায়, জীবনের স্পর্শমণির সন্ধানে উদ্দাম হইয়া ফিরিতেছে। এই মহাধ্বংসের সংস্কার করিবার জন্য আবার যে দেবসম্রাজ্ঞী নিউকার আবশ্যক ; আমরা বিশ্বপালক বিষ্ণুর অবতারের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। এস, ততক্ষণ আমরা একটু চা পান করিয়া লই ; আকাশে সূর্য্যাস্তের স্বর্ণরাগ বংশপত্রের চঞ্চল চামরের উপরে পড়িয়া আলোছায়ায় মায়ার খেলা সৃজন করিতেছে, উৎসরাজিতে আনন্দের গদ গদ ভাষা ক্ষরিত হইতেছে, পল্লববহুল দেবদারু-বীথিকার মর্ম্মর-গান চায়ের উষ্ণ জলের পাত্রের মধ্যে অব্যক্ত মধুর শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এসো ওগো বন্ধু এস, আমরা এই অবসরে নশ্বরতার আনন্দের স্বপন দেখিয়া লই, অবোধ সুন্দর ঘটনা সমাবেশের মধ্যে বিভোর হইয়া থাকি।

(ক্রমশঃ)

মানসী, ফাল্গুন ১৩২১

ফুলের কথা
(চা-গ্রন্থ)

ঊষার আকাশে বাষ্প সুকুমার আলোকের আভাস যখন চারিদিকে সঞ্চারিত হইতেছে, তখন বিহগকুলের অর্দ্ধোচ্চারিত রহস্যময় কাকলি শুনিয়া মনে হয় নাকি যে তাহারা আপন কুলায়-সঙ্গীদের নিকট ফুলের কথা আলোচনা করিতেছে? মানুষ যখন হইতে কাব্য-সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই ফুলের সমাদর আরম্ভ হইয়াছে। ফুলের নিয়ত আত্ম-বিস্মৃত মাধুর্য্য, বাক্যহীন বলিয়াই সৌরভে যাহার পরিচয়, ইহা ভিন্ন বিকাশোন্মুখ তরুণী ষোড়শীর হৃদয়ের তুলনা আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? আদিম মানব প্রথম যে দিন তাহার প্রেয়সীকে পুষ্প উপহার প্রদান করিল, সেই শুভ দিন হইতেই সে পশুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। দৈনন্দিন তুচ্ছ ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নার ঊর্দ্ধে আপনাকে স্থাপনা করিয়া, হৃদয়বান মানবের শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। যে দিন হইতে মানুষ অনাবশ্যকীয়ের মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিয়াছে, সেইদিন হইতেই শিল্প-কলার সৌন্দর্য্য রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

আনন্দে কিম্বা বিষাদে ফুলই আমাদের চিরসুহৃৎ। আমাদের নিমন্ত্রণ-সভা, পানগোষ্ঠী, নৃত্যগীতের মজলিস, আমাদের প্রণয়-লীলার উৎসব কোন স্থানেই তাহাদিগকে ভিন্ন চলে না— তাহাদের দিব্য স্পর্শ ব্যতীত মরিতেও আমরা সাহসী হই না। স্নিগ্ধ সুরভি লিলি ফুলের সহায়তায় পূজা করিয়াছি, কমলের সাহায্যে ধ্যানতৎপর হইয়াছি— গোলাপ এবং চন্দ্রমল্লিকার (Chrysenthemum) গৌরব রক্ষার জন্য দুর্ব্বার সমরে অগ্রসর হইয়াছি। এমন কি আমরা ফুলের ভাষায় হৃদয়ের কথাও ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফুল ছাড়া হইয়া কেহ কি কখনো বাঁচিতে পারে— ফুলের সৌন্দর্য্যবিহীন রিক্ত পৃথিবী যে আমাদের মনে শ্মশানের বিভীষিকা সঞ্চার করে। পীড়িতের শয্যা-পার্শ্বে সুকোমল সুরভি-পুষ্প কত না সান্ত্বনা বহন করিয়া আনে, সংসারজ্বালাদগ্ধ শ্রান্ত অন্ধকার হৃদয়ে, কেমন আনন্দের আলোক জাগ্রত করিয়া তোলে, তাহাদের প্রশান্ত করুণা, সুন্দর শিশুর অপলক দৃষ্টির ন্যায় বিশ্ব ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মনের ক্ষীয়মান বিশ্বাসকে আবার উদ্বুদ্ধ করে। হারাণ আশাকে ফিরাইয়া আনে। আমরা যখন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া যাই, অশ্রু-শিশির-সিক্ত নত নেত্রে তাহারাই আমাদের সমাধির পার্শ্বে বিলাপ করিতে থাকে। বলিতে লজ্জা হয়, তবুও না বলিয়া উপায় নাই, এমন অতুলন সুন্দর নিত্য অনবদ্য ফুলের নিয়ত সঙ্গ লাভ করিয়াও, আমরা পশু স্বভাবের অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি নাই। বাহিরের মৃগচর্ম্মে স্পর্শ করিতে না করিতে অন্তরের হিংস্র শার্দ্দূল হুঙ্কার করিয়া ওঠে। প্রবাদ আছে মানব শিশু দশম বর্ষে জন্তু, বিংশে বাতুল, ত্রিংশে উদ্‌ভ্রান্ত, চত্বারিংশতে প্রতারণার আকর এবং পঞ্চাশতে দোষী আসামী। আজীবন পশুত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয়, পঞ্চাশতে দোষী আসামী হইয়া দাঁড়ায়! আমরা ত ক্ষুধা ভিন্ন আর কোন কিছুকেই বাস্তব বলিয়া জানি না, নিজের উচ্ছৃঙ্খল বাসনা ভিন্ন আর কিছুই পুণ্য পবিত্র মনে করি না। আমাদেরই চক্ষের উপরে

কত মন্দিরের পর মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া গেল, চিরস্থায়ী হইয়া আছে কেবল আমাদের অহঙ্কারের বেদিকা, সেই দেবাদিদেবের সম্মুখে আমরা নিয়ত ধূপ দীপ পুষ্পোপহারে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকি। আমাদের বিগ্রহ ত বড় কম নহেন— ধন সম্পদ ইঁহারই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে— ইঁহার অবতার। ইঁহার নিকট বলি উপহার দিবার জন্য প্রকৃতিকে আমরা ধ্বংস করি। জড় পরমাণুকে জয় করিয়াছি বলিয়া, আমরা বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকি, কেন না তাহারাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া রাখিয়াছে ; হায় সভ্যতা এবং সুকুমার রুচির দোহাই দিয়া আমরা কতই না পাশব অত্যাচার করিয়া থাকি! আকাশের নক্ষত্রের অশ্রুবিন্দুর মত কোমল সুন্দর ফুলগুলি, আমাকে একবার বল দেখি, ধরণীর উদ্যানে দক্ষিণ সমীরণে গ্রীবা দোলাইয়া, যখন মধুপের মুখে স্নিগ্ধ শিশির ও আতপ্ত সূর্য্যকিরণের কথা শুনিতে থাক, তখন কি কখনও তোমাদের ভয়ানক পরিণামের কথা একবারও মনে কর ? না, না, ভাবিয়া কাজ নাই,— মৃদুমন্দ বসন্ত পবনের আন্দোলনে যতক্ষণ সম্ভব খেলা কর, সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাক। কঠোর নিষ্ঠুর দুইখানি হাত কাল হয়ত, তোমাদের নিশ্বাস রোধ করিয়া দিবে ; আশ্রয় বৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পেলব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া কোথায় লইয়া যাইবে। এ নির্ম্মম কাজ যে করিবে, সে হয় ত নিরুপমা সুন্দরী, দেখিতে তোমাদেরই মত সুকুমার— তোমাদের তরুণ জীবনের পীড়িত রক্তধারায় তাহার কোমল হাত দুখানি যখনও আর্দ্র আছে, তখনও সে তোমাদের রূপের ব্যাখ্যান করিতে ভুলিবে না। হায় এই কি করুণা, স্নেহসিক্ত হৃদয়ের সহানুভূতি ? অদৃষ্টবশতঃ তোমরা যে রমণীর চূর্ণ কুঞ্চিত কুন্তলের শোভা-বর্দ্ধন করিবে, তাহার মত নির্ম্মায়িক হৃদয় অতি অল্পই দেখা যায়, যে পুরুষের উত্তরীয়াঞ্চলের সুরভি বর্দ্ধন করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিবে, যদি তোমরা মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারিতে, তাহা হইলে সে নরাধমের, তোমাদের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সাহসও হইত না। ভাগ্যবৈগুণ্যে কোনও দিন তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ পাত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, আসন্ন মৃত্যুর উদ্‌ভ্রান্ত অপরিসীম তৃষ্ণার যন্ত্রণা, বিরস, বহুদিনের পুরাতন, গলিত সলিলেই মিটাইতে হইবে। অতুলন সুন্দর ফুলগুলি, তোমরা যদি একবার আমাদের মিকাডোর দেশে আসিতে—তাহা হইলে কোনও সময়ে কাঁচি আর ক্ষুদ্র করাত হস্তে একটি ভয়ানক মানুষকে দেখিতে পাইতে—তিনি আপনাকে "ফুলের প্রভু" আখ্যা দিয়াছেন। তিনি একজন ভিষক্—তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বতই তোমাদের মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত—কেন না তোমরা ত জানই, হস্তগত রোগীর যন্ত্রণা সমধিক দীর্ঘস্থায়ী করাই বৈদ্য এবং চিকিৎসকের বিশেষ ব্যবসায়! কাটিয়া, বাঁকাইয়া, মোচড়াইয়া, যতপ্রকার অসম্ভব অবস্থায় নানা প্রকারে বিপর্য্যস্ত করিয়াই, তিনি তোমাদের সম্যক্ উন্নতি সাধন করিতেছেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিবেন। অস্থি-বিদ্যাবিশারদ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তিনি অতি সহজেই তোমাদের পেশী বিকৃত, অস্থি স্থানচ্যুত, ছিন্ন অঙ্গের শোণিত-স্রাব রোধ করিবার জন্য জ্বলন্ত অঙ্গারে তোমাদিগকে দগ্ধ, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহের স্ফূর্ত্তি বিধান করিবার জন্য দেহের সর্ব্বত্র তীক্ষ্ণ শলাকা প্রবেশ করাইয়া, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন জ্ঞানে প্রীতি লাভ করিবেন। তোমাদের জন্য লবণ, ভিনিগার, ফটকিরি এমন কি Vitriol পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবেন। যদি দৈবাৎ

মূর্চ্ছাপন্ন হও, তবে পাদদেশে ফুটন্ত উষ্ণ সলিল নিষেক করিয়া তোমাদের সঞ্জীবিত করিয়া দিবেন। তাঁহারই চিকিৎসার সাহায্যে তোমরা এক পক্ষ কাল অধিক জীবিত আছ, সর্ব্বত্রই তিনি এ কীর্ত্তি প্রচার করিয়া ফিরিবেন। এই চিকিৎসা-বিভীষিকার হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা, বহু পূর্ব্বে যে দিন তোমায় বন্দী করা হয়, সেই দিনই মৃত্যু কি শ্রেয়ঃ হইত না ? হায়, জন্ম-জন্মান্তরের কতই না পাপের ফলে এ যন্ত্রণা তোমাদের ভোগ করিতে হইল ?

আমাদের প্রাচ্য দেশে ফুলের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়, তাহার তুলনায় পাশ্চাত্য অত্যাচার আরও ভয়ানক। ইউরোপ আমেরিকায় প্রতিদিন "খানা-কামরা" এবং নাচঘর (Ball-room) সাজাইবার জন্য, যে সংখ্যাতীত পুষ্পজীবনের সর্ব্বনাশ করিয়া, পরদিন প্রভাতে তাহাদিগকে আবর্জ্জনা স্তূপে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তাহা ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে— সেই ফুলগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিলে একটি সমগ্র মহাদেশকে মালার বাঁধনে বাঁধা যাইতে পারিত। এই নিতান্ত নির্ব্বিচার নির্ম্মম ব্যবহারের তুলনায় আমাদিগের পুষ্প-চিকিৎসকদিগের অপরাধ, দয়ার মতই প্রতিভাত হয়। তাঁহারা অন্ততঃ প্রকৃতির গৃহিণীপণার সম্মান রক্ষা করেন, অনেক বিচার বিবেচনা করিয়াই বলি সংগ্রহ করেন এবং পূজাশেষে মৃতের যথাযোগ্য সৎকার করিতে বিমুখ হয়েন না। পাশ্চাত্য জগতে পুষ্পসজ্জার এই প্রাচুর্য্য, ঐশ্বর্য্যের বিকারগ্রস্ত আড়ম্বর মাত্র ; লক্ষপতির এক লহমার খেয়াল। নিশীথের নৃত্যগীতোৎসবের পরে, এই সুকুমার ফুলগুলির কি দশা হয় ! পথের প্রান্তে ধূলিধূসরিত দেহে তাহাদিগকে পড়িয়া থাকিতে দেখা, বড়ই ক্লেশকর দৃশ্য।

হায় ফুল কেন এমন সুন্দর অথচ এমন অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ! কীট পতঙ্গও দংশন করিতে জানে, মৃদুতম স্বভাবের জীবও বিপদের তাড়নায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়। যে পাখীর পালক লইয়া পাশ্চাত্য সভ্য রমণী আপনার টুপি সাজাইয়া থাকেন, সেও উড়িয়া পলাইতে জানে, যে রোমশ জন্তুর মসৃণ অঙ্গচ্ছদটি তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সেও পদশব্দ শুনিবামাত্র পলাইতে পারে। একমাত্র ফুলের প্রতিরূপ পতঙ্গম, রেণু পরাগবর্ণ সুষমায় মনোহর প্রজাপতি, ফুলেরই মত সুকুমার হইয়াও সে উড়িতে জানে, পলাইবার উপায় তাহার আছে, কিন্তু আর সকল ফুলই নিরুপায়, একান্ত আত্মরক্ষা অসমর্থ। যদি তাহারা মৃত্যুমুহূর্ত্তে তীব্র আর্ত্ত চীৎকারও করে তবে নির্দ্দয় মানবের শ্রবণে সে বিলাপ প্রবেশ করে না। নীরবে নম্র হৃদয়ে যাহারা আমাদের স্নেহ সেবা করিতে অভ্যস্ত, চিরদিনই আমরা তাহাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিতে দ্বিধা মাত্র করি না—কিন্তু হায় এমন দিন আসা বিচিত্র নয়, যে দুর্দ্দিনে সেই পরম বন্ধু সকল চিরদিনের মতই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

দেখ নাই কি বন্ধু, বনফুল দিন দিন দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, হয়ত বা পুষ্পরাজ্যের কোনও সুদূরদৃষ্টি বিজ্ঞমন্ত্রী তাহাদিগকে বলিয়াছেন, মানব সমাজে যত দিন না স্নেহ, করুণা, সহানুভূতি প্রসর লাভ করে, ততদিন তোমরা আর আসিও না— দূরে চলিয়া যাও। তাই বুঝি তাহারা দেবতার নন্দন বনে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছে। যে ব্যক্তি ফুলের চিকিৎসা করেন, তাঁহার অপেক্ষা যিনি তাহার উৎকর্ষ চর্চ্চা করেন তিনি

যে শ্রেষ্ঠতর, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কত আগ্রহের সহিত তিনি আকাশে মেঘ সঞ্চার ও সূর্য্যালোকের প্রসার নিরীক্ষণ করেন, বিপ্লবকারী কীট পতঙ্গমের সহিত যুদ্ধরত হয়েন, তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কায় কতই না কাতর হইয়া উঠেন। আবার যখন কোমল কোরকাবলীর আবির্ভাব হয়, তখন কি স্নেহশঙ্কী-মন লইয়া দিনে দিনে তিনি তাহাদের পূর্ণবিকাশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তরুণ কিশলয়ের অরুণ রাগ তাঁহাকে কতই না আনন্দবিহ্বল করে। আমাদের এই প্রাচ্যদেশে, "ফুলের ফসল" ফলাইবার শিল্প ও ব্যবসায় বহু প্রাচীন ; কবি ও তাঁহার প্রিয় তরুলতার প্রেমকাহিনী, কত কবিতা কত না সঙ্গীতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্রাট বিশেষের সময়, চীনা মাটির কারু কার্য্য যখন উন্নতিলাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন সখের গাছগুলিকে যত্নে রাখিবার জন্য কত সুন্দর আধারের সৃষ্টি হয়, অনেক সময়ে কাচ পাত্র যথেষ্ট মনে হইত না তখন বহুরত্নখচিত সুবর্ণ কিম্বা রজতাধারে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইত। পুষ্পসুন্দরীদিগের পরিচর্য্যার জন্য বিশেষ ভৃত্য নিয়োজিত থাকিত, তাহারা প্রহরে প্রহরে শশক রোমের অতি সুকোমল কূর্চ্চ দ্বারা প্রস্ফুটিত দলগুলিকে পরিস্কার করিয়া দিত। লিখিত আছে, আজানুলম্বিত-সুকেশী, সুন্দরী, তরুণী, সুসজ্জিত হইয়া পিউনি (Peony) ফুলের আলবালে জলসেচন করিলে, তবে তাহার সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হয়, নিয়ম ক্ষাম-মুখ, কৃশতনু বৌদ্ধপুরোহিত প্লাম গাছের পরিচর্য্যা করিবেন ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। নবোদ্গত সুকুমার কোরকের রক্ষাকল্পে সবিশেষ যত্ন করা হইত। কোনও সম্রাট পক্ষীদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য বাগানের গাছের ডালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ-ঘন্টিকা টাঙাইয়া দিয়াছিলেন—বসন্ত ঋতু যখন আনন্দ সমারোহে দিগ্‌বিদিক উল্লসিত করিয়া তুলিত তখন তিনিও রাজসভার বীণকারের সঙ্গে প্রমোদ উদ্যানে যাইয়া, রাগিণীর সুমধুর আলাপে তাঁহার কুসুম-প্রেয়সীদিগের চিত্ত বিনোদন করিতেন। অতীতের অন্ধকার গর্ভ হইতে দু'-একখানি তাম্রলিপির আবিস্কার হইয়াছে— তাহার অনুশাসন পাঠ করিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিয়া ওঠা দায়। ফুলের অপরূপ রূপলাবণ্যের বর্ণন করিয়া, লেখক বলিয়াছেন যদি কোন নিষ্ঠুর ইহার একটি শাখা ভগ্ন করে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে, আপনার একটি অঙ্গুলি কাটিয়া দিতে হইবে। আজকালকার এই নির্ব্বিচার অত্যাচারের দিনে, রাজা যদি ফুলের অপব্যবহার এবং চারু শিল্পের অবমাননার শাস্তিস্বরূপ, এমনি বিধান প্রচার করাইতেন তবে তাহা অবিধি মনে করিতাম না।

মানসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

ভক্তবাণী

(আমিয়েল)[১১]

আমি আমার কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু সে কর্ত্তব্য কোথায়, সে কর্ত্তব্য কি ? আমার জন্মগত সংস্কার, আমার বাসনা, জীবনরহস্যের আপন আপন মনোমত

মীমাংসা লইয়া উপস্থিত— চরম প্রশ্ন এখন এই, আপন স্বভাব, তাহা যতই সুন্দর ও অধ্যাত্মশক্তিপূর্ণ হউক না, তাহার বশবর্ত্তী হওয়াই কর্ত্তব্য, না তাহাকে স্ববশে আনাই কর্ত্তব্য ?

কেমন করিয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কি ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা এক মহৎ সাধনার সিদ্ধি, এক মহান ঐশ্বর্য্যসঞ্চয়। এই অর্জ্জনের নিমিত্ত বিবেচনা, ক্ষমতা ও স্থিরবুদ্ধির প্রয়োজন। নিয়ত প্রস্তুত থাকিতে হইলে গ্রন্থিচ্ছেদন করিতে সক্ষম হওয়া আবশ্যক ; কেননা অনেক সময় বন্ধন খুলিয়া দিবার অবসর থাকে না। ক্ষুদ্র, সুকুমার, স্বল্প সামান্য বস্তু হইতে সারসংগ্রহ করিতে, বিবিধ এবং অবান্তর বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্রকে বিভিন্ন করিয়া লইতে শিক্ষা করিতে হইবে ; এক কথায়, কর্ত্তব্য, ব্যবসায় এবং জীবনকে সকল জটিলতা-মুক্ত করা প্রয়োজনীয়। প্রস্তুত থাকিবার শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া আর, নবজীবনপথে যাত্রা আরম্ভ করা একই কথা।

সাধারণতঃ আমরা প্রায় সকলেই আমাদের যথার্থ কর্ত্তব্য ব্যতীত কত অনর্থক কার্য্যভারে কত অসংখ্য অকারণ প্রতিবন্ধকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেগুলি আমাদিগকে নিপীড়িত করে, সামান্য তুচ্ছ হইয়াও ঊর্ণনাভজালের ন্যায় বিচিত্রবন্ধনে বেষ্টন করিয়া আমাদের স্বর্গমুখী তীর্থযাত্রায় বাধা রচনা করে। অসংযম আমাদিগকে দাসত্বে অবনত করে ; বর্ত্তমানের বিশৃঙখলতা ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

দ্বিপ্রহর রাত্রি, রহস্যময় চন্দ্রালোক, দক্ষিণ পবনের মৃদু হিল্লোল, অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লঘু, শুভ্র মেঘাবলি সৌধছাদকে রমণীয় করিয়াছে। নীলাম্বরের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ হইতে প্রসারিত এই স্নিগ্ধ কিরণরাশি, জীবনের প্রশান্ত আনন্দের ন্যায়, অভিজ্ঞতার সৌম্য স্মিতহাস্যের ন্যায়, বিবেকীর বৈরাগ্যপূর্ণ শক্তির ন্যায় স্বর্গীয় প্রসাদে পরিপূর্ণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। দীপ্ত উজ্জ্বল অসংখ্য নক্ষত্রমালায় গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত ; বনবীথিকার আন্দোলিত তরুশ্রেণীর শ্যামপল্লবগুচ্ছ, রৌপ্য আলোকে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। দিগন্তপ্রসারিত এই দৃশ্যের কোথাও কোন শব্দ নাই। হরিত পল্লীপথ এবং সোপানাবলীর প্রান্তসমূহ প্রগাঢ় অন্ধকার ছায়ায় লুক্কায়িত, চারিদিক প্রচ্ছন্ন, সঙ্গোপন, গম্ভীর এবং ঔদাস্যময়। অয়ি নিঃসঙ্গ নির্জ্জন রহস্য-মধুর রাত্রি, তুমি অব্যক্ত, অনিশ্চিত, অপূর্ব্ব বেদনার সহিত সুমঙ্গল সান্ত্বনা বহন করিয়া আন। তুমি জীবনের ব্যর্থস্বপ্ন, নিস্ফল প্রয়াস, আয়ত্ত-অসাধ্য সুদূর অতীত এবং মরণ সুখ সন্নিকট ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করাইয়া দাও, আবার তুমিই মাভৈঃ মন্ত্রে চিরবাঞ্ছিত বিশ্রামের আশ্বাস প্রচার করো। আপনার হৃদয়ক্ষেত্রে রহস্যের অধিকার রক্ষা করো, সর্ব্বদাই আত্মপরীক্ষার হলশলাকার তাড়নায় তাহাকে উদ্ভিন্ন এবং উদ্‌ঘাটিত করিও না। হৃদয়ের এক প্রান্তে বায়ুচালিত বীজের জন্য একটুখানি পতিত জমি, শ্রান্ত পাখীটির বিশ্রামের জন্য একটি শ্যামছায়ামণ্ডিত ক্ষুদ্র সঙ্গোপন নিভৃত স্থান থাকিতে দাও ; অপ্রত্যাশিত অতিথির জন্য একখানি আসন,

অজ্ঞাত দেবতার জন্য একটি পুণ্য-বেদিকা সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখ। যদি কোন দিন তোমার তরুশাখার পত্রান্তরালে সুকুমার পাখীটি আনন্দসঙ্গীত গান করে, তবে তাহাকে বশ করিবার জন্য, তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল হইও না— তোমার হৃদয়-নিভৃতে যদি কোন অভিনব ভাবসঞ্চার অনুভব কর, কোন নব জাগরণের স্নিগ্ধ রশ্মিলেখা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে দেখ, তবে তাহাকে সম্যক আয়ত্ত করিবার জন্য, প্রদীপ্ত আলোকে সে অস্ফুট লিখন পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইও না ; অঙ্কুরোন্মুখ তরুণ বীজটিকে বিস্মৃতির আশ্রয় দান কর, শান্তির দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখ, তাহার চারিদিকে অন্ধকারের নিস্তব্ধ ধ্যান ভঙ্গ হইতে দিও না, তাহাকে সুগঠিত এবং সুপরিণত হইতে অবসর দাও। সাবধান, কেহ যেন তোমার এই অপূর্ব্ব আনন্দের সংবাদ তিলমাত্র জানিতে না পারে। প্রকৃতির প্রত্যেক বিকাশ, দৈবরহস্যময় সকল গর্ভাধান, জীবনের প্রত্যেক প্রথম উন্মেষকে বিনীত লজ্জা, পরিপূর্ণ নির্জ্জনতা এবং নিশীথের নিবিড় অন্ধকার এই তিনটি যবনিকার অন্তরালে রক্ষা করিও।

যে মূক সে বিস্মৃত, যে প্রতিনিবৃত্ত সে স্বাধীকার-বঞ্চিত, যে অগ্রসর হইতে শিথিল না তাহার স্থান সর্ব্বশেষে, জীবনপথে যাহার গতি স্থগিত সে পরাভূত, দূরীকৃত এবং বিদলিত ; যে মহত্তর হইল না সে ক্ষুদ্রতর হইয়া যায় ; যে পরাঙ্মুখ সে স্থানভ্রষ্ট, জীবনের গতি মন্দ হওয়াই মৃত্যুর ভয়াল পূর্ব্বলক্ষণ। জীবনের অর্থই অশ্রান্ত বিজয়চেষ্টা —ধ্বংস, ব্যামোহ, শারীরিক এবং নৈতিক অস্তিত্বের বিলোপ এবং বিক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল আত্মরক্ষা। ইচ্ছাশক্তির নিরন্তর পরিচালনা, এবং প্রতিদিন তাহাকে সঞ্জীবিত করিবার নামান্তর মানব-জীবন।

হায় দরিদ্রহৃদয়, তুমি জীবনের প্রেমের মায়া-মরীচিকার ভিখারী, তবুও তুমি ভ্রান্ত নও, কারণ জীবন অপার্থিব এবং স্বর্গীয়।

বিকাশোন্মুখহৃদয় শিশুর সহিত প্রথম বাক্যালাপ কি অপরিসীম দায়িত্বপূর্ণ, আজ প্রাতে আমি তাহা সহসা অনুভব করিলাম। নিষ্কলঙ্ক অনভিজ্ঞতা এবং নির্দ্দোষ শৈশব কতই না পবিত্র !

কৃষক যখন ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করে, পিতামাতা যখন সন্তানের সমক্ষে ভাবীফলপ্রসূ বাক্য প্রয়োগ করেন, তখন মনে রাখা আবশ্যক তাঁহারা একটি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভক্তিনম্রহৃদয়ে, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া সংযতশুদ্ধভাবে এ কাজ করিতে হইবে। কেননা তখনই তাঁহারা বিশ্বদেবতার মন্দিরে পূজার নৈবেদ্যের আয়োজন করেন। মানবের হৃদয়ক্ষেত্র কিম্বা মানবের শস্যক্ষেত্র যেখানেই হউক প্রত্যেক বীজবপন ব্যাপার দিব্য-রহস্যময়। মানব ঈশ্বরের ক্ষেত্রপালক, জীবনকে সুন্দর পরিণতির দিকে অগ্রসর করা, বীজ বপন করিয়া চারিদিকে নবীন জীবনের উন্মেষ করা, ইহাই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। মানবজাতি এই প্রচার-কার্য্যের ধর্ম্মযাজক এবং পুরোহিত, এবং

এই ধর্ম্ম-বিস্তারের প্রধান সহায় এবং সাধন মানবের ভাষা। আমরা কতবার ভুলিয়া যাই ভাষায় ভবিষ্যতের বীজ রোপিত থাকে এবং তাহার দ্বারাই প্রচ্ছন্ন রহস্যের নিরাকরণ হয়। সময়ে প্রযুক্ত একটিমাত্র তুচ্ছ বাক্যের কার্য্যকরী শক্তি কি অপরিমেয়, বাক্য কি অপূর্ব্ব রহস্যময়! আমরা একান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং পৃথিবীর ধূলির একান্ত অনুরক্ত তাই বাক্যের রহস্যসম্বন্ধে আমরা অন্ধ! আমরা আমাদিগের গৃহের আসনশয্যা, পথপার্শ্বের প্রস্তর এবং বৃক্ষশ্রেণী যাহা কিছু স্পর্শযোগ্য এবং বাস্তব কেবল তাহাই দেখিতে পাই কিন্তু আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ভাবের যে অদৃশ্য অক্ষৌহিণী নিরন্তর সঞ্চরণ করে সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনই কোন এক বিশ্বাস-বিশেষের অনিবার্য্য নিঃশব্দ গম্ভীর প্রচার-শক্তিতে পরিপূর্ণ। যতদূর তাহার সাধ্য-সীমা ততদূর সে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বপরিবার আপন মানস-প্রতিমার আদর্শে গঠন করিবার চেষ্টা করে। আমাদের প্রত্যেকেরি নিকট আত্মার সঞ্জীবনী-মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মানবের জীবন অবিরত অশ্রান্ত আলোক-বর্ষণ ও বিস্তারের কেন্দ্রস্বরূপ একটি সুদূর সমুচ্চ প্রদীপ, যাহার আলোকের আকর্ষণে কত মানবের ভ্রান্ত জীবন মগ্ন শৈলের বিঘ্ন কাটাইয়া নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় লাভ করে।

আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন দেবপুরোহিত, আমাদের প্রত্যেকের জীবন-চেষ্টাই অলক্ষ্যে অতর্কিতভাবে নিঃশব্দে অপর দশ জনকে বিধি-বিধান নির্দ্দেশ করে; হায়, আমাদের অনেকেই অপদেবতার পূজারি; লোভ এবং নিষ্ঠুরতাই আমাদের ইষ্টমন্ত্র। এইজন্যই আমরা ভয়ানক দায়িত্বভারে অবনত; মন্দ দৃষ্টান্ত আধ্যাত্মিক বিষপ্রয়োগ, অপদেবতায় অধর্ম্মবিশ্বাস এবং পাতকের ঘোষণা। অন্যায় কার্য্যে যদি কেবলমাত্র নিজের অনিষ্ট হইত তবে তাহা দুর্ভাগ্য বলিলেও চলিত; দুর্ব্বল মানব-ভ্রাতাকে কলুষিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে বলিয়াই তাহার নাম মহাপাতক। এই জন্যই সাধুগণ বলিয়াছেন দেবপ্রসাদস্বরূপ দুর্লভ মানবজীবন লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি নিষ্পাপ অবোধ সুকুমার সুন্দর শিশুদিগের হানি করে তাহার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৩৪ শকাব্দ।

চৈতালি[১২]

'চৈতালি' কাব্যখানি কাব্যসংগ্রহের মধ্যে পাই, স্বতন্ত্র ভাবে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ হইয়াছিল ১৫ই আশ্বিন ১৩০৩ সালে, প্রকাশক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদ ভাগিনেয়, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ইহাতে কবীন্দ্রের কৈশোরক কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতালি পর্য্যন্ত কবিতা সন্নিবেশিত আছে। অনেকে এই পরিষদে কবিবরের অনেক কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন, চৈতালি গ্রন্থখানি আমার বিশেষ প্রিয় বলিয়া আমি ইহাকেই নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি। চৈতালি রবীন্দ্রের ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের রচনা, যাহার কথা বলিতে তিনি বলিতেন, "রবি এখন

মধ্যাহ্ন গগনে, Zenith এ", তখন তাঁহার দেহ আর মনের পরিপূর্ণ যৌবন কাল, এই তো সেদিন তাঁহার সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসব হইল, দেহ ক্ষীণ হইলেও মনের চির তারুণ্য এখনও বর্ত্তমান।

আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু যখনি তিনি একখানি কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন, তখনি মনে করেন সেই তাঁর শেষ রচনা, আর সেই ভাবের কবিতা তাঁহার লেখার মধ্যে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে চৈতালি লিখিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই রবি-শষ্যই তাঁহার শেষ দান, সেই কারণেই ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন, "চৈতালি"। আপনারা সকলেই জানেন তাহার পর এই ৩৫ বৎসরে তিনি আমাদের জন্য লক্ষাধিক কবিতাকুসুম সৃষ্টি করিয়াছেন, সংখ্যাতীত গান কথায় সুরে মনোরম করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিয়াছেন, কত বিচিত্র নাট্যাবলী, প্রবন্ধ, রূপকের রূপকথা যে রচনা করিয়াছেন তাহার গণনা হয় না, আর এই সকল রচনাই বিশ্ব-সভায় তাঁহার দীপ্ত ললাটে যশের মুকুট পরাইয়া, ভারত-মাতার জন্য গৌরব পদবী অর্জ্জন করিয়াছে। আজ বাঙালী তাঁহারি গর্ব্বে গর্ব্বিত, তাঁহারি মহিমায় গৌরবান্বিত।

চৈতালির প্রথমেই উৎসর্গ কবিতাটি পড়িয়া মনে হয়, তাঁহার যৌবন-প্রদীপ্ত জীবনের উজ্জ্বল মদিরা বুঝি পেয়ালা ভরিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিবেন, কিন্তু ইহার পর হইতেই কেমন একটি বেদনার সুরে সমস্ত কাব্যখানি অনুবিদ্ধ। উৎসর্গ কবিতাটিতে আছে : —

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল !....

তুমি এসো নিকুঞ্জনিবাসে,
এস মোর সার্থকসাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব-সমর্পণ—
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি।

সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি' তুলি'—
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

এ যেন ওমারখায়েমের সাকী ও তাহার প্রণয়ীর ছবি ; কিন্তু পরবর্ত্তী কবিতাতেই দেখি, এ উচ্ছ্বাস আর নাই, কবি কাতর হইয়া বলিতেছেন, "চ'লে গেছে মোর বীণাপাণি", বীণা আর বাজিবে না, তাঁহার আর আশা নাই, আশ্বাস নাই, বেদনায় অন্তর পরিপ্লুত।

এক দিন সন্ধ্যালোকে অশ্রুজল ভরি চোখে
বক্ষে এরে লইলাম টানি'—
আর না বাজিতে চায়— তখনি বুঝিনু হায়
চ'লে গেছে মোর বীণাপাণি।

ভগবানের বিভূতি যেমন অণোরণীয়ান্ মহতোর্মহীয়ান্ কবিচিত্তের অনুভূতির মধ্যে আমরা তাহারি পরিচয় লাভ করি। তুচ্ছতম হইতে শ্রেষ্ঠের সহিত সমানুভব এই কাব্যখানিতে, তাই গৃহকোণে তাঁহার আশার সীমা আসিয়া পড়িলেও আবার অসীম আকাশও ছাড়াইয়া যায়। কখনো কখনো তাই বলিয়াছেন,—

সব পাই যদি তবু নিরবধি,
আরো পেতে চায় মন,—
তারে যদি পাই, তবে শুধু চাই
একখানি গৃহ-কোণ।

আবার গাহিয়াছেন—

নীরবে জ্বলিছে তব পথের দুধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে।

এই রচনাগুলির মধ্যে বাংলার পল্লী, বিরাট ভারত অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সর্ব্বত্রই তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত। পুঁটু-রাণীও তাঁহার স্নিগ্ধ নেত্রপাত এড়াইয়া যায় নাই, আবার দেব-সেনাপতি কুমার-জননীর, কুমার-সম্ভব কথার উল্লেখে মাতৃহৃদয়ের আনন্দ, অথচ নারীজনসুলভ লজ্জার অরুণিমা, আয়ত নয়ন, তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ; আর কেন যে কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাস তাঁহার কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিয়াছেন।

কবি রসানুবেত্তা, তাঁহার দরদী মন, কোন কিছুকেই তুচ্ছ মনে করে না। চৈতালি

রচনা কালে তিনি তাঁহাদের জমিদারী পরিদর্শনে বাংলা পল্লীর অন্তরের অন্তঃপুরে, দুরন্তপর্ব্বত-দুহিতা পদ্মার তটান্তদেশে বজরায় থাকিতেন। এই চৈতালিতে আর ছিন্নপত্রে, সেই সকল পল্লী-দৃশ্যের অনেকগুলি অনুপম ছবি আমরা দেখিতে পাই। যাঁহারা বাংলার পল্লীগ্রামের সহিত পরিচিত তাঁহারা বুঝিবেন 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটি তাহার কি নিখুঁত ছবি।

"প্রভাতে" —প্রভাতালোকে মনে করিয়াছেন,

ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

"দুর্লভ জন্মে" বলিতেছেন : —

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাই নি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ ব'লে যা চাই নি তাই মোরে দাও।

"কর্ম্ম" কবিতাটিতে, দরিদ্রের যে শোক করিবার অবসরও নাই, আর মানব-জীবনের সার্থকতা যে এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তাহা কেমন সহজ অথচ মর্ম্মস্পর্শী স্বল্প কথায়, রেখাক্ষরে ছবিতে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নির্জ্জন বাসে নিঃসঙ্গ নৌকার বাতায়নে বসিয়া তিনি দেখিয়াছেন, হিন্দুস্থানী মাতৃহীন বালিকার গৃহিণীপণা, "দিদি" কেমন করিয়া শিশুকালেই "মা" হইয়া বসিয়াছে। জীবধাত্রী ধরিত্রী যেমন পশু-শাবক ও মানব-শিশুকে সমস্নেহে বুকে ধরিয়া আছেন উভয়ের মধ্যেই স্নেহ-সূত্র বাঁধিয়া দেন, দিদিও তেমনি করিয়া—

পশু-শিশু, নর-শিশু— দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথের দৃশ্য তাঁহার মনকে অনন্তের পথে লইয়া গেল। ঐ ছোট্ট খোলা বাতায়নটি যেমন তাঁহাকে দেখাইল শ্যামাঞ্চলা বসুমতীর চিরসুষমা তেমনি দেখিলেন জ্যোতিস্কমণ্ডলী আর ছায়াপথে কৃষ্ণা রজনীর তমিস্রার রহস্য, শুক্লার সীমাহীন প্রকাশ।

এইখানেই সাধারণ মন আর কবিচিত্তের প্রভেদ। ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও তিনি ভূমার স্পর্শ লাভ করেন, আর এই জীবনের মিলন নিবিড় হইলেও তাহা ক্ষণিকের, কখন ফুরায় তাহা কে বলিতে পারে? তাই তো মুগ্ধ হৃদয় বলিয়া ওঠে,

এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর!
মুহূর্ত্ত আলোকে কেন, হে অন্তর-তম,
তোমারে চিনিনু চির-পরিচিত মম?

এই "চৈতালি" কাব্যখানি সকলকেই একবার পড়িতে বলি, যিনি পড়িয়াছেন তিনি আবার পড়িয়া দেখুন, আর যাঁহারা "বঞ্চিত শ্রীগোবিন্দ দাসে"র মত ইহার সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহারা পরিচয় লাভ করিলে দেখিবেন, 'পুঁটু', 'হৃদয়-ধর্ম্ম', 'মিলন-দৃশ্য', 'দুই বন্ধু', ও 'সঙ্গী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কি স্নিগ্ধ রস-মাধুর্য্য। সবগুলিই কেন যে কবিচিত্তের স্নেহ-বঞ্চিত নয়, তাহা বুঝা কঠিন হইবে না। সৃষ্ট জীবজন্তু, তরুলতিকা, ওষধি, তৃণমঞ্জরী, প্রকৃতির অণু-পরমাণুর সহিত আমাদের দেহ মনের নাড়ীর টান আছে—সে কথা আমরা প্রতিদিনই কতভাবে অনুভব করি। সকলে প্রকাশের ভাষা পাই না, কবি সহজেই তাহা আভাসে প্রকাশে আমাদের চক্ষের ও মনের সম্মুখে ধরিয়া দেন।

চৈতালির সূচনা প্রতিদিনের জীবনের সরল রেখাপাতে, ক্রমে সে সরল রেখা সমান্তরাল রেখার প্রান্তে যেখানে গিয়া মিশিল সেটি অসীমার রাজ্য।

তিনি বাংলার পল্লী ছাড়িয়া বিরাট ভারতের সম্মুখে দাঁড়াইলেন ; তাহার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ তাঁহার মনে আবেগ সঞ্চার করিল। ইহার পরিচয় পাই 'বনে ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। শেষোক্ত কবিতাটি উদ্ধার করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই চতুর্দ্দশ পদে যে শব্দচাতুর্য্য মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান, যে চমৎকার শব্দনির্ব্বাচন, আর কয়েকটি রেখায় যে বিশাল বিরাট চিত্র আমাদের মানস-চক্ষে প্রকাশিত হয়, তাহা যেমন বৃহৎ তেমনি পরিস্কার, এমনি শব্দচয়নের চাতুর্য্য তাঁহার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় দেখিতে পাই।

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী, উদ্ধত-ললাট—
স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টংকারে,
বীণার সংগীত আর নূপুর-ঝঙ্কারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্নাদ শঙ্খের গর্জ্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্ম্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্ব্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

আমি যে বলিয়াছিলাম, কবি-চিত্তের অনুভূতি আণোরণীয়াণ্ হইতে মহতোমহীয়াণ্ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে তাহারি সম্যক্ পরিচয় পাই। আর এক কথা, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ বিশ্বরূপের মধ্যে চিত্তের যোগসূত্রের অস্তিত্ব অনুভব

করা, জীবধাত্রী ধরিত্রীর মতই নির্ব্বিচার স্নেহ পরিবেশন— ভেদবুদ্ধিরাহিত্য, জীবে দয়া, মানবের মধ্যে মৈত্রী,আর তরুলতা-ওষধির প্রতি করুণা। আদি কবি বাল্মীকির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি —ক্রৌঞ্চমিথুনের বিচ্ছেদ-বেদনার শোকোচ্ছ্বাসে, রুধিরাপ্লুত দেহের ব্যথিত ছবিতে। রামায়ণে নিষাদ-পতি অযোধ্যার যুবরাজের বান্ধব, সুগ্রীব তাঁহার মিতা, শবরী তাঁহার অনুরাগিণী, কতকাল হইতে তাঁহারি প্রতীক্ষায়, জীবনের সকল সম্ভোগ উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে, এমন কি শত্রু-ভ্রাতা বিভীষণও তাঁহার ভক্ত ও রাজ্যসুখত্যাগী।

শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে দেখিতে পাই, মাতৃহীন মৃগশিশু রোরুদ্যমানা শকুন্তলার অঞ্চল-প্রান্ত আকর্ষণ করিয়া যেন বিদায় লইতে বারণ করিতেছে, আশ্রম-কন্যা শকুন্তলা স্নেহ-লালিত তরু-লতিকার কাছে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

"পদ্মা" কবিতাটি আমাদের মন মুগ্ধ করে তাহার আন্তরিকতায়।

'স্নেহগ্রাস', 'বঙ্গমাতা' কবিতায় তিনি যে পরামর্শ দিয়াছিলেন আজ ৩৫ বৎসর পরে আমরা তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, —আর শুধু বাঙালী হইয়া পৈতৃক ভিটার মায়ায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, এবার যথার্থই মনুষ্যত্বের কঠোর সাধনার দিন আসিয়া পড়িয়াছে।

এই কাব্যখানিতে তিনি নারীর সম্মান পদবী বিস্মৃত হ'ন নাই তাই বলিয়াছেন,—

যখন তোমার পরে পড়ে'নি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে। . . .

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পসিল অন্তরে।

এই কবিতাগুলি যেন কবির সেই সাময়িক মনের আত্মকথা, দিনের পর দিন এই রচনাগুলির মধ্য দিয়া জীবনের কয়েক পৃষ্ঠা তিনি খুলিয়া দেখাইয়াছেন, কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিলেও, বারম্বার ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহার নৌকার ছোট্ট বাতায়নটির পাশে, যেন কি এক আঘাতবেদনা, তাঁহার মনকে কাতর করিয়া তুলিয়াছে, ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারেন নাই, ব্যথার সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া উঠিয়াছে। ছেলেবেলায় যখন তাঁহার একখানি কাব্যের নাম দেখিলাম "ভগ্ন-হৃদয়" —তখন বালিকা-বয়স, সংসারজ্ঞান নাই, হাসিয়া বলিয়াছিলাম, —"ওমা, —ভগ্নহৃদয়ের আবার কবিতা হয় ?" এখন দেখিতেছি মানস-নিকষ যদি ব্যথায় ফাটিয়া ওঠে, তখনি উৎস উৎসারিত হইবার অবসর পায়, রস-গঙ্গার গোমুখীর মুখ খুলিয়া যায়।

ব্যথা পাইয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত কোন প্রমাণ জানা নাই, বোধ-হওয়ার উপরই বলা ; তবে যদি আঘাত লাগিয়াই থাকে, ব্যথা বাজিয়াছিল

তাঁহাকে ; আমরা পাইলাম নিরাভরণা কণ্ব-তনয়ার মতই অনুপমমূর্ত্তি সরল সুন্দর এই কবিতাগুলি, যাহারা স্বাভাবিক সুষমায় সহজেই চিত্তহারী।

কাব্যখানি স্বল্পায়তন, আলোচনা বহু দীর্ঘ হইলে রসভঙ্গ হইবার ভয়। আমি ভাষ্য লিখিতে বসি নাই, ইহার প্রতি আমার কেন যে পক্ষপাত, আমার অন্তরের সেই কথাটি আপনাদের কাছে বলিলাম, আপনারাও ভাবিয়া দেখিতে পারিবেন।

কবিতাগুলি অধিকাংশই চতুর্দ্দশপদী গীতি-কবিতা ; তবে ইহার ভিতর শিল্পীর নিপুণ হস্তের পরিচয় সর্ব্বত্রই আছে চতুর্দ্দশ পদে ; ঐ কয়েকটি ছত্রের মধ্যে একখানি ছবি সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিয়া সম্মুখে ধরা, ভাবকে অন্তরের অন্তরাল হইতে বাহিরে আনিয়া ভাষায় বিকশিত করিয়া তোলা দক্ষ লেখনীর পরিচয়।

কোথাও কষ্ট-কল্পনা বা চেষ্টার চিহ্ন দেখি না, তাহার কারণ টানিয়া বুনিয়া কিছু করেন নাই। যখনি মন মাথা নাড়িয়াছে, তিনিও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—

বৃথা চেষ্টা, রাখি দাও। স্তব্ধ নীরবতা
আপনি গড়িবে তুলি আপনার কথা।
আজ সে রয়েছে ধ্যানে এ হৃদয় মম—
তপোভঙ্গভয়ভীত তপোবনসম।

তপোভঙ্গের শাস্তি ভয়াবহ, আর পরিণাম রতি-বিলাপ ! তপোভঙ্গের কোন প্রয়াস নাই, কষ্ট—চেষ্টার পরিচয় পাই না, কবিতাগুলি প্রজাপতি, ফুল, ছোট পাখীর মতই সুন্দর, গঠনে সংহত, সংযত, সঙ্গত ও সুষম। তাই যেমন কাব্যানুরাগীর চিত্ত মুগ্ধ করে, তেমনি সৌন্দর্য্য-প্রিয় দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সম্মুখে গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশ, আপনারা সকলে না হইলেও অনেকেই নিজ নিজ পল্লীনিবাসে যাইবেন, তাহার পূর্ব্বে চৈতালি রবি-শষ্যের সুন্দর ছবিগুলি, একবার মনে আঁকিয়া লইতে অনুরোধ করি, সেখানে চারিদিকের দৃশ্য সমাবেশে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই কবিতার সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার সুযোগ পাইবেন। আমি সব কথা বলিলাম না, কতকটা বিচারের ভার আপনাদের উপর দিলাম।

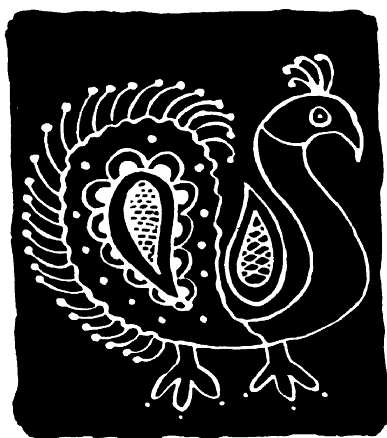
যদিও আমাদের সে পল্লী-জীবন আর নাই, রোগে দারিদ্র্যে তাহা পীড়িত, তবু আকাশে তেমনি বর্ণ সমাবেশ হয়, শ্যামলিমা লুপ্ত হয় নাই, সহজ জীবন-যাপন বিরল নয়, আবার এই মহা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অনেকের মন ব্যথাক্লিষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। তাই চৈতালির শেষ, "বিদায়" কবিতাটি উদ্ধার করিয়া আমার আলোচনা সমাপ্ত করিলাম।

হে তটিনী সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মতো ; —উদার গগন
অলিখিত মহাশাস্ত্র— নীল পত্রগুলি
দিক্ হতে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি' ;

শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্চলে
সত্যের স্বরূপখানি নির্ম্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি ; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীতশিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজি লইতে বিদায়
তোমা-সবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত্ত আলিঙ্গনে
নির্জ্জনলক্ষ্মীরে। শুভশান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব।*

বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩

* রবীন্দ্র পরিষদে পঠিত।



চতুর্থ পর্ব

ছোটদের জন্য

চতুর্থ পর্ব : ছোটদের জন্য

ফুল[১]

ওরে প্রিয় ফুল তুলনা ত নাই,
কি তুলনা দিব মিছা কি বর্ণিব
অতুলন তুমি বলেছে সবাই।

হাসিমাখা কোমল ফুল আমি বড় ভালবাসি, আমার কাছে ইহার বিকশিত সুন্দর ভাব বড়ই ভাল লাগে। যখন ফুলগুলি তাহাদের ক্ষুদ্রবৃক্ষে হাসিয়া হাসিয়া দুলিয়া দুলিয়া খেলা করে, তাহা দেখিয়া হৃদয় প্রফুল্লতাপূর্ণ হয়, প্রাণ যেন অপার্থিব ভাবে ভরিয়া যায়। জগতে এমন কি আছে যাহা ফুলের সহিত তুলনা হইতে পারে! গৃহ উদ্যানে হসিত শিশুমুখ, হৃদয়ে ধর্ম্মভাব এবং কাননে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি, এই তিনই এক, একই তিন। যখন প্রাতঃশিশির-সিক্ত কুসুমগুলির উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, তখন তাহা দেখিয়া ভাবি, জগদীশ্বর যদি এই লাবণ্যকণা মধুর কুসুম সৃজন না করিতেন, তবে মনুষ্য নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইত কি দেখিয়া? কে তাহাদের হৃদয়ে শান্তি-কাহিনী ও ঈশ্বরের দয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিত!

ফুল দেখিলেই তাঁহার কথা মনে পড়ে, তাঁহারই অনন্ত প্রবাহিত স্নেহস্রোতে যেন হৃদয় ভাসিয়া যায়। বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া কেবল সেই দেব মহাদেবকে ধরিতে চাহি। ফুল নিজের সুখের জন্য ত ফোটে না, পরকে সুখী করিবার জন্য মধুর হাসি হাসিয়া, প্রাণের পরিমল বাতাসে মিশাইয়া থাকে! তাদের দুদিনের ক্ষুদ্র জীবনও পরকে সুখী করিয়া শেষ হয়। তাই ভাবি আমরা কেন এই সংসারে আসিলাম? নিজকে ভুলিয়া পরের জন্য খাটিয়া ক্ষুদ্র প্রাণটা কেন পরসেবায় নিয়োজিত করিয়া সুখী হই না? এই সুখদুঃখময় পৃথিবীতে এই দীর্ঘ জীবনে কেবলই কি নিজের স্বার্থময় সুখ ভাবিব? ফুলের মত পরকে সুখী করিয়া চলিয়া যাইতে পারিব না? পবিত্র পুষ্প দেবসেবার যোগ্য হইয়াও হতভাগ্য নরজাতিকে সুখী করিতেছে। নীরব নিশীথে যখন তারা খসিয়া পড়ে, তখন আমার ফুলের কথা মনে পড়ে—আবার যখন মাতৃকোল খালি করিয়া সুন্দর শিশু চলিয়া যায়, তখনও ফুলকেই ভাবি। শিশুর হাস্য—তারকার স্নিগ্ধ জ্যোতি, দুই প্রাণে ধরিয়া ফুল সকালে ফোটে, বিকালে মরিয়া যায়, কিন্তু পরসেবা কখন ভোলে না। সকল দিন অন্যের মুখ চাহিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে কখন বা বরষার বারিপাতের ভিতর রহিয়াও ফুটিয়া থাকে। ঐ ফুলের অনুকরণীয় জীবন

যদি আদর্শ করিয়া চলিতে পারি, তবে এ কন্টকিত সংসার পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখনও ফুলকে বড় ভাল বাসিতাম—এখনও বাসি। আমি একক, সে যেন আমার সহোদর সহোদরা স্থানীয়—আমি আর কিছুই চাহি না, ফুলের মত পবিত্র জীবন লইয়া পরসেবায় এই অস্থায়ী জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। ফুল ! তোমাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি যেন জগতের ভাই বোনকে ভাল বাসিয়া মরিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ তুমি আমার জন্য পরম পিতার কাছে ভিক্ষা করিয়া আমাকে দেও। আমি সেই আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া হৃদয় প্রেমজলে সিক্ত করিয়া পরসেবায় খাটিয়া মরিয়া যাই।

বামাবোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১২৯২

গ্রীস এবং রোমের পুরাণ কাহিনী

১

মেঘাতীত রাজ্য

বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে, যে স্থানকে আমরা গ্রীস বলিয়া জানি, সেখানে অসম সাহসী বীরপুরুষগণ এবং অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী সকল বাস করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের সেই দেশকে পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন এবং সূর্য্যাস্তের মহিমা, চন্দ্রোদয়ের সুষমা, ঋতুপর্য্যায়ে প্রকৃতির অবিরাম মনোরম বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রবাহ, তাঁহাদের মন আনন্দ এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত। তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন এবং মুখে বলিতেন, 'নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জাতি অদৃশ্য ভাবে উচ্চতর রাজ্যে বাস করেন, তাঁহারাই এই সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, এই সমুদ্র, নদী, বন, উপবন সমূহের অধিপতি, তাঁহাদের শক্তি অশেষ ও সীমাহীন, তাঁহারা চিরানন্দময়, ক্ষমতাশীল এবং মঙ্গলময়, তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাঁহাদের ইচ্ছা দ্বারাই এই বিশ্ব জগৎ পরিচালিত, তাঁহারাই আমাদের এই সুখ দুঃখের বিধাতা, আইস আমরা সকলে তাঁহাদের জয় কীর্ত্তন এবং পূজা করি।'

গ্রীস দেশের উত্তর প্রান্তে সমুচ্চ ও মহান একটি পর্ব্বত আছে, তাহার নাম অলিম্পাস (Olympus)। এই পর্ব্বত গাত্র সুশ্যাম ঘন বন শ্রেণী দ্বারা আচ্ছাদিত এবং পর্ব্বতের শিখর দেশ এতই উচ্চ, যে মেঘ শ্রেণী ভেদ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, মানবের দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিতে পারে না। কোন গ্রীক কখনও সেই পর্ব্বত চূড়ার শিখর দেশে উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের দেবদেবীগণ, গ্রহ নক্ষত্র খচিত সেই মেঘ রাজ্যে বাস করেন। এই দেবদেবীগণের বাসগৃহ রত্নকাঞ্চনোজ্জ্বল স্তম্ভ শ্রেণীর দ্বারা ধৃত এবং সুবর্ণ রজত সিংহাসনে পরিপূর্ণ বলিয়া তাঁহারা কল্পনা করিতেন। এই দেব প্রাসাদের প্রাচীর সমূহ তাঁহারা এমন সুন্দর ছবির দ্বারা আবৃত বলিয়া মনে করিতেন, যে ছবি মানবের ক্ষীণ হস্ত কখনও অঙ্কিত করিতে পারে না, যে ছবির প্রতিচ্ছায়া কখনও কখনও আমরা সূর্য্যাস্তকালে ক্ষণিকের জন্য সহসা আকাশে

প্রতিফলিত হইতে দেখিতে পাই, যখন সুকুমার পক্ক ধান্যশীর্ষের ন্যায় পীতাভ মেঘমালিকাগুলি অস্ত শৈলে মিলাইয়া আসে এবং আমাদের অনিমেষ নেত্রের সম্মুখে নিমেষে নিমেষে বিচিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সেই মেঘাতীত রাজ্যে চিরবসন্ত বিরাজিত, সে রাজ্যে বর্ষা এবং শীতের প্রবেশ অধিকার ছিল না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পাখীদের মধুর সুমঙ্গল সঙ্গীত ধ্বনিত হইত এবং সারা বৎসর ধরিয়া কত সুন্দর ও কত সুগন্ধ ফুল ফুটিয়া থাকিত।

সূর্য্য চন্দ্রের এই মহামহিমাময় ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তাগণ আপনাদের চির মনোরম দেব প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া কখনও ধূলিময় এই পৃথিবীর দরিদ্র মানব সন্তানদিগকে দেখিতে আসিতেন, হয়ত যদি বড়ই দয়া হইত, তবে বহু বর্ষ পরে যুগযুগান্তে নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিতেন, নতুবা সাধারণতঃ পরিচিত হইবার ভয়ে কোন জীব কিম্বা মানবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিতেন। গ্রীসবাসিগণ, যাঁহাদের রচিত পুরাণ কথা আজ তোমাদের বলিতেছি, বিশ্বাস করিতেন, অন্যায় করিলে এই দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হয়েন এবং দোষীকে পীড়া মৃত্যু কিম্বা কোন বিপদপাতে দণ্ডিত করিয়া থাকেন ; কিন্তু যাহা ন্যায় এবং কর্ত্তব্য তাহা পালন করিলে দেবতাগণ প্রীত হইয়া সেই সুশীল মানবকে ঐশ্বর্য্য সুখে গৌরবান্বিত করেন। গ্রীকগণ এই সকল দেবতার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে তাঁহাদের ভাস্কর খোদিত স্বর্ণ এবং হস্তীদন্তের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি সকল স্থাপন করিতেন। দুঃখ দুর্দ্দিনে সেখানে তাঁহারা দেবতাদিগের নিকট সান্ত্বনা ও নির্ভরের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং সুখে ঐশ্বর্য্যে তাঁহারা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিবিধ উপচারে পূজার নৈবেদ্য দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন। এই দেবতাদিগের যিনি সর্ব্বপ্রধান, তাঁহার নাম জুপিটার, তিনি সমভাবে দেব ও মানবকে শাসন করিতেন। তিনি বজ্রধারী, তাঁহার নিক্ষিপ্ত বজ্র নির্ঘোষে বিশ্বচরাচর কম্পান্বিত হইত, তিনি আকাশ, বাতাস ও সিন্ধু স্রোতের নিয়ামক, এক কথায় বলিতে গেলে তিনিই ত্রিভুবনপতি, দেব সম্রাট। তাঁহার পত্নী জুনো স্বর্গের সাম্রাজ্ঞী এবং সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর সহকারিণী। জুনোর বিষয় সব কথা যখন শুনিবে, তখন কখনই তোমরা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিবে না, কেননা তিনি বড় স্বার্থপর এবং পরশ্রীকাতর এবং এই স্বভাবের লোকের মত সদা সর্ব্বদাই আপনাকে এবং অপরকে বিশেষ অসুখী করিতেন। কলাপী ময়ূর তাঁহার বড় প্রিয়, সর্ব্বদাই তাহার একটি তিনি কাছে করিয়া রাখিতেন। জুপিটার এবং জুনো ভিন্ন আরও অনেক দেবদেবী ছিলেন, তোমরা ক্রমে যখন তাঁহাদের কাহিনী শুনিবে, তখন তাঁহাদের সহিত তোমাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

আপলো (Apollo) তপন, সঙ্গীত, এবং প্রেমের দেবতা। ইনি পরম সুন্দর, যদিও দেবতাগণ সকলেই সুন্দর ছিলেন, কিন্তু আপলো সৌন্দর্য্য প্রভাবে সর্ব্ব দেবতাকে পরাভব করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তিনি তাঁহার স্বর্ণময় সূর্য্য রথ আকাশ পথে চালনা করিতেন, এবং বীণা যন্ত্রে মনোমুগ্ধকর সুমধুর রাগিণী বাজাইতেন, সর্ব্বপ্রকার ক্ষত আরোগ্য করিতে পারিতেন এবং তাঁহার হস্ত নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ সায়কগুলির লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না।

ইঁহার যমজ ভগ্নী ডায়েনা (Diana) চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আপলো অস্ত

শৈলে বিশ্রাম লাভ করিলে ডায়েনা রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া আকাশে আপনার রৌপ্যরথ চালনা করিতেন। এই দেবী অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন, দিবাকালে কটি-দেশে তীক্ষ্ণ শরপূর্ণ তূণ বাঁধিয়া দ্রুতগামী সারমেয় দল সঙ্গে লইয়া ছায়াময় শ্যাম বনশ্রেণীর মধ্যে মৃগয়া করিতেন। সুন্দরী কুমারীগণ এবং বনলক্ষ্মীগণ ইঁহার পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিত। দেবতাদিগের মধ্যে আপলো যেমন সৌন্দর্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তেমনি দেবীগণের মধ্যে ভিনাস (Venus) সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন, ইনি সৌন্দর্য্য এবং প্রেমের রাজ্ঞী। সৃষ্টির কোন এক অপূর্ব্ব সুন্দর প্রত্যূষে আকাশ যখন সূর্য্য-কিরণ-লেখায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, তখন ইনি সমুদ্র বক্ষে বাষ্পসুকুমার ফেনজালের মধ্য হইতে সহসা উত্থিত হয়েন, অমনি সমুদ্রদেবতা নেপচুন (Neptune) সমুদ্রকন্যকা, জল দেবতা এবং জল নিবাসী অসংখ্য জীব জন্তু শঙ্খ শম্বুক প্রভৃতি এই সুন্দরী রাজ্ঞীর বন্দনা গানে আকাশ ধ্বনিত করিয়া তোলেন।

ইঁহার একটি মাত্র শিশু পুত্র কিউপিড (Cupid) প্রেমের দেবতা, ইঁহাকে কখনও ধনুঃশর ভিন্ন দেখা যাইত না, তাই ইঁহার অপর এক নাম ধনুকদেব। এই শরগুলি যে কি অপরূপ, সে কথা পরে জানিতে পারিবে। কিউপিড অন্য দেব-শিশুদিগের মত আর বড় হইয়া উঠেন নাই, চিরকালই নধর সুন্দর ননীর পুতলিটী থাকিয়া গিয়াছিলেন। দেবরাজ জুপিটারের ভ্রাতা নেপচুন পৃথিবীবেষ্টিত সপ্ত সমুদ্রের অধিপতি, সমুদ্র দেবতাগণ, মৎস্যনারী সকল, নদ নদীর দেবতাবর্গ ইঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন প্রজা। তরঙ্গ উচ্ছ্বাসের বহু নিম্নে অতল সমুদ্রগর্ভে শঙ্খ, শম্বুক, মুক্তা, প্রবাল খচিত ও শৈবাল আচ্ছাদিত এই দেবতার প্রাসাদ বিরাজিত।

মিনার্ভার (Minerva) কথা ভুলিলে চলিবে না। ইনি জ্ঞান এবং সংগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পেচক ইঁহার প্রিয়পক্ষী, বয়ন এবং সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি এই কার্য্যে কাটাইতেন।

ইহা ভিন্ন মার্কারি (Mercury), তিনি দ্রুতগামী ছিলেন। ইঁহার অপর এক নাম চিরদ্রুত। ইঁহার পাদুকায় দুটি পক্ষ ছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী পক্ষীদিগের অপেক্ষাও ইনি শীঘ্র চলিতে পারিতেন। এই পাদুকা ভিন্ন ইঁহার পক্ষবিশিষ্ট একটি টুপি এবং যুগল সর্প জড়িত একটি যাদুদণ্ড ছিল, ইহার প্রভাবে তিনি অদ্ভুত আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিতে পারিতেন। ক্ষিপ্রগতি এবং যাদু কৌশলের জন্য দেবতাগণ ইঁহাকে দূতরূপে বরণ করিয়াছিলেন এবং স্বর্গ কিম্বা মর্ত্ত্যে কোন সংবাদ লইয়া যাইতে হইলে ইনি দেবদূত স্বরূপে যাইতেন।

আলোক ও সৌন্দর্য্যময় এই স্বর্গরাজ্য ভিন্ন পৃথিবীর অভ্যন্তরে রসাতলে এক অন্ধকার রাজ্য ছিল, তাহার নাম হেডিস (Hades)। গ্রীকগণ বিশ্বাস করিতেন, মৃতেরা এই রাজ্যে প্রয়াণ করেন। এই রাজ্যের রাজা প্লুটো (Pluto), তিনি তাঁহার নিরানন্দ প্রাসাদে নিতান্ত একাকী বাস করিতেন এবং এক সময় এই সঙ্গহীন জীবন একান্ত কষ্টকর বোধ হওয়ায় তিনি এই নিঃসঙ্গ রাজ্যে বাস করিবার জন্য Ceres -কে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেরিস (Ceres) পৃথিবী দেবী। পৃথিবীবাসীগণ তাহাদের শস্যক্ষেত্র এবং

ফলোদ্যানের জন্য ইঁহারি দয়া এবং দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিত।

সর্ব্বশেষ প্যান (Pan), ইনি বনভূমি এবং মেষপালকদিগের দেবতা, তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তি, অর্দ্ধ-ছাগ এবং অর্দ্ধ-মানব, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। বিশেষ রূপে ইনি মেষপালকদিগের প্রিয় ছিলেন, ইনি তাহাদের মেষপাল রক্ষা করিতেন এবং বেণু বাজাইয়া তাহাদের নৃত্য গীত ও আমোদ উৎসবে যোগ দিতেন।

যদি গ্রীকদিগের পুরাণে আছে, এই সকল দেবতা এই পৃথিবীর বনে, জলে বিহার করিতেন। সেই মেঘরাজ্যে গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিবাসী এই সকল দেবতাদিগের জীবন স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্ন প্রাসাদে থাকিয়াও তাঁহাদের মানব পূজকদিগের মতই সুখে দুঃখে মিশ্রিত ছিল।

মুকুল, আশ্বিন ১৩১৫

দুটি নক্ষত্রের কথা (The Great Bear and the Little Bear)

আজ যে রমণীর কথা তোমাদের বল্‌ব তাকে তোমরা নিশ্চয়ই ভালবাস্‌বে, কেননা ক্যালিষ্টো (Callisto)[২] আর তাঁর ছোট ছেলে আর্কাসকে (Arcas)[৩] প্রায় সকলেই ভালবাসত। তিনি রূপে সকলেরি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন, তাঁর স্বভাবটি বড় প্রফুল্ল ছিল, যখন দলবল সঙ্গে শীকার করতে যেতেন, তখন তাঁদের হাসি, আর গানের মধুর শব্দে বনভূমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত। বনে বনে ঘুরে বেড়াতে তাঁর বড় ভাল লাগ্‌ত, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি, পাখীর গান, প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল ফুল এই সবই তাঁর আনন্দের কারণ ছিল। এই সুন্দরী পৃথিবীকে দেখে তাঁর মন যেমন আনন্দে ভরে উঠ্‌ত, হেসে গান গেয়ে সেই আনন্দ প্রকৃতিকে উপহার দিতেন, প্রকৃতিও যেন তেমনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছিলেন, জীবনে তাঁর কোন অভাব বা দুঃখ ছিল না, ক্যালিষ্টো আর তাঁর ছেলেকে তাঁর বন্ধুরা তো ভালবাস্‌তেনই, কেবল দেবরাজ্ঞী জুনো তাঁদের উপর বিরূপ ছিলেন. কে জানে কেন জুনো তাঁকে একেবারে দেখতে পারতেন না। ক্যালিষ্টো যত সুন্দর হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন জুনোর আক্রোশ ততই বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। একদিন তিনি বনে বনে গান গেয়ে শীকার করে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় জুনোর সঙ্গে দেখা হল, বনের সৌন্দর্য্যের মধ্যে এই অপরূপ সুন্দরীকে দেখে সেই দেবীর মন যেন বিষে ভরে উঠ্‌ল, তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না, হাত তুলে ক্যালিষ্টোকে লক্ষ্য করে কি যে যাদু মন্ত্র পড়লেন, অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর শুভ্র সুকুমার বাহুলতা ভালুকের মত হয়ে গেল, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা একটি প্রকাণ্ড রোমশ কুৎসিৎ ভালুকে পরিণত হলেন। বেচারা ক্যালিষ্টো, তাঁর শরীরটাই ভালুকের মত হল, কিন্তু মনটি মানুষের মতই রয়ে গেল। তিনি প্রতি সামান্য শব্দে ভয়ে আকুল হয়ে কখনও ঝোপের মধ্যে কখনও পর্ব্বতের গুহায় লুকাতে লাগ্‌লেন, পাছে কোন বন্য জন্তু এসে তাঁকে আক্রমণ করে, এই ভয়েই অস্থির। পনের বৎসর ধরে এমনি কষ্টে একা অসহায় ভাবে তাঁর জীবন কাটল। প্রকৃতির

সৌন্দর্য্য আর তাঁর মন আকর্ষণ করতে পারে না, পাখীর গান, নদীর কলধ্বনি, সুন্দর সূর্য্যালোক সবই তাঁর মিছে মনে হ'ত। কোন শোভাই তাঁকে মুগ্ধ করত না, কোন আনন্দধ্বনি আর তাঁর মনে সাড়া পেত না, বন্য ফলমূল, মধু আহার করে, নদীর জল পান করে, কোনরূপে গাছের কোটরে কিম্বা অন্ধকার পর্ব্বত গহ্বরে তাঁর জীবন কাটত। দিনের বেলা মাঝে মাঝে বনের ভিতরে, তাঁর সেই পূর্ব্বেকার মৃগয়া-সঙ্গীদের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেতেন, তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকতেন, পাছে তারা তাঁকে দেখতে পায়, কিন্তু দেখ্‌তে পেলে তারা যে তাঁকে চিন্‌তেই পারবে না একথা তাঁর মনে হ'ত না।

একা সেই শাপগ্রস্ত জীবনে ক্যালিষ্টো কতবার তাঁর ছোট ছেলেটির কথা মনে করতেন, আর ভাবতেন, মা-হারা হয়ে তার দিন না জানি কত কষ্টেই কাটছে, সুখে হৌক, দুঃখেই হৌক, দিন তো কারো জন্যে দাঁড়ায় না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পনের বৎসর চলে গেল, পনের বার শীতের পত্রহীন শীর্ণ তরুশাখাগুলি পুষ্প পল্লবে ও নবজীবনে সুন্দর, শোভন ও ছায়াময় হ'ল। আর্কাস এতদিনে সুকুমার শিশুকাল অতিক্রম করে সবল, সুস্থ, দীর্ঘকায়, সুগঠনদেহ ও সুন্দর, তরুণ যুবাপুরুষ হয়েছে, সে যে মায়ের ছেলে তা আর কাহাকেও বলে দিতে হত না, সেই অনুপম মুখশ্রী, আর মায়ের মতই মৃগয়া-প্রিয়। তার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ, শীকারী কুকুর, ছোরা, তীর, ধনুক নিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে কত বড় বড় কৃষ্ণসার হরিণকে ভূমিসাৎ করত। এমনি এক দিন তীর ধনুক নিয়ে একা বনের ভিতর শীকার করতে গিয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে একটি পলায়নপর হরিণের অনুসরণ করে যেতে যেতে তরুগুল্মশূন্য, পরিচ্ছন্ন ও স্বল্পায়তন ভূমিখণ্ডে এসে পৌঁছে দেখলে একটি ভালুক দাঁড়িয়ে আছে। এ ভালুকটি আর কেহ নয়, তারি মা ক্যালিষ্টো! ক্যালিষ্টো তাঁর ছেলের পদশব্দ শুন্‌তে পাননি, তাই আর সময় মত গাছের আড়ালে লুকতে পারেন্‌নি, কাজেই একেবারে তার সম্মুখে পড়ে গেলেন। যদিও পনের বৎসর তাকে দেখেননি, তবু দেখ্‌বামাত্র মা ছেলেকে চিন্‌তে পারলেন, আর আপন অবস্থা সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে অবাক্ হয়ে একদৃষ্টিতে তাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ক্ষুদ্র আর্কাস কি সুন্দর সবলকায় যুবাপুরুষ হয়েছে, তাঁর বড় ইচ্ছা হ'ল তাকে কিছু বলেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁর জন্তুর ভাষা শুনে আর্কাস কিছু বুঝবে না বরং আরো ভীত হবে, তাই কিছু না বলে শুধু তার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড ভালুকের সম্মুখে এসে পড়ে আর্কাস প্রথমটা একটু চমকে গিয়েছিল, কিন্তু সেই স্থির এক দৃষ্টি দেখে তার কেমন ভয় হতে লাগ্‌ল। সে দৃষ্টি এমন কাতর, ব্যাকুল ও বিষণ্ণ, যে তার দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনও কি একটা অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, কি যে করছেন, সেটা বিবেচনা না করেই ধনুকে শর সন্ধান করে ক্যালিষ্টোকে লক্ষ্য করলেন। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে দেবরাজ জুপিটার অকস্মাৎ সেখানে আবির্ভাব হয়ে আর্কাসের হাত হতে ধনুক তীর দুইই কেড়ে নিলেন। জুপিটার চিরকালই ক্যালিষ্টোকে বড় স্নেহ করতেন, আর জুনো যে অকারণে এই নির্দ্দোষ সুন্দরী নারীকে এমন দারুণ শাস্তি দিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর বড় কষ্ট হ'ত। এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতীকার করবার জন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্যালিষ্টো এবং আর্কাসকে দুটি সুন্দর

চিরদীপ্তিময় নক্ষত্র করে আকাশে স্থাপন করলেন। সেখানে কোনও নির্ম্মল তারকা খচিত রাত্রিতে খুঁজলে এখনও তোমরা তাদের দেখ্‌তে পাবে।

জুনো যখন এই দুটি উজ্জ্বল তারা আকাশে দেখ্‌লেন তখন তাঁর খুবই রাগ হ'ল। ক্যালিষ্টোর সুন্দর মানব শরীর বিকৃত করে দিয়ে তিনি তার প্রতি আপন ঈর্ষা আর ঘৃণা প্রকাশ করিলেন, তাতে তাঁরা চিরদিনের মত শ্রেষ্ঠ সুন্দর অমর হয়ে গেলেন। দেবরাজ যা করলেন তা ব্যর্থ করবার ক্ষমতা জুনোর ছিল না, কাজেই যতই রাগ হৌক, তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তখন সমুদ্র দেবতা নেপচুনের কাছে গিয়ে নিজের সব দুঃখের কথা বল্‌লেন, আর তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন কখনো তাহাদের দুজনকে তাঁর সমুদ্র প্রাসাদে প্রবেশ করতে না দেন। তোমরা যদি কখনো সমুদ্রে যেতে যেতে বিশেষ লক্ষ্য করে দেখ তাহলে দেখ্‌বে যত রাত্রি অধিক হবে. আকাশের নক্ষত্রগুলি যেন ক্রমে দিগন্ত প্রান্তে নেমে একেবারে সমুদ্রে প্রবেশ করে। জুনো এইজন্যে নেপচুনকে অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি এই দুটি নূতন তারাকে কখনও তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করতে না দেন। নেপচুন এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন, কেননা সৃষ্টির প্রথম দিন হতে আজ পর্য্যন্ত এ দুটি নক্ষত্র কখনো অস্ত যায়নি।

মুকুল, কার্ত্তিক ১৩১৫

আমার ময়ূর

পাখী কে না ভালবাসে, তাদের গান, তাদের চলাফেরা, সুন্দর ভঙ্গী কার না মন হরণ করে ? বিশেষতঃ তাদের যা আছে আমাদের তা নেই ; তারা উড়তে পারে—পাখা মেলে দিয়ে আলোর আর বাতাস সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কোথায় চলে যায়—আমরা ঘরে বসে বসে দেখি, আমাদের মন উড়ু উড়ু করে, তবু গাছের মত এক জায়গায় পোঁতা হয়ে আমরা আমাদের মনের ডালপালা নেড়েই মরি, চল্‌তে পারিনে। তাই এই আকাশ বাতাসের সঙ্গী, বহু দেশ দেশান্তরের সংবাদবহদের, আমাদের বড় রহস্যময় মনে হয় ; তাদের সব খবর জান্‌তে ইচ্ছে হয়।

খাঁচায় পূরে রাখলে তাদের উপর একটু অত্যাচার হয়, তাই আমি একবার একটি ময়ূর পুষেছিলাম। সেটি যখন প্রথম এল তখন ছোট্ট কচি ময়ূরবাচ্ছা— ময়ূরছানা কি মুরগিছানা বোঝা কঠিন। কথায় বলে, ও যেন একটি ময়ূরছানা—তার মানে বাচ্ছা বয়সে কুশ্রী, ক্রমে সুন্দর হয়ে ওঠে। এরও তাই হ'ল—প্রথম যখন এল তখন না ছিল তার মাথার উপরে বঙ্কিম চূড়া, না ছিল তার চাঁদের টুকরো দিয়ে সাজান, ছড়ান বিচিত্র পুচ্ছ। গায়ের বর্ণ একেবারে মাটির মত, শুক্‌নো ঘাসের মত।

ভাল করে খেতে পার্‌ত না, তাই তাকে হাতে করে খাইয়ে দিতে হ'ত। নিজের শক্তি নেই, তবু লোভটি পূরোপূরি ছিল—মুখে যতটা ধরে, খাবল দিয়ে তার চেয়ে বেশী মুখে পূরে, তারপর গিল্‌বার সময়ই মুস্কিল। তখন চোখ বুজে, ঘাড় বাঁকিয়ে, অনেক

চেষ্টায় সেটি গলাধঃকরণ হ'ত, হবামাত্র আর সে কষ্টের কথা মনে থাক্‌ত না, দ্বিতীয় গ্রাসটি নেবার সময়ও ঠিক্ ঐ ব্যাপার। তোমাদেরও বাপু কারো কারো ঐ দোষ আছে—মুখে যতটা ধরে তার চেয়ে ঢের বেশী ভরে', বিষম খাবার যোগাড় কর ; ওটা ভাল অভ্যাস নয়। দিব্যি পেট ভরে খেয়ে কিছুকালের জন্যে সে নড়াচড়া বন্ধ করে এক কোণায় পড়ে থাক্‌ত। চিংড়ি মাছ আর মোটা ভাত খেতেই সে বেশী ভালবাস্‌ত, তার ফল, ধান চালের উপর তেমন আগ্রহ ছিল না।

খাবার যত্নে সে শীগ্‌গিরই বেশ বেড়ে উঠ্‌ল। তখন তার সর্ব্বাঙ্গে রংএর লীলা দেখা দিল—মাথার চূড়াটি বেড়ে উঠে সোনালি সবুজে ভরে উঠ্‌ল, বাতাসে সেটি যখন কাঁপ্‌ত তখন সুন্দর দেখাত। গায়ের মাটীর বর্ণ সোণালি সবুজে নীলে মিশিয়ে যাকে ধূপছায়া আর ময়ূরকণ্ঠী রং বলে, তাই হ'ল—একটু নড়াচড়া কর্‌লে নীল বিজুলি আলোকশিখার মত একটি কিরণ তার গায়ের উপর ঢেউ খেলিয়ে যেত। পুচ্ছটি যেমন বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল, তেম্নি তাতে নীলকান্ত মণির খণ্ড খণ্ড চাঁদ দেখা দিল।

তার চেহারা যেমন চোখ্ ভুলান, ধরণধারণ, গতিভঙ্গী, তেমনি মন ভুলান হল। ভারী দুষ্ট ; অতিশয় মিষ্টি। আমি সকালে যখন ভাঁড়ার দিতে, তরকারী কুটতে যেতাম, সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ত। তার বরাদ্দ চাল ধান তার পছন্দ হ'ত না, আমার গোছান জিনিষ ঠুকরে চারিদিকে ছড়িয়ে দিত—দাসীরা যদি তাড়া দিত, তবে উল্টে তাদের তাড়া করত। আমি বক্‌লে কিম্বা মারবার ভাণ করলে, দাঁড়িয়ে চোখ মিট মিট করত ; হয়ত বা আরো দুষ্টু হয়ে বেশী করে ছড়িয়ে দিয়ে, পাখা ছড়িয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াত—ভাবখানা যে, 'আমায় বুঝি মার্‌বে ? মারতে আর হয় না !' মারতে আর হ'ত নাই সত্যি, তার দুষ্টুমিষ্টি ভাব দেখে, তাকে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছে করত—আমি শুধু হাস্‌তাম। আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে সে আদুরে ছেলের মত আবদেরে হয়ে উঠেছিল—সমস্ত ক্ষণ পায়ে পায়ে ফিরত—কাজ কর্ম্মের সময় তার দিকে মন দিতে না পারলে কাপড় ধরে টানত। আমি যখন বসে বসে লিখ্‌তাম, আমার চৌকীর হাতায় এসে বস্‌ত। তবু যদি তার দিকে না চেয়ে দেখ্‌তাম, তাহলে আমার হাতে ঠোকর দিত, এলো চুলের গুচ্ছ ধরে টান্‌ত—কাজেই অমনোযোগের ভাণ বেশীক্ষণ রক্ষা করা কঠিন হ'ত।

যখন সে ছোট ছিল তখন তাকে রাত্রিবাসের জন্য একটি বড় ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা দিয়ে ঘরের এক পাশে রাখা হ'ত, কিন্তু যত বড় হতে লাগ্‌ল ততই এরকম আটক থাক্‌তে আপত্তি দেখাতে আরম্ভ কর্‌ল। তখন তাকে ছেড়ে রাখা হ'ত—সন্ধ্যার একটু আগেই ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে, ছাদের পাশেই প্রকাণ্ড এক দেবদারু গাছে আশ্রয় নিত। সেখানেই রাত্রিযাপন করত। ভোর হলেই, তার সাড়া পাওয়া যেত, তখন আর সে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আস্‌ত না—পাখা মেলে মহানন্দে উড়ে নেমে আস্‌ত। প্রথমটা খানিকটা বাগানময় ডানা মেলে ছুটোছুটি করে বেড়াত। তারপর প্রাতরাশ সমাধা করে, মাটীর উপর বুক দিয়ে জড়সড় হয়ে রোদ পোয়াতে খুব ভালবাস্‌ত। দিনের মধ্যে খেলাধূলো লাফালাফি দুষ্টামির মাঝে মাঝে প্রায়ই এমনি নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ থাক্‌ত।

নিজে স্বাধীন ভাবে চলে ফিরে বেড়াত, তাই খাঁচায় পোরা পাখী সে আদপেই দেখ্‌তে ভালবাস্‌ত না। আমার একটি কেনারি, একজোড়া চীনে টিয়া আছে আর একটি ময়না ছিল। ময়নাটি বড় সুন্দর, পাহাড়ী ময়না, সচরাচর ময়নার চেয়ে অনেক বড়—গলার স্বর গম্ভীর, বেশ স্পষ্ট কথা কইত। আমি তাকে বন্দে মাতরং বল্‌তে শেখাচ্ছিলাম—দু ছত্র শিখেছিল। এমন মন দিয়ে শুন্‌ত যে অল্প সময়ের মধ্যেই শিখ্‌তে পারত। এই পাখীটিরে বন্ধ থাকা দেখ্‌তে ময়ূরের মোটেই ভাল লাগ্‌ত না, দু তিনবার তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল ; কৃতকার্য্য হয়নি। পাহারা বড় কড়া ছিল। একদিন দুপুরে সবাই শুয়েছে, আমি আমার ঘরে বসে পড়ছি—বারান্দায় একটা খুব ঝটাপটির শব্দ শুন্‌তে পেলাম—আমি মনে করলাম ময়ূরচন্দ্র নৃত্য করছেন, একবার ভাবলাম উঠে দেখি, কিন্তু হাতের বইয়ে মন একেবারে ডুবে ছিল, ওঠা সহজ হ'ল না। কিছুক্ষণ পরে দাসীরা খেয়ে এসে বল্লে, 'ওমা ময়না কোথায় গেল' —ময়ূর তার খাঁচা খুলে তাকে বিদায় করে দিয়েছে—আকাশের পাখী খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে সেকি আর থাকে, কোথায় উধাও হয়ে গেল—আর ফিরে এল না।

যতদিন ময়ূর ছোট ছিল, বাড়ীর বাগানে বেড়িয়েই তার মন ভর্‌ত কিন্তু যত বড় হতে লাগ্‌ল ততই চঞ্চলতা দেখা দিলে—বাড়ী ছেড়ে প্রতিবেশীর ওখানে যেত, তারপর মালী গিয়ে তাকে খুঁজে খুঁজে বাড়ী আনত ; অগত্যা দিন কত পাখা বেঁধে রেখে দিতে হয়েছিল। বাড়ীতেই থাক্‌ছে দেখে আবার খুলে দিলাম, একদিন ভোরে উঠে ময়ূরের আর দেখা নাই। আমাদের বাড়ীর এক পাশে একটি বসতি আছে, অনেক মুসলমানের বাস—আমি মনে করলাম, তারাই বুঝি ধরে রেখেছে। খোঁজ করে জান্‌লাম, আমার সন্দেহ ভুল, বরং ময়ূর পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তারাই চারিদিকে খুঁজতে দৌড়িল। আশা যখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি—বেলা প্রায় ১টা—এমন সময় একজন ময়ূর কোলে করে এসে উপস্থিত হল। হারাধন পেয়ে ভারী আনন্দ হয়েছিল কিন্তু একটু পরেই তার অবস্থা দেখে সব আগ্রহ কোথায় চলে গেল। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার উৎসাহে ময়ূর সেদিন, আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকের একটা প্রকাণ্ড পুকুর পার হয়ে, যাদের বাড়ী উঠেছিল তাঁরা জর্ম্মাণ—তাকে ধরে বাক্‌সে পূরবার চেষ্টায়, একখানি পা একেবারে ভেঙে দিয়েছেন—আমাদের লোক হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হলে, তাকে কাবাব করবার বন্দোবস্ত হচ্ছিল।

কিছুদিন খুবই কষ্ট ভোগ করে একদিন ভোর বেলা তার সব কষ্টের অবসান হল। যত দিন বেঁচে ছিল—প্রতিদিন যখন গরম জল দিয়ে ধুইয়ে ওষুধ বেঁধে দিতাম কোন আপত্তি করত না, এত যে তার দুষ্টামি সব যেন কোথায় চলে গেল। এমন নরম হয়ে থাক্‌ত, দেখ্‌লে বড় কষ্ট হ'ত—যদি বল্‌তাম তোর পা দেখি—অম্নি কাৎ হয়ে শুয়ে পা দেখাত। যখন ময়ূরটা মরে গেল তখন মনে মনে বল্লাম আর পাখী পুষব না—আজ কিন্তু ভাবছি তেম্নি একটি যদি পাই তবে আবার পুষি।

সন্দেশ, শ্রাবণ ১৩২০

'কালা'

যার কথা বল্‌তে যাচ্ছি তার নাম 'কালা'—সে কিন্তু গোরা দেশেরি জীব, একটি অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া। কালো সে বটে, একদম্ 'কালা আদমি'—কপালে দুধের রংএর একটি টিপ ছাড়া তার শরীরে কোথাও সাদার চিহ্নমাত্র নাই। এ টিপ সহি করে তার দেশ-মা যেন তার জাতীয়ত্বের দলিল রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছেন, সে সনন্দ অপ্রমাণ করে আর কার সাধ্য। ঘোড়াটি দেখতে দিব্যি সুন্দর, কিছু সৌখীন, কিঞ্চিদধিক পরিমাণে খাম খেয়ালি। অভিজাত বংশীয় বলে তার বিশেষ অহঙ্কার আছে। কুলি মজুরের কালো কাপড়, মোট বইবার ঝুড়ি দেখলে একেবারে আঁতকে ওঠে। রাস্তায় তার নাকের পাশ দিয়ে হাওয়া গাড়ী ভোঁ ভোঁ করতে করতে গেলে, কিম্বা রাস্তা সারাবার এঞ্জিন গাড়ী যদি প্রবল শব্দে অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত অনবরত যাওয়া আসা করে, তাহলেও এ বীর তুরঙ্গম কিছুমাত্র বিচলিত হয় না ; কিন্তু ঝাঁকা মুটে বেচারী পাশ কাটিয়ে গেলেও, সে চমকে, থমকে দাঁড়ায় ; আর রাস্তার ধারে আঁচল-পাতা ভিখারিণীকে দেখলে ত আর রক্ষা থাকে না, একেবারে মুখ ফিরিয়ে অন্য পথে যাবার জন্যে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করে। তখন তাকে অনেক দিলাসা দিতে হয়, বলতে হয় 'গুড বয়, গো অন্' —সহিস তার পিঠ চাপড়ায়, কোচম্যান বলে 'চলো চলো' —আর মুনিব বলেন, 'আরে কালা কি দুষ্টামি করছিস্ শীগ্‌গির চল্' —অনেক স্তব স্তুতি এবং সেই সঙ্গে দুএকবার চাবুকেরও শব্দ হবার পর, স্থগিত যাত্রা আবার আরম্ভ হয়।

অভিজাত বংশীয় হলে কি হয়—কালার ক্ষুধা, নিবৃত্তি জানে না ; ভোর ছয়টায় সে একবার দানা খায়, আর কিছু পূর্ব্ব হ'তেই চীৎকার আরম্ভ করে, 'খাবার দাও', 'খাবার দাও'। যখন দেখে দরওয়ান ভাঁড়ার খুলে সহিসকে দানা ওজন করে দিচ্ছে তখন সে আরো অস্থির হয়, চীৎকার করে, লাফায়, আবার এক এক দিন আস্তাবলের দরজার বাঁশ পা দিয়ে তুলে ফেলে, বাহিরে দৌড়ে আস্‌তে চায়। এর জন্যে তার শাসন যে হয় না তা নয়, তবে তাতে কোন ফল হয় না—আবার বেলা একটায় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সেই একই অভিনয় চলে। 'কালা'র কাঙালপনারও অন্ত নেই, আপন খাবার খেয়ে আশ মেটে না, শোবার বিচালি পর্য্যন্ত শেষ করে। এটা ক্ষুধা নয়ত লোভ, এর আর অন্ত কোথায়, 'যতই করিবে গ্রাস তত যাবে বেড়ে।' কালার এটা স্বভাব- দোষ, সংশোধন হওয়া দুস্কর—জানই ত কথায় বলে, 'ইল্লত যায় ধুলে আর স্বভাব যায় ম'লে'— কালা ম'লে বড় অসুবিধা, লোভী হয়েই বেঁচে থাকুক, কি করা যায় বল ?—কালা লোভী হলেও, তার আরও সদ্‌গুণ আছে। সে কুকুরের মত বাড়ী পাহারা দিতে জানে। অজানা লোক বাড়ীর ভিতর ঢুকলে, কিম্বা আস্তাবলের কাছে গেলে, সে চীঁহি চীঁহি সুরে এম্নি বাঁশরী বাজাতে আরম্ভ করে, যে, চাকর বাকর যে যেখানে আছে সবাইকে ঘরের বার ক'রে তবে সে ছাড়ে। অপরিচিত লোকটির সদ্‌গতি না করে কালা আর সুস্থির হয় না। তার চলন ভঙ্গীটি বড় সুন্দর, সে যখন ঘাড় বাঁকা করে, কাঁধের চুল নাচাতে নাচাতে, সমুদ্রের

তরঙ্গের মত দুলতে দুলতে দৌড়ে যায়, তখন তাকে বড় চমৎকার দেখায় ; যে দেখে সে বাহবা না দিয়ে থাক্‌তে পারে না। কাজে তার আপত্তি নেই, যত দূরই নিয়ে যাও না খুসী মনেই যায় ; তবে রাস্তা সম্বন্ধে বাচ-বিচার আছে। কলিকাতার লাল রাস্তা আর গঙ্গা কিনারায় হাওয়া খাওয়াটাই তার পছন্দসই—সহরের কাছাকাছি পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথ, আর ধেনো জমী, আদপেই তার মনে ধরে না ; সে দিকে যেতে হলে হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টায় থাকে—কিন্তু শেষ অবধি জিদ্ বজায় রাখতে পারে না, কি করে রাখবে বল, পরাধীন ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ি দিয়ে গাড়ীর গায়ে বাঁধা, সহিসের তম্বি ; কোচম্যানের চাবুক, সবাই মিলে তাকে কাবু করে ফেলে ; তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চালকের ইঙ্গিত মত ছুটে চলে। রাস্তায় মধ্যে যদি কোথাও আটকান জল কিম্বা কলার পাতা কি বাস্‌না পড়ে থাক্‌তে দেখে তবে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে ; তার আকার প্রকার দেখলে বেশ বোঝা যায় ভারী ভয় পেয়েছে ; সেখানে আর দাঁড়ায় না কি তাকায় না, একেবারে প্রাণপণ করে ছুটে চলে ; কতক্ষণে এ বিভীষিকা এড়িয়ে যাবে, এই তার একান্ত চেষ্টা হয়। আর সে ভয় করে নিজের ছায়াকে, জ্যোৎস্না রাতে যখন সওয়ারিতে যায়, তখন সে এই আপন ছায়াকে দেখে আর অবাক হয় ; কিছুই ঠাওর করতে পারে না ; এ সঙ্গী দাঁড়ালে দাঁড়ায়, ছুটলে আগ বাড়িয়ে যায়, কোন মতেই তাকে দূরে ফেলে যাবার যো নেই, যতই দৌড় দিক্ না বন্ধু সঙ্গে-সঙ্গেই চলে, তবু তার কেমন ভয় হয়, হয়ত বা এ তার বন্ধু নয় ; শত্রুই হবে বুঝি বা ! সে যায় আর ফিরে ফিরে দেখে, আলোর দিক অনুসারে ছায়াও দিক্ পরিবর্ত্তন করে, আর এই অবোধ জীবটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে তাই জ্যোৎস্নার চেয়ে অন্ধকারকেই পছন্দ করে বেশী, তখন এ নাছোড়বান্দা ছায়া তো সঙ্গে থাকে না, 'কালা' মনের আনন্দে চলে, নিজে কালো ; সে কালোকেই ভালবাসে, যেমন চোরে-চোরে মাসতুত ভাই। আলো ত তার জ্ঞাতি কুটুম্ব নয়, তাই তাকে দূরে রাখে। পরকে আপন করা চতুষ্পদের কর্ম্ম নয়।

'কালা' বড় আদুরে, সকালে সওয়ারি দিতে তার মন সরে না, তিনি চান সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়াটি যখন দেবে, তখন ফুলবাবুটির মত বেরোবেন। সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে দিব্যি আরামে জিরিয়ে জিরিয়ে প্রাতরাশের সদ্ব্যবহার করবেন, ধীরে ধীরে দেহ হতে ঘুমের আলস ছুটবে, তারপর সহিসের হাত ধরে আহ্লাদে আলালের ঘরের দুলালের মত, দুল্‌তে দুল্‌তে বেড়াতে যাবেন, এই তাঁর মনগত অভিপ্রায় ; কিন্তু কার্য্যগতিকে যে দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় সে দিন ভারী চটে যান। গাড়ী জুতবার সময় বার বার ফিরে ফিরে তাকায়, ভাবখানা, 'দেখ ত আমার ভোরের চা বুটির তোস সব পড়ে রইল, আমায় কোথায় নিয়ে যায় ?' তবে ফিরে এসে যখন মুখভরে আখ খেতে পায় তখন সে খুব খুশী হয়। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', এ কথা তো আমরা সবাই মানি, তা 'কালা' কোন ছার ?

সন্দেশ, অগ্রহায়ণ ১৩২৩

'হাইদর'[৪]

গতবারে তোমাদের 'কালা'র কথা বলেছি। 'কালা', গোরা দেশের জীব হয়েও, দেশের নাম রক্ষা করতে পারেনি, সে 'মিশির' মত, 'অমাবস্যা নিশির' মত আর 'গদাধরের পিসির' মত কালো।; আর "হাইদার" কালো আসিয়ার আরব দেশের জীব হয়েও বর্ণগৌরবে গোরার সমকক্ষ, সে একেবারে দুধের মত সাদা, ঘাড়ের চুলগুলি পর্য্যন্ত কালো নয়, ফিকে হলদে রেশমের মত। সে চুল ইংরাজী রূপসী পেলে গৌরব বোধ করতেন। হাইদরের সঙ্গে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ অবসর হয়নি, তবু তার প্রভুর কাছে যা শুনেছিলাম আর নিজে যা দেখেছিলাম তাই তোমাদের জানাব।

মধ্যপ্রদেশের একজন করদ, প্রায়-স্বাধীন রাজা তার রূপের খ্যাতি আর গুণের প্রশংসা শুনে তাকে বোম্বাই হতে বহুমূল্যে ক্রয় করে এনেছিলেন। তখন তার বয়স সবে চার বৎসর ; সেটা ঘোড়ার পক্ষে কিশোর বয়স। রাজার ঘরে এসেও হাইদরের অদৃষ্টে সুখ লেখা ছিল না, তার কপালের মাঝটিতে আর চার পায়ের গোড়ালিতে চারটি কালো ছাপ ছিল, এতে তাকে দেখতে আরো সুন্দর করেছিল, কিন্তু হলে কি হয়, ঘোড়ার পক্ষে নাকি এমন পঞ্চতিলক ধারণ সুলক্ষণ নয়। যার এমন থাকে সে 'রাক্ষসগণের' মত নিকটবন্ধুর প্রাণ হানি করে। ঘোড়া এল, রাজকুমার উৎসাহ করে তাকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন, সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রবিৎ পন্ডিতও ছিল ; রাজকুমার সুন্দর সুদর্শন অশ্বটিকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হলেন, তাকে যে কি আদরে রাখবেন ভেবেই পেলেন না। পন্ডিতজী কিন্তু অশ্বের কৃষ্ণ তিলকগুলি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, বল্লেন এ অশ্বকে কখনই অশ্বপালে স্থান দেওয়া হতে পারে না। এ একেবারে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত—যে গৃহে প্রবেশ করবে তাকে শ্মশানে পরিণত করে তবে ছাড়বে। রাজকুমার আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত, তিনি বল্লেন, 'এসব বাজে কথা,—ঘোড়া আমার রাজপুরীর শোভা বর্দ্ধন ছাড়া, কোন হানি করতেই পারে না, আমি একে কিছুতেই ছাড়ছিনে।' কিন্তু তাঁর জিদ বজায় রইল না, রাজমাতা যখন হাইদরের কুলক্ষণের কথা শুনলেন, তখন তাকে রাজপুরীর ত্রিসীমানার মধ্যে রাখা নিষেধ হয়ে গেল। পণ্ডিতের শাস্ত্র বচন লঙ্ঘন করতে কুমারের দ্বিধামাত্র হয়নি। কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করবার মত অসৌজন্য তাঁর স্বভাবে ছিল না, কাজেই হাইদর নির্ব্বাসিত হয়ে পল্লীর বহুদূরে একটি ভগ্নপ্রায় কুটীরে আশ্রয় লাভ করলে! দিনান্তে অপর্য্যাপ্ত আহার, অযত্নে অপরিস্কৃত স্থানে তার দিন যাপন হ'তে লাগল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য ক্রমে হ্রাস হয়ে এল।

এই সময়ে রাজ পরিবারে বড় একটি মামলা বহুদিন হতে চলছিল,—রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ ; তখন মধ্যপ্রদেশে নতুন রেলের লাইন নির্ম্মাণ হচ্ছিল। রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া মানে প্রকৃতপক্ষে সরকার বাহাদুরের সঙ্গেই ঝগড়া, সবাই ভীত তটস্থ, মীমাংসা কিছুতেই হচ্ছিল না। তাই যখন রাজকুমারের পাগড়ী ভাই আর রাজমাতার স্নেহপাত্র নতুন উকীল, 'বাবুসাহেব' তর্ক, যুক্তি, ও আইনের প্রমাণ

প্রয়োগে এ মামলা তাঁদের জিতিয়ে দিলেন তখন রাজপুরী উৎসবময় হয়ে উঠল। উকীল বাবুসাহেব ভালরকম 'ফী' তো পেলেনই, তার উপর পুরস্কারের ব্যবস্থাও হল ; মহারাণী নিজে তাঁর দুই হাতে সোণার বালা পরিয়ে দিলেন, আর বাবুসাহেব আরো যা চাইবেন তাই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। এই বাবুসাহেবটি ঘোড়া বড় ভালবাসতেন, তিনি হাইদরের কাহিনী শুনেছিলেন, আর স্বচক্ষে তার দুরবস্থা দেখে অবধি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল। তাই মহারাণী পুরস্কারের কথা বলবামাত্র তিনি ঘোড়াটিকে চেয়ে বস্‌লেন। এ কুলক্ষণ ঘোড়া রাজ্য হতে বিদায় করতে পারলে মহারাণী নিশ্চিন্ত হতে পারতেন সত্য, কিন্তু এই বাবুসাহেবকে তিনি যথার্থ স্নেহ করতেন, নিজ পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় যে জন্তুটিকে দূর করে দিয়েছিলেন, তাকেই আবার অপরের সন্তানকে দেন কি করে, বিশেষ যখন তার আত্মীয় বন্ধু কেউ কাছে নাই। তবে বাবুসাহেব তো ছাড়বার পাত্র নন, মহারাণীও বাক্য ভঙ্গ করতে পারেন না, তাই যথাশাস্ত্রবিধি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে হাইদরকে বিদায় করলেন। 'বাবুসাহেব' ঘোড়াটিকে বাড়ী এনে বিশেষ তদ্বির করে আবার সুস্থ সবল করে তুল্লেন। তখন এই অবোলা জীব আর বুদ্ধিজীবি মানুষটির আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হ'ল। হাইদরের বয়স অল্প হলেও সে দুষ্ট কিম্বা দুরন্ত ছিল না—ভাল ঘোড়ার সমস্ত সদ্‌গুণই তার ছিল, সে তেজী অথচ শান্ত ; পরিশ্রমী এবং প্রভুভক্ত। প্রতিদিন সকালে প্রভুকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে কত দূরে দূরে হাওয়া খাইয়ে আন্‌ত—প্রভুর ইঙ্গিতমাত্র সে প্রশস্ত খাল, সমুচ্চ বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে পার হয়ে যেত। একবার এই সময়ে ঘোড়ার অত্যধিক বেগ সহ্য করতে না পেরে তার প্রভু পড়ে গিয়ে বিশেষ আঘাত পান, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহায্য এসে না পৌঁছেছিল, ততক্ষণ হায়দর সেখান হতে এক পাও নড়েনি ; স্থির হয়ে তাঁকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্যদেশে ঘোড়দৌড় খেলায় সে প্রতিবারেই জিতে আস্‌ত, কিন্তু আপন প্রভু ছাড়া আর কাউকে সে সওয়ারি হ'তে দিত না।

একবার 'হাইদরে'র প্রভু পীড়িত হ'ল, চিকিৎসকেরা বল্লেন সমুদ্রপথে বায়ু পরিবর্ত্তন করে না এলে তাঁর জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। তিনি একা মানুষ, বহু দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘর-দুয়ার অপরের হাতে দিয়ে চলে যেতে হবে, তাই ঘোড়াগুলিকে আপনার একজন ইংরাজ বন্ধুকে বিক্রয় করবেন বলে স্থির করলেন, 'হায়দর'কে পাবার জন্য সে বন্ধুরও আগ্রহ খুব ছিল, দামের জন্য আটকাল না, দুর্ম্মূল্য হলেও হাইদরকে তিনি কিন্‌লেন। ঘোড়া যাবার আগেই সাহেব টাকা পাঠিয়ে দিলেন। হাইদরের প্রভুর বিদেশ যাত্রার সব ঠিক হ'ল ; যে রাত্রে রওয়ানা হবেন, সেই দুপুরে হাইদরকে পাঠিয়ে দেবেন স্থির ছিল। হাইদরের প্রভু বারান্দায় একটা ক্যাম্প খাটে শুয়েছিলেন, সাহেবের লোক ঘোড়া নিতে এসেছে শুনে, তিনি বল্লেন নিয়ে যাবার আগে হাইদরকে যেন একবার তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে যায়। নাম ধরে ডাকবামাত্র সে দুচার ধাপ সিঁড়ি উঠে প্রভুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, তার মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দেবা মাত্র সে একবার কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, সে যেন বলে উঠল, 'আমার কি দোষে বিদায়

করে দিচ্ছ, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।' তার প্রভুর চোখ জলে ভরে এল— তিনি চিঠি লিখে বন্ধুকে টাকা ফিরিয়ে দিলেন, হাইদরকে আর বিক্রী করা হ'ল না।

আমি যখন তাকে দেখি তখন তার যৌবনকাল অতীত হয়ে গিয়েছিল, তবুও সে তেমনি তেজস্বী আর সুন্দর ছিল। তার মত ঘাড় বাঁকিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে নাচতে নাচতে কোন ঘোড়া যেতে পার্‌ত না। এই ঘোড়া আর তার সওয়ারকে দেখ্‌বার জন্য প্রতিদিন পথে জনতা হ'ত। প্রথম যে দিন আমি তার প্রভুর সঙ্গে তাকে আস্তাবলে দেখ্‌তে গেলাম, সেদিন সে আমার সঙ্গে শিষ্টাচার করা দূরে থাকুক, আমাকে খাতিরেই আনলে না। তার প্রভুর স্নেহের আবার একজন অংশীদার জুটেছে এটা তার আদপেই ভাল লাগেনি। আমার দেওয়া রুটি, চিনি, বিস্কুট সে মুখেই নিত না, এম্নি ভাব করতো যেন আমাকে সে দেখতেই পায়নি। কিন্তু ক্রমে তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল, তার প্রভু সওয়ারি হতে ফিরে এলে আমি প্রতিদিন তাকে মিষ্টান্ন খাওয়াতাম। মিষ্টির লোভ কয়জন এড়াতে পার বল দেখি! এরি জন্যে পরে সে আমার ডাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে আস্‌ত, আমি মিষ্টি হাতে করে ঘুরে বেড়াতাম, সেও আমার পিছে পিছে ঘুরত। আশ্চর্য্য এই, একটি দিনও সে কোন জিনিস উল্টে ফেলেনি, কিম্বা আমায় কোন আঘাত দেয়নি। মিষ্টান্ন খাওয়া হলে তাকে বলতাম, 'যা হাইদার চলে যা, আর পাবিনে, লোভী হ'লে মার খাবি', আর অম্নি সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আপন সহিসের কাছে চলে যেত, যাবার সময় ফিরে ফিরে আমার দিকে চাইত, আর মুখ বাড়াত ; ভাবখানা— 'আমায় আর একটু আদর করো—কাল আবার খেতে পাব ত ?' কথা কইতে পারত না সত্যি, কিন্তু চোখ দিয়ে সে অনেকই বল্‌ত।

সন্দেশ, পৌষ ১৩২৩



পঞ্চম পর্ব

নিঃশব্দ সঙ্গীত

পঞ্চম পর্ব : নিঃশব্দ সঙ্গীত

প্রিয়ম্বদা দেবী ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

বয়সে প্রিয়ম্বদা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে ঠিক দশ বছরের ছোট। তাঁদের দুই পরিবারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতার আভাস পাওয়া যায় তা বৈবাহিক সম্বন্ধ সূত্রে যে আত্মীয়তা গড়ে উঠে তা অতিক্রম করে গিয়েছিল। প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান প্রিয়ম্বদা যে ঠাকুর পরিবারে এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৮৮ সাল থেকে উভয়ের পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমে। ১৮৯২ সালে বি. এ. পাস করবার পর প্রিয়ম্বদার বিবাহ হয় তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের পর তৎকালীন সংযুক্ত-প্রদেশের রায়পুর শহরে তাঁরা যাত্রা করেন। নতুন সংসারের ঘরণী হয়ে প্রিয়ম্বদা যখন কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিতে (পত্র ৬৩, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা) রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মেয়েদের নতুন এক জীবনে প্রবেশ এবং একজন অপরিচিত পুরুষের সাহচর্যে তাদের সময় কিভাবে অতিবাহিত হয় এ-কথা ভেবে তিনি বিস্ময় ও শ্রান্তিবোধ করেছেন।

বিবাহিত জীবনে প্রিয়ম্বদা কিন্তু খুব বেশিদিন সুখী হতে পারেননি। প্রথমে ১৮৯৫ সালে স্বামীর প্রয়াণ এবং তারপরে তাঁর জীবনের কঠিনতম আঘাতের দিন আসে ১৯০৬ সালে— যখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন, পুত্র তারাকুমার অকালে প্রয়াত হয়, সেই সময়ে। এই অসহনীয় দুঃখ তাঁকে রিক্ত, তাঁর বেঁচে থাকার প্রতিটি প্রহরকে শূন্যতায় পরিপূর্ণ করে তুললেও, নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতো স্থির থেকে তিনি তা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরহীন ও কেন্দ্র-চ্যুত এই জীবনে রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত ছিলেন প্রিয়ম্বদার অন্যতম অবলম্বন, সান্ত্বনা এবং মানসিক নির্ভরতার জায়গা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রিয়ম্বদা যখন পুত্রশোকে দিশাহারা, তার কিছুদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে অকালে হারান। এক মৃত্যু থেকে উৎসারিত অন্য একটি মৃত্যু হয়তো তাঁদের দুজনকে খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, দুজনেই হয়তো দুজনকে আশ্রয়স্থল বলে মনে করতেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মাত্র ৯ খানা চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়, আর প্রিয়ম্বদার লেখা মাত্র দুটি চিঠি। রবীন্দ্রনাথ-প্রিয়ম্বদা পত্রাবলীর কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার সন্ধান পেলে হয়তো তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা আরো কিছুটা জেনে নিতে পারতাম। তবুও চিঠিপত্রের এই সীমায়িত পরিধির মধ্যেই আমরা

পরিচয় পাই কিভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াস নিয়েছিলেন সন্তানহারা এই বিধবা মহিলার আত্মাকে উদ্দীপ্ত করার ব্রতে। প্রিয়ম্বদা শক্তি, প্রতিভা ও হৃদয়ের গহনে ছাই-চাপা আগুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই অবজ্ঞাত ছিলেন। বারে বারে তিনি বলেছেন ত্যাগ ও দুঃখকে প্রিয়ম্বদা যেন তাঁর 'অন্তরতম জীবনের' মধ্যে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তিনি যেন কখনো ভেঙে না পড়েন। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্র-দত্ত এ-সব উপদেশ প্রিয়ম্বদার জীবনে যে জীবন-বেদ-স্বরূপ হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্য-জীবন, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কাজে তাঁর ভূমিকা এবং নানা ধরনের আত্মবিলোপকারী সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রতি প্রিয়ম্বদার যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা প্রকাশ পেয়েছে এই সংকলনের অন্তর্গত 'চৈতালি' রচনায়। জয়শ্রী পত্রিকার পৌষ ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রিয়ম্বদা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন :

তোমার গাহিতে জয় ভালোবাসে হিয়া,
যার সবটুকু আলো এনেছি বহিয়া
কৈশোরের তীর হতে, যে গীত লহরী,
চিত্ততলে চিরদিন বাজালে বাঁশরি ॥

* * *

চিত্তপটে এঁকে দিল তব 'চিত্রাঙ্গদা'
নারী না সেবাদাসী, সৌন্দর্য্য সম্পদা
শৌর্য্যে বীর্য্যে যাত্রাসাথী প্রধান সঙ্গিনী
নহে সে কামিনী শুধু বিলাসে রঙ্গিনী ॥

* * *

লোকোত্তরে মুদ্রাঙ্কিত তোমার প্রতিভা
অন্তহীন গৌরবের অতুলন বিভা....

অন্যদিকে, প্রিয়ম্বদার রচনার প্রতিও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ১৪ই আশ্বিন ১৩০৭ সালে প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন : 'আজ "রেণু" রচয়িত্রীর একখানি চিঠি পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন তাঁর লেখা তোমার কেমন লাগ্‌ল। আমি উত্তর দিয়েছি তোমার ভাল লাগ্‌বে....' (চিঠিপত্র ৮, পত্রসংখ্যা ১২৯, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯৯, পৃ ১৪১)। ১৩৩৯ সালে প্রিয়ম্বদা দেবীর *চম্পা ও পাটল* কাব্যগ্রন্থের একটি সপ্রশংস মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৩৩৫-এ *লেখন*-এ রবীন্দ্রনাথের ভ্রমক্রমে প্রিয়ম্বদার চারখানি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান সংকলনের 'ভূমিকা', পৃ. পাঁচ-ছয়)।

প্রিয়ম্বদার জীবনের নানা ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ উপস্থিতি অনুভব করা যায় তেমনি প্রিয়ম্বদাও রবীন্দ্রনাথের বিরাট কর্মযজ্ঞে কোনো-না-কোনো ভাবে অংশগ্রহণ করতে চাইতেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন মোচনের জন্য নোট গিনি মিলিয়ে তিনি দান করেছিলেন পাঁচশো টাকা (তথ্যসূত্র : *দেশ*,শারদীয় ১৪০২)।

প্রিয়ম্বদা রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক গুণমুগ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে একটা দূরত্ব বুঝি থেকেই গিয়েছিল। অন্তত, প্রিয়ম্বদার হয়ত সেরকমই মনে হত। বন্ধু ওকাকুরাকে তিনি লিখেছিলেন, He [রবীন্দ্রনাথ] does not discourage, but asks me to go on translating them [প্রিয়ম্বদার কবিতা] . . . I know he thinks I have not used my gifts well . . . He is a man and can not realise that a woman's life is limited by many things.' (পত্র ৫)।

রবীন্দ্রনাথকে প্রিয়ম্বদা

৪৬ ঝাউতলা রোড
বালিগঞ্জ, কলকাতা
১৬ নভেম্বর ১৯১৩

শ্রীচরণেষু

কাল সকালে আপনার Nobel Prize পাবার খবর পেয়েই আপনাকে তার করেছিলাম। আমার বুদ্ধিমান চাকর সেখানি নিয়ে ডাকে যেতে এত দেরী করলে যে তখন আর কাল পৌঁছবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই সে আর গেল না। আপনার এই সম্মানে আমাদের সকলেরই বড় আনন্দ হয়েছে— এ শুধু নিজের, নিজের পরিবারের, দেশের গৌরব নয় এ যে সমগ্র আসিয়া মহাদেশের গৌরব।[১] বিশ্বের সভায় বঙ্গসাহিত্যের অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্য।

আপনি ভাল আছেন ত? আমার প্রণাম জানবেন।

প্রিয়।

প্রিয়ম্বদাকে রবীন্দ্রনাথ

১.

৩ মার্চ ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার এবারকার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। তুমি নিজের মনের মধ্যে একটা বড় রকমের জোর না পেলে বাইরে থেকে কোনো সাহায্যই গ্রহণ করতে পারবে না। এ কথা খুবই সত্য যে আমাদের দেশের মেয়েদের কাছ থেকে আমরা যে আত্মবিলোপ

দাবী করি—তাতে অনেকেরই পক্ষে আত্মঘাত ঘটে—সেটাতে কখনই মঙ্গল হয় না। তোমার মধ্যে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়েছেন তাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করবার পথে কোনো সঙ্কীর্ণ সামাজিক বা পারিবারিক বাধা মানবার কর্ত্তব্যতা নেই। পোষা জন্তুর মত পরের জোয়াল ঘাড় পেতে নিয়ে চলাকে ধর্ম্ম বলেই স্বীকার করি নে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। দুর্ব্বলভাবে নিজেকে কখনই পাবে না। আমাকে নববিধান সমাজের প্রমথবাবু[২] "অঘোর প্রকাশ"[৩] নামক একটি জীবনচরিত পাঠিয়েছেন—এ বইটি তুমি দোকান থেকে আনিয়ে পোড়ো। এতে একটি দম্পতির জীবনবৃত্তান্ত আছে—তার সমস্ত বিবরণই আমার কাছে যে হৃদ্য বলে বোধ হয়েচে তা নয় কিন্তু মোটের উপর বইটার ভিতরে একটা জোর আছে তাতে আমি উপকার অনুভব করেছি—এবং আমার নিশ্চয় বিশ্বাস তুমিও উপকার পাবে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর রেখে নিজের সমস্ত বল নির্ভয়ে উদ্বোধিত করে তোলো—কারো কথায় কোনো বাধায় লেশমাত্র কুণ্ঠিত হোয়ো না। জীবনের সার্থকতা লাভ করতেই হবে—মঙ্গল তোমাকে যে পথে আহ্বান করবে তার সম্পূর্ণ শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে যেতেই হবে—কোনো কষ্ট কোনো ক্লান্তি মানবে না। আমি বলি আগামী নববর্ষের প্রথম দিনে ঈশ্বরের কাছে একান্তমনে আত্মনিবেদন করে দিয়ে তোমার জীবনের তরণীকে কল্যাণের প্রবাহে নিঃসঙ্কোচে ভাসিয়ে দাও—আগামী বৎসর থেকে সমস্ত তুচ্ছ শোক হতে মনকে মুক্ত কর—সমস্ত ক্ষুদ্র লজ্জাভয়কে একেবারে পরিত্যাগ কর—একেবারে বিশ্বক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের মুখের দিকে মুখ তুলে চাও। নিজের আত্মার মাহাত্ম্যকে মুহূর্ত্তের জন্যে অস্বীকার কোরো না—নিজেকে ক্ষুদ্র ক্ষীণ দুর্ব্বল বলে মনেই কোরো না—তুমি যে কত বড়, কত মহামূল্য, তোমার যে কত গৌরব, কত শক্তি, কত কাজ তা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে খুব বলের সঙ্গে অনুভব ও সপ্রমাণ কর। ভুল হয় ত সে ভুল কেটে যাবে—আঘাত পাও ত সে ক্ষত আরোগ্য হয়ে যাবে—যাই ঘটুক না—যত দুঃখ যত বাধাই পাও তোমার আত্মাকে লাভ করতে পারবে—সেই ত চরম লাভ—একেই ত বলে অমৃতত্ব লাভ। আমার অনেকবার মনে হয়েছে—প্রিয় বড় দুর্বল ভাবে লালিত হয়ে এসেছে সে কি নিজেকে মঙ্গলের উপরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে? আর তা যদি না পারে তাহলে ত কেবলি দুঃখ হতে দুঃখে দুর্ভিক্ষ হতে দুর্ভিক্ষেই সে যাত্রা করবে।—কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে জাগ্রত করবেন বলেই অনেক দুঃখ দিয়েছেন। এত দুঃখও যদি সার্থক না হয়ে ওঠে তবে হল কি! কিন্তু আমি বলছি ঈশ্বর তোমার জীবনকে ও জীবনের সমস্ত দুঃখতাপকে কখনই বৃথা হতে দেবেন না। তোমাকে তিনি ধন্য করে নিজের কাছে টেনে নেবেন। ইতি ২০শে ফাল্গুন ১৩১৪,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কল্যাণীয়াসু
47 Old Ballygunge
Calcutta.

২.
১৩ মার্চ

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার শরীরের রুগ্নতায় আমি চিন্তিত হলুম—বিশেষ যত্নে ওকে সুস্থ সবল করে তুলতে হবে। কেন না কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রেমের ভোগের অধিকার তোমার হয় নি—তাঁর সেবা করতে হবে। আমি কেন বলছি সে কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে জীবনকে গড়ে তোল নি।—এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে না পারলে ঈশ্বরের প্রেমের মধ্যে তোমার জীবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য হবে না—ব্যাপারটা অনেকটা কাল্পনিক এবং দুর্ব্বল পদার্থ হবে। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে ছাড়া মুক্তি হয় না এ কথাটা যে আমাদের শাস্ত্রে বলে তার মানে আছে। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে ছাড়া আমরা যে নিজেকে সত্যভাবে উপলব্ধিই করতে পারি নে সুতরাং সে অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণটাও ঠিক সত্য হয় না।

আমি তোমাকে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি—আমি যদি কাজে প্রবৃত্ত না হতুম তাহলে আমার কল্পনাবৃত্তি ও বুদ্ধিকে শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করেও নিজেকে জানতে পারতুম না। নিজের হৃদয়গ্রন্থিগুল হৃদয়েই লুক্কায়িত থাকত সেগুলো কোনোদিনেই ছিন্ন হত না। আজ কাজ করতে গিয়ে প্রতিপদে দেখতে পাচ্ছি এখনো আমার মনে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা অর্থাৎ লোভ রয়েছে—অথচ কাজ করতে করতে ঈশ্বর আমার এই আর্থিক লোভের সূত্রটুকু ক্রমশই ক্ষয় করে আনচেন—তা না করে উপায় নেই—যেখানে ব্যথা সেখানে ক্রমাগতই যে চোখ পড়চে—আমার যে সমস্ত দুর্ব্বলতা ঈশ্বরের সেবার বাধা তাতে যে কেবলই আঘাত পড়চে। সেই আঘাতের বেদনাতেই আমার মনে আশা জেগে উঠছে যে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর আমাকে জয়ী করবেন সেইজন্যেই আমাকে এই বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়ে আমার নিজেকে আমার নিজের দৃষ্টির সামনে এমন করে ধরেচেন। শুধু দৃষ্টির সামনে ধরা নয়—অর্থাৎ কেবল জ্ঞানে জানানো নয়, কর্ম্মের অনিবার্য্য সংঘর্ষে স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থের ভীরুতা প্রত্যহই ক্ষয় করা। অন্য কোনো উপায়েই এমনটি হতে পারত না। কর্ম্ম যে আমার অহমিকাকে আমার স্বার্থকে খাতির করে চলে না—সে আমার ক্ষুদ্রতাকে যে ঠিক ক্ষুদ্র করেই দেখিয়ে দেয়—নিজের সম্পর্কে আমাকে কোনো কাল্পনিক বিভ্রম আঁকড়ে থাকতে দেয় না। এই কারণেই প্রেম যতক্ষণে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ হয়ে না যায় ততক্ষণে তা অহঙ্কারবিমুক্ত হয়ে ভোগের অধিকার পায় না। ভোগের অধিকার হচ্ছে পেন্সন, তা কর্ম্মেরই শেষ পরিণতি স্বরূপে আসে—ভোগের অধিকার হচ্ছে রাত্রি তা দিনের সম্পূর্ণ অবসানের অপেক্ষা রাখে। অতএব, এখন কোনো কারণেই ছুটি নিলে তুমি ছুটি পাবে না, তাতে কেবল তোমার মুলতবি কাজ বেড়ে উঠতেই থাকবে, তোমার যা কিছু ক্ষয় করবার প্রয়োজন

আছে তা চাপা থাকবে—যাকে ত্যাগ করে তবেই লাভ করতে পারবে সে সমস্তই কৃপণের ব্যর্থধনের মত তোমার বোঝা বাড়াতে থাকবে অথচ তার পরিবর্ত্তে কিছুই পাবে না। ঈশ্বরের বন্দরে তোমার জীবনতরী ভাসিয়ে দেবার আগে নোঙর তুলবে না, কাছি খুলবে না, মনে ২ চোখ বুজে কল্পনা করবে যেন সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছ? সে কোনোমতেই হতে পারবে না? নিজের মনকে তলিয়ে দেখ, দেখবে অনেক ছোটবড় বাঁধনে নিজেকে জড়িয়ে বসে আছ—সমস্ত জীবন কেবল এই জড়ানোরই কাজ করেছে—না খুলতে পারলে চরম adjustment হবে কি করে? কর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত খুলবেই বা কি উপায়ে, ত্যাগ করবার ক্ষেত্র চাই যে! বিলাসীর মত, কৃপণের মত নিজেকে আরামে উপলব্ধি করতে পারবে না। নিজের সমস্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোল—সমস্ত অগৌরব দূর করে দাও, নিজের সম্বন্ধে দয়ামায়া রেখো না,—নিজের অন্তরতমের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যভাবে তোমার সমস্ত নিবেদন করে দাও—নিজের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়—কিছু না ভেবেচিন্তে খুব দুর্গম পথেই বেরিয়ে পড়—তাতে যতই কষ্ট যতই ক্ষতি হোক্ সার্থকতার সেই একমাত্র পথ। ইতি ৩০শে ফাল্গুন ১৩১৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.

১৭ মার্চ ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। হাল ছেড়ে দিয়ো না—নিজের আন্তরিক মহামূল্যতার প্রতি বিশ্বাস রেখে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ নিজের উপযোগী করে তোলো—কোনো ভীরুতা, কোনো ক্ষুদ্র লালসা, কোনো আত্মপ্রবঞ্চনা, যেন বাধা না দেয় এই আমার বক্তব্য। "অঘোর প্রকাশ" বইখানির বিশেষত্ব আমার কাছে এই মনে হয়েছে যে ওতে যে দুটি লোকের জীবনের পরিচয় আছে তাঁরা কেউ কোনো অসামান্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি—বস্তুত সমস্ত বইয়ের রচনার মধ্যে কোথাও চিন্তাশক্তির কোনো পরিচয় পাই নি—এমন কোনো একটি কথাও পড়ি নি যাতে আমার চিন্তাকে অপূর্ব্বভাবে উদ্বোধিত করতে পেরেছে—বরঞ্চ ঠিক উল্টো—অনেকস্থলেই লেখকের চিন্তাশক্তির সঙ্কীর্ণতাই অনুভব করেছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেবলমাত্র তপস্যায় কেবলমাত্র ত্যাগের জোরে এবং অবিচলিত নিষ্ঠায় এই দুইজন সাধারণ ব্যক্তি অতলস্পর্শ তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে নিজের জীবনকে অসামান্যতার মধ্যে সার্থকতার মধ্যে নিয়ে গেছেন। এই প্রয়াসের ভিতর দিয়ে যদি না যেতেন তাহলে এঁরা নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থের মতই ঘরকন্না করে জীবন কাটাতেন—চারিদিকের সামান্যতার মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে থাকতেন—তা না হয়ে ওঁদের দু-জনের চরিত্র যে একটি বিশেষ আকৃতি লাভ করেছে, ওরা যে নিজের জীবনের সুদৃঢ় ও সমুচ্চভিত্তির উপরে নিজেরা যথাসম্ভব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছেন এটা ভারি একটা দেখবার জিনিষ। অসামান্যতা যে প্রত্যেকেরই ভিতরে আছে—তার যে

মূল্য অনেক, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যে যে সমস্ত সুখ ও সম্পদ দিয়ে সমস্ত কষ্ট স্বীকার করে মরাই জীবনের সার্থকতা এই কথাটা এই বইটির ভিতর থেকে আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বইয়ের মধ্যে লেখকের ক্ষমতার যে অভাব প্রকাশ পেয়েছে সেই অভাবের সঙ্গে তুলনাতেই বইয়ের ভিতরকার সত্য জিনিষের মাহাত্ম্য আমি খুব উজ্জ্বল করে দেখতে পাচ্ছি। নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিও নিজের সত্যকে যখন বাধামুক্ত করে তোলেন তখন তিনি যে কি রকম অসামান্য হয়ে ওঠেন এই বইটিতে তারই প্রমাণ আছে—এইজন্যে সাধারণ মানুষের কাছে এই বইয়ের মূল্য খুব বেশি। বল জিনিষের যে কত প্রয়োজন এবং নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ কথাটা যে কত সত্য তা এ বই থেকে বেশ বোঝা যায়। ইতি ৪ঠা চৈত্র ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪.
৮মে ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু,

আজ এখানে প্রাতে আমার জন্মদিনের উৎসব হয়ে গেল। আমার যে একটা জন্মদিন আছে সে কথা ভুলে গিয়েছিলুম। বহুকাল হয়ে গেল যখন আত্মীয়পরিজনের স্নেহের মধ্যে এই উৎসব হত—কিন্তু সে যেন জন্মান্তরের কথা। আজ মনে হল আর [এক] ক্ষেত্রে নবজন্মলাভ করেছি—এখন যারা আমার কাছে এসেছে আমাকে কাছে পেয়েছে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তারা কত দেশের কত ঘরের কত ছেলে। তারাই আনন্দ করে আজ সকালে আমাকে নিয়ে উৎসব করেছে—এই আমার আশ্রমের জীবন—এই আমার মঙ্গললোকে নূতন জন্মলাভ—ঈশ্বর আমার এই জন্মকে সার্থক করুন এই প্রার্থনা করি। তিনি এই জীবনের মধ্যেই জন্ম থেকে জন্মান্তরে আমাদের আত্মাকে বিকশিত করে তুলচেন—তাঁকে প্রণাম করে আজ তারই হাতে আত্মসমর্পণ করলুম—আজ তাঁর কাছ থেকে জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করলুম।

কাল কলকাতায় যাব। কতদিন থাকব, কোথায় যাব কিছুই জানি নে। বালিগঞ্জে যদি যাওয়া ঘটে তবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

শরীর এমনি কি খারাপ! বেশ ভালই আছি। বোলপুরেই ভাল থাকি কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তোমরা কি কোথাও যাবে? ২৫শে বৈশাখ ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কল্যাণীয়াসু
46, Jhautala Road
Ballygunj.

৫.
১৫ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

[বোলপুর]

কল্যাণীয়াসু,

প্রিয়, নববর্ষ তোমার মধ্যে নূতন জীবন উদ্‌ঘাটন করে দিক্। ঈশ্বর তোমার মধ্যে দৃঢ় বল ও মঙ্গলে অবিচলিত প্রতিষ্ঠা দান করুন। মনুষ্যত্বের সাধনায় সহজ পথ নেই—নিষ্ঠা এবং শক্তিই তার প্রধান পাথেয়। তুমি নিজের মধ্যে একটা প্রবল শক্তিকে জাগিয়ে তোল—কোনমতে আপনাকে ভেঙে পড়তে দিয়ো না—ত্যাগ এবং দুঃখস্বীকারকে অন্তরতম জীবনের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নাও—নইলে কোনোমতেই সত্যজীবন লাভ করতে পারবে না। সত্য হও, দৃঢ় হও, আবল্যের সমস্ত আবরণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে নিজেকে ভূমার মধ্যে দাঁড় করাও—নাত্মানবসাদয়েৎ।

শম্ভু[৪] ছুটির সময়ে এখানেই থাকতে চাচ্ছে—তাতে তার কাজের পক্ষে ভাল এবং তোমাদের পক্ষেও সুবিধা। কিন্তু যে ছেলেরা ছুটির সময় থাকবে তাদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে হয় বলে তার খরচের জন্য দশ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া নিয়ম। যদি তোমার মত থাকে তাহলে এই অনুসারে টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।

ছুটির পূর্ব্বে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া অসম্ভব, কারণ, ছেলেরা আগামী পঁচিশে বৈশাখে আমার পঞ্চাশ বার্ষিক জন্মোৎসবের আয়োজন করচে—আমাকে তারা নড়তে দেবে না।[৫]

এখানে টেকনিক্যাল বিভাগের জন্যে চাঁদা তোলা আবশ্যক হবে। অনেকে আশা দিয়েছে, চাঁদা তোলা অসম্ভব নয়। কিন্তু এ সমস্ত আশার উপর নির্ভর করে তাকিয়ে থাকা কিছু নয়—কাজেই সাধ্যমত অল্প অল্প করে কাজ শুরু করে দিতে হবে।

তোমার কবিতাটি বেশ ভাল হয়েছে।[৬] যদি কোথাও না দিয়ে থাক তাহলে তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়ে দেব। বৈশাখের তত্ত্ববোধিনী বোধ হয় পেয়েছ। ইতি ২রা বৈশাখ ১৩১৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬.
১০ মে ১৯১১

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু,

আমি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে তোমার পূর্ব্বচিঠিখানি পেয়েছিলুম। এ কয়দিন আমি এক মুহূর্ত্তও সময় পাই নি। আজ প্রত্যুষে সমস্ত অতিথিরা চলে গেছেন তাই আজ

অনেক কালের সঞ্চিত পত্রগুলির উত্তর দিতে বসেছি। আমরা এর আগেও একবার ঠিক করেছিলুম শম্ভুকে এখানে রাখা চলবে না—কেন না ও নিজেও কিছু করে না অন্যেরও গুরুতর অনিষ্ট করে। মাঝে একটু সংযত হয়েছিল কিন্তু আবার শেষাশেষি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে শম্ভুর চলে যাওয়া বিদ্যালয়ের পক্ষে ভাল হয়েছে। আমি জ্যৈষ্ঠমাস থেকে তার নাম তুলে দিয়েছি।

এখানে আমার জন্মোৎসব হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্চে এই উৎসবে আমি মঙ্গল লাভ করেছি। ঈশ্বর আমার একটি নূতন জীবনের সূচনায় এই আনন্দ আয়োজন ঘটিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাচ্চেন যেখানে পরিচয় বা পারিবারিক সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ আত্মীয় হয় না—যেখানে আত্মার পক্ষে আত্মীয়তাই সহজ ধর্ম্ম—সেই জন্যে কত অজানাকে কত সহজেই আপন করে লাভ করেছি। আজ আমার এই জীবনে আমি তোমাদের সকলেরই কাছে প্রার্থনা করি যে তোমাদের শুভইচ্ছারূপেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আমাকে স্পর্শ করুক ইতি ২৭শে বৈশাখ ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কল্যাণীয়াসু
৪৬ ঝাউতলা রোড
বালিগঞ্জ

৭.
১৫ কার্তিক ১৩১৮

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু,

মীরার জন্যে বৌমাকে জোড়াসাঁকোতেই রেখে আমাকে একলা চলে আসতে হল।[৭] তোমার নির্ম্মলাদিদির চিঠি পড়ে আমার মনে হল তাঁর মেয়েটিই বৌমার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত হবে।[৮] তাঁকে স্বতন্ত্র ঘরের বন্দোবস্ত করে দেওয়া কিছুই শক্ত হবে না—কেননা আমাদের নতুন বাড়ীটা প্রায় খালিই পড়ে আছে—বেলার একজন খৃষ্টান দাসী আছে সে ওঁর সঙ্গে শুতে পারবে।[৯] আমাদের বাড়ীতে এমন কোনোপ্রকার উপসর্গ নেই যাতে তোমার নির্ম্মলাদিদি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হতে পারেন। রথী নিতান্তই ভালমানুষ—বৌমা ততোধিক—মীরাকে ত তুমি জানই—বেলা এবং শরৎ অত্যন্ত কুণো, দৈবাৎ তাদের দেখা যায় মাত্র।[১০] আমরা কোনো একটা দলের মধ্যেও নেই, society বল্লে যা বোঝায় তার কোনো ধার ধারি নে—অতএব আমার ওখানে যে থাকবে সে খুব নিরালায় থাকতে পারবে। মিসেস্ সোম তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে যেমন চিন্তা করচেন আমার বৌমা সম্বন্ধেও আমার মনে ত উদ্বেগ আছে—এমন কোনো প্রকার সঙ্গ আমি ইচ্ছা করি নে যাতে করে

লক্ষ্যত বা অলক্ষ্যত তাঁর মনে কোনো প্রকার গ্লানির সঞ্চার হতে পারে—তাঁর মন খুব নির্ম্মল আছে এবং এখনকার কালের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার চাঞ্চল্য তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নি—Miss Shomeএর সঙ্গ তাঁর পক্ষে যে ঠিক অনুকূল হবে এই কথা মনে করে আমি আনন্দিত হচ্ছি।[১১] একটি পবিত্র ধর্ম্মভাব এবং উচ্চচিন্তার আবহাওয়ার মধ্যে বৌমা মানুষ হয়ে ওঠেন এই আমার একান্ত ইচ্ছা। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতায় মানুষকে অস্থিমজ্জায় দুর্ব্বল করে ফেলে তার থেকে তাঁকে আমি রক্ষে করতে চাই। তিনি চিন্তা করতে শেখেন, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মনে বহন করতে পারেন,তাঁর চিত্তে ভাবের গভীরতা সঞ্চার হয় এবং মানুষের যথার্থ মাহাত্ম্য যে কোনখানে সেইটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেন এই আমি কামনা করি। তাঁর ইংরেজি পড়া জ্ঞানলাভের উপায়মাত্র—কিন্তু বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ করা, বলা বা লেখাই যে পরমার্থ লাভ তা আমি মনে করি নে—তাঁর মনে বড় হবে, ইচ্ছা বিশুদ্ধ হবে, জীবন সার্থক হবে এই আমি চাই—মিস্ সোম যে পরিবারে যেভাবে যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন তাতে তাঁর সঙ্গের দ্বারা বৌমার মনটি যে বড় হবার দিকে যাবে তা আমি আশা করতে পারি।

রথীকে আজ লিখে দিলুম তোমার সঙ্গে কথা কয়ে ঠিক সমস্ত ঠিক করতে।

নিজের ভিতর থেকে নিজেকে বের করে ফেলবার জন্যে, কুঁড়ির ভিতর থেকে ফুলকে একেবারে উদঘাটিত করবার জন্যে আমার ভিতরে ভারি একটা ব্যাকুলতা এসেছে—সেইজন্যেই নিজের অভ্যস্ত পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করচি—এখানেও সেইজন্যে এসেছি—নির্জ্জন প্রকৃতির মধ্যে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে এই আমার মনের আশা। মনের ভিতর কেবলি এই ধাক্কা আসচে—বেরও, বেরও, বেরও—প্রকাশ হোক, তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হোক্। সমস্ত বন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন হলে বাঁচি ; ইতি ১লা নভেম্বর ১৩১১ [১৯১১]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কল্যাণীয়াসু
46 Jhautala Road, Ballygunj

৮.
৬ নভেম্বর ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু,

প্রিয়, রথী তোমার বাড়ী গিয়ে তোমাকে পায় নি—তুমি মধুপুরে চলে গিয়েছ। বৌমা এখন কলকাতায় যখন রইলেন তখন রথীর ইচ্ছা এ কয়দিন Miss Shome তাকে

বাড়ীতে এসে ঘন্টা তিনেক পড়িয়ে যান। তারপরে যখন বৌমা মফস্বলে আসবেন তখন তাঁকে সঙ্গে নিলেই হবে। ইতিমধ্যে উভয়পক্ষেই আলাপ হয়ে যেতে পারবে। অবশ্য Miss Shome গাড়িভাড়া বাবদ আরো কিছু ধরে নিতে পারেন। মনে কর যদি গাড়িভাড়া সুদ্ধ ৭৫ কিম্বা ৮০৲ দেওয়া যায়। মুস্কিল এই তুমি মধুপুরে, আমি বিশ্বের বাইরে এক নির্জ্জন চরে, রথীকেও বিশেষ কাজে দূর মফস্বলে যেতে হচ্চে, বৌমা যোড়াসাঁকোয় [জোড়াসাঁকোয়]। Miss Shome কোথায় ঠিক জানি নে—সমস্ত যোগাযোগ হয়ে একটা কিছু চূড়ান্তভাবে স্থির করে তুলতে ২ দিন বয়ে যাবে। যাই হোক যদি আমাদের এই প্রস্তাবে Miss [মিসেস] Shome রাজি হন তাহলে তিনি যদি একেবারেই বিনা বিলম্বে তাঁর মেয়েকে কাজে প্রবৃত্ত করিয়ে দেন তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। সে কি সম্ভব হবে না? যদি শীঘ্র জানতে পারি এটা চলবে না তাহলে রামানন্দবাবুকে লিখে অন্য লোকের বন্দোবস্ত করা যায়।[১২]

তারার শরীর এখন কেমন আছে আমাকে লিখো।[১৩] তুমি কেমন আছ।

নগেন রথীরা আমার চিঠিপত্র নানান স্থান থেকে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করচে—তাদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে ধরেছে। তারা মূল চিঠি চায় না, কপি করে নিতে চায়, অথবা কপি পেলেই সন্তুষ্ট থাকতে রাজি আছে। তোমার কাছ থেকে কপি করে রাখবার যোগ্য কোনো চিঠি পেতে পারে কি না তাদের প্রশ্ন। আমি জানি নে। তা ছাড়া চিঠি রেখে দেওয়া রোগ তোমার আছে কিনা তাও জানি নে। আমার মনে হচ্চে যখন গাজিপুরে ছিলুম তখন আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম[১৪]—তখন আমার কি লেখবার ছিল তখন আমি কি ভাবছি কি করছি সমস্ত আমার কাছে অনেক ঝাপসা হয়ে এসেছে—তোমার কি মনে আছে?

এখানে জনশূন্য নদীর চরে এসে বেশ ভাল লাগ্‌চে। এখানে এলে মনের পর্দ্দা উঠে যায়—অনেক জিনিষ সহজে উপলব্ধি করা যায় যা লোকালয়ে সম্ভবপর নয়—কিন্তু এখানকার লাভ যদি লোকালয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই সে লাভ সার্থক হয়। মানুষের যেন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এক একটা ভিন্ন ভিন্ন সত্তা গড়া হয়ে থাকে। মানুষের আপিসের সত্তা তার বাড়ীর সত্তার থেকে বিস্তর তফাৎ। তেমনি এই নদীর মাঝখানের আমি এবং ভিড়ের মাঝখানের আমি সম্পূর্ণ এক না—কবে সম্পূর্ণ এক হতে পারব—সব জায়গায় সকল ভিড়ের মধ্যেই এই সুপবিত্র উদার নির্জ্জনতাটি আমাকে মাতার অঞ্চলের মত আবৃত করে থাকবে?

মধুপুরে এখন বোধ হয় খুব লোকের ঘেঁষাঘেঁষি। ইতি ২০শে কার্ত্তিক ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কল্যাণীয়াসু
46 Jhautala Road,
Ballygunj

৯.
৮ মার্চ ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

কল্যাণীয়াসু,

আমার য়ুরোপযাত্রার দিন ত খুবই কাছে এসেছে—আজ ত ২৫শে ফাল্গুন ; আগামী ৬ই চৈত্র মঙ্গলবারে আমার জাহাজ ছাড়বে। আমি এখান থেকে আসচে সোমবারে ছাড়ব। তাহলে যাবার আগে কলকাতায় আমার দিন সাতেক থাকা হবে। এবার এখানে এসে আমি ভারি আরাম পেয়েছি। এখানকার আকাশে বসন্তের আনন্দরসে ফাল্গুন মাসের স্বর্ণরৌদ্রখচিত পেয়ালাটি একেবারে উপচে পড়েছে। আমার এই তেতলার একলার ঘরটির সমস্ত দরজা চারিদিকে খুলে দিয়ে বসে আছি—বসন্ত তার পীত উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে অবাধে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আম্রমুকুলের গন্ধে আমার ঘর ভরে যাচ্ছে। সাম্‌নে আমার বাগান পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গ্রাম, গ্রাম পেরিয়ে নদী, নদী পেরিয়ে দিকপ্রান্তের কোলে বালুচরের পান্ডুবর্ণ রেখা ; চোখ যেন খাঁচার দরজা খোলা পাখীর মত বেরিয়ে কোথায় উড়ে চলে যায়, তাকে ডাকলেও সে আর ফিরে আসতে চায় না। আমার সমস্ত দেহমন সমস্তদিন এই মাধুর্য্যে অভিষিক্ত হয়ে রয়েছে। বসে বসে কেবলি মনে হচ্চে, জগতের আর কোথাও এমনটি পাব না। আমার এই বহুদিনের পদ্মার তটভূমি আমাকে কিছুতে যেন বিদায় দিতে চাচ্চে না—আজ এই ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে [মধ্যাহ্নে] সে তার আতপ্ত বাহু দিয়ে আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে—তার এই পাখীর ডাক, আম্রবনের গন্ধ, তার এই উতলা হাওয়াটি, এই নবপল্লবদলের ভিতর দিয়ে ছাঁকা রৌদ্রটির লাবণ্য সমস্তই আমাকে বলচে তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না। কিন্তু তবু যেতে হবে। আমার চিরাভ্যাসের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে এই পৃথিবীকেই তার বাহির মহলে দেখে আসতে হবে।

ডাকঘরের কোনো রূপক নেই—যা ওর শাদা মানে, তাই ওর মানে। প্রবাসীর সমালোচনা, ও একটা ব্যায়াম মাত্র।[১৫] ওরকম অর্থ বের করে কি কোনো সুখ আছে ? সাহিত্যে 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং'—যদি ওতে কোনো সৌন্দর্য্য থাকে, কোনো রস থাকে, তাহলে আর কোনো কৈফিয়তের দরকার নেই—ছবি দেখতে গিয়ে কেউ যদি ফ্রেমের সমালোচনা করতে বসে তাহলে তাতে চিত্রকরের কোনো গৌরব নেই। আসলে, রূপক ও গূঢ়তত্ত্ব আবিস্কার করার সুখটা এই যে তাতে কবির চেয়ে সমালোচকের গৌরব বাড়ে—কাব্যটাকে উপলক্ষ্য করে সমালোচকেরই বাহাদুরি প্রকাশ পায়।

আমি বলে বলে বড়দিদিকে এই পিতৃস্মৃতি লিখিয়েছি।[১৬] মেজদাদাকেও বলেছিলুম।[১৭] যদি তিনি লেখেন ত ভাল হয় যা কিছু মনে আছে তাই সরলভাবে বলে গেলেই

বেশ হয়—তুমি মেজদাদাকে অনুরোধ কোরো ত। আমার যেটুকু বলবার আছে, জীবনস্মৃতিতে বলেছি—বই আকারে ছাপবার সময় আরো কিছু কিছু যোগ করে দেওয়া যাবে। জ্যোতিদাদা প্রবাসীতে একটুখানি লিখেছিলেন কিন্তু সে বেশ ভরারকম হয় নি।[১৮] চৈত্রের প্রবাসীতেও বড়দিদির পিতৃস্মৃতি আর একটুখানি যাবে।

স্ত্রীমহামণ্ডলের অধ্যাপনার ভার তুমি কতকটা নেবে শুনে খুব খুসি হলুম।[১৯] তোমার ক্ষমতা যখন আছে তার সঙ্গে শক্তিকে যোগ করবে না কেন? আপনার ভিতর থেকে বেরিয়ে এস। অনেকদিন থেকে তোমার উপরে সেই আহ্বান আছে—কিন্তু তুমি যেন মাকড়ষার অন্তর মত অতি সূক্ষ্ম বাধার জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে আছ—তাই আপনার মধ্যে বেষ্টিত হয়ে আপনাকে ভুলতে পারচ না। কিন্তু এই তোমার আপনাটির চেয়েও যে তোমার একটি বড় আপন এতকাল আচ্ছন্ন হয়ে আছে, একবার ঝেড়েঝুড়ে উঠে নিজের সমস্ত বলের সঙ্গে তার পরিচয় গ্রহণ কর। ইতি ২৫ ফাল্গুন ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কল্যাণীয়াসু
Dr. Umadas Banerji's Bungalow,
Madhupur.

প্রিয়ম্বদা দেবী ও ওকাকুরা কাকুজো প্রসঙ্গ

জাপানী প্রাচ্যবিদ ও শিল্প-ঐতিহাসিক ওকাকুরা কাকুজো প্রথম ভারতবর্ষে আসেন ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে যাবার আমন্ত্রণ জানাতে। যদিও বিবেকানন্দ ওকাকুরার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি, তবু সেবার ওকাকুরার ভারত সফর বিফলে যায়নি। ১৯০২ সালে, ভগিনী নিবেদিতার মধ্যস্থতায় ওকাকুরা বন্ধু হিসেবে পান ঠাকুরবাড়ির সুরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথকে। সেবার কিন্তু তাঁর প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়নি। ওকাকুরা-প্রিয়ম্বদার প্রথম দেখা হয় ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে— সেটা ছিল ওকাকুরার দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসা।

ওকাকুরা কাকুজোর জন্ম হয় ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, জাপানের ইয়োকোহামা শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন ফুকুই সম্প্রদায়ের অর্থ-সংরক্ষক, এক সামুরাই, কান-ইমন। ওকাকুরা ছিলেন কান-ইমনের দ্বিতীয় স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান। 'Just as baby Kakuzo lay by his mother's side in the warehouse at the corner, so a "new born" Japan was groping her way to self-expression in new terms, for the country has just been opened to the west. . . " (Yasuko Horioka, *The Life of Kakuzo*, Tokyo : The Hokuseido Press, 1963, p.3) তাই ওকাকুরার বিদ্যারম্ভ হয় ইংরেজি ভাষায়। পরে তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Book of Tea*, *Ideals of the East* ইত্যাদি ইংরেজি ভাষাতেই রচনা করেছিলেন।

'বালক বয়স থেকে তিনি পারিবারিক পরিবেশে পশ্চিমী প্রভাবের মধ্যে থেকেও প্রাচ্য ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য পোষণ করতেন। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে সেই দ্বিমুখী প্রবণতা ক্রমে সুনির্দিষ্ট পরিণতি পায়।' (সত্যজিৎ চৌধুরী, 'ওকাকুরা তেনশিন ও অবনীন্দ্রনাথ', কলকাতা : *বিশ্বভারতী পত্রিকা* কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৩, পৃ ২৩১)।

জাপানের প্রাচীন শিল্পকলা সংরক্ষণ আন্দোলনের পথিকৃৎ মার্কিন অধ্যাপক আর্নেস্ট ফেনলোসার সঙ্গে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে পরিচয়ের সূত্রে ওকাকুরার জীবন নতুন মোড় নেয়। তিনি প্রাচীন শিল্প বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৮৮৯ সালে টোকিও বিজুৎসু গাক্কো নামক সরকারি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হলে ওকাকুরা তার রাজকীয় সংগ্রহশালার প্রধান পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৮-এ ওকাকুরার নিজস্ব শিল্প-বিদ্যালয় নিপ্পন বিজুৎসু-ইন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ সালে তিনি আমেরিকার বস্টন মিউজিয়ামে চীন-জাপান বিভাগের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। এই মিউজিয়ামের অ্যালবামের মুখবন্ধে ইয়্যান ফনটেইন লিখেছেন : 'Okakura Kakuzo was undoubtedly one of the greatest connoisseurs of Far Eastern art of his time...'

যদিও এই শিল্পের জগৎই ছিল ওকাকুরার মূল কাজের ক্ষেত্র, তবু তাঁর প্রাচীন শিল্প-বিষয়ক গবেষণাকে তিনি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত দিতে পেরেছিলেন। এই প্রাচীন শিল্পের সন্ধান করাকে তিনি স্বজাতির আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে মনে করতেন। তেমনই মনোভাব নিয়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। প্রথমবার, এবং দ্বিতীয়বার, ১৯১২ সালে। প্রথমবার তিনি সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— দেশের জন্য কী করবে বলে ভাবছ ? দ্বিতীয়বার তিনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বস্টনের মিউজিয়ামের জন্য প্রাচীন ভারতীয় শিল্প স্থাপত্যের নিদর্শন সংগ্রহ করার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে ওকাকুরার যখন পরিচয় হয় তখন দুজনের কেউই হত বয়সে তেমন নবীন ছিলেন না, তবু তখনও তাঁদের রোমান্টিকতাটুকু অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই বুঝি ওকাকুরার মন প্রিয়ম্বদাকে এক ঝলক দেখেই আন্দোলিত হয়েছিল। আর প্রিয়ম্বদাও এই মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যদিও তাঁর মানসিক গঠন এবং পরিস্থিতি তাঁকে সুস্থির রেখেছিল। ওকাকুরার চিঠিতে তাঁর ভালবাসা অনায়াসে প্রকাশ পেয়েছে, তুলনায় প্রিয়ম্বদার চিঠি অনেক সংযত। যেখানে প্রিয়ম্বদা বাধা-বন্ধন মুক্ত, সে হল তাঁর 'নোটবুক'।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী একবার ওকাকুরার চা-গ্রন্থের এক অংশের ফরাসী অনুবাদ অনুসরণে 'শিল্প-সৌন্দর্য্যবোধ' নামে একটি লেখা লিখেছিলেন *জয়শ্রী* পত্রিকায়, আষাঢ় ১৩৪২-এ। তিনি লিখেছিলেন : 'শিল্পীর আঙুল টেনে বের করে স্বর— কোথা থেকে তা আমরা জানি নে। অনেক দিনের ভুলে যাওয়া স্মৃতি নতুন অর্থসম্পদ নিয়ে আমাদের মনে উদয় হয়। যে-সকল আশা ভয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল, যে-সকল ভালোবাসার আবেগ আমরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই, সেগুলি নবীনতার লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়।'

ওকাকুরা যেন সেই শিল্পী যিনি প্রিয়ম্বদার ব্যথার গভীর থেকে 'স্বর' টেনে বের

করে আনেন, প্রিয়ম্বদার অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-যন্ত্রণা ভাষা পায় তাঁর নিজেরই মাধুর্য্যে। 'Who wants to be perfect– I don't. Perfection means cessation of growth. I want to be imperfect and grow, to be alive, awake and with longings . . .' (প্রিয়ম্বদার 'নোটবুক', ২১.৪.১৩ তারিখে লেখা)।

প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে পরিচয়ের এক বছরের মধ্যে, ১৯১৩ সালে, ওকাকুরার মৃত্যু হয়।

ওকাকুরাকে প্রিয়ম্বদা

১.

In appreciation of
The Book of Tea

শুকান চায়ের পাতা কে জানিত তায়
সবুজ ফাগুন ছিল ভরা কবিতায়!

মাটীর ঠুনকো ছোট ঝিনুকে পেয়ালা,
জীবনের হাসি খুশি খেয়াল দেয়ালা
ফটিক সোনালি জলে সকলি দেখায়!

জাপানি, চাপানী দিয়ে আঁকিয়াছ ভালো
দিন্ দুনীয়ার যত হাসিকান্না আলো!

৩০/৯/১২
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

Dry shrunken tea leaves, who ever dreamt, held in them yet such green wealth of spring tide beauty and poetry; Fragile, frail, shell-like earthen cup, who ever believed, could reveal in a drop of gold-pure liquid the joys of a life-time fancies and divine dreams; Beautifully hast thou, son of Japan, painted eternal life's smiles and tears, lights and shadows in thy tea-water-colour.

1.10.12
Priyambada Devi[২০]

২.

46, Jhautala Rd.
6. 10. 12

Dear Mr. Okakura,

I hear you are back from Puri and will soon be going away to Mathura. Mother[২১] and I shall be very pleased if you and Suren[২২] come over and have a few Indian sweets and a little sherbet with us afternoon at 5pm– I dare not ask you to tea.

With kind regards I remain.

Yours Sincerely
Priyambada Devi

৩.

The unsatisfied longing[২৩]

I (can) not hold thee, can not hold thee, blend thee in my heart and make thee mine—thou light of the skies—I can not hold thee, can not hold thee, although I love thee ever and love thee much.

I can not bind thee, can not bind thee, weave thee and twine thee even into new rhymes, oh my love, my all—I can not bind thee, as I can not find the words to create the form I dream of, love and long for.

Dedication[২৪]

Under the open unclouded noontide sky, I had once with careful fingers traced beauty lines on my forehead and on my cheeks, in cool pure sweet sandal water, for thee. And beloved with a look of delighted surprise thy dear eyes had then at once, made perfect the meaning of that delicate tracing.

Oh this sad eve, with a heart moaning for thee, have I again traced new sandal marks on my breast—alas where art thou? Deeper darkness envelopes me, and fast falling tears deface the soothing inscription.

An Enigma[২৫]

Alas I never can make thee out my heart, for at times I find thee lying in me like the dull, hard, insensate, insensible stone, heavy and unbearable, or unceasing came of ever tiring sharp and constant pain.

And suddenly again I find thee blowing away like the sandal scented southern breeze, breathing life into myriads of flowers, awakening in them all the colours of the rainbow, overflowing with sweetness of sound and touch, deliciousness of scent and colour, at every breath—quite beyond all possibilities of control.

Unfortunate[২৬]

The lucky vermilion mark was not on the forehead, absent was the golden bracelet from the wrist, the flowery garland painted at estrangement

broke and dropped off from the neck—but as thy dear memory lived beloved in my heart, I felt myself a queen indeed, dignified on a jewelled throne.

Alas futile tears dry up and lingering remembrance fades and at last life seeks shelter trailing in the dust unfortunate forever.

The spring breeze[২৭]

Alas futile tears dry up and lingering remembrance fades and at bakul and champak, blushing 'parul' and rose—yet still the wind blows on unconscious.

Never lost in dreams does he weave garlands to wear round the neck, never garner memories in the hollow of his breast—the unchained lunatic only runs onward.

Blowing and scattering memories of spring all over the earth in scents and whirling petals, in the song of birds and the humming of bees, in the soft cool touch of the fresh reviving air, unconscious and unawares joy wakes uncalled, tears swell up in the longing eyes and yet the spring breeze rushes onward self-lost and all unconcerned.

The Endless[২৮]

The longing and the eagerness of spring is nurtured by summer when young fruits cluster round the branches and dainty buds droop away.

Flowers shake of the scent and lie on the scattered petals in the ground, but slowly the fruits swell up filled with sweet juice, scent and colour.

Alas this longing, this eagrness borne in by autumn, when shall it find its fulfilment, where its end? The distant void sky holds not a speck cloud, and the flowers and leaves of other days, where are they? The trees all over stand bare, dry leaves scatter and cover the face of the earth, and thirsty dust fly about in the whirl wind.

৪.

Ungrateful[২৯]

We rifle thy heart for gems, and churn thy breast for pearls, with sharp iron ploughs delve deep into thy soft green body and with careless ease

appease our hunger and thirst. Merciful mother, with patient diligence, we pile granite slabs on thy bosom, and builds palaces and theatres and temples, that spear the clouds with their spires. With eager greedy hands, we pluck at thy bridal vesture and laughingly make our beds of love delightful with the first fresh flowers of thy spring. Yet alas, day and night our in constant hearts fly away to that distant horizon afar, where birds rush on with wings outspread, carried over by joy and suddenly vanish in the unbounded light; where the dark clouds foster the lightening and the sun and moon and stars lay bare the heart of darkness.

Morning (Prayers)[৩০]

Dear Lord, I arise at thy call, thy morning light stands waiting beside my curtained lattice. My eyes are still hazy with the dreams of the dim night, and in my heart clings the longing of a caress that comes not. Wash my eyes pure with thy loving mercy, clean my heart with thy benign touch and pour into my soul the limpid light of thy dawn, innocent as the open looks of a wondering child, filled with the infinite hope of inexpressible prayers.

Noon[৩১]

Beautiful Lord, thy sun hath attained the zenith, shadows dwindle, the trees droop, the hum of honey-seeking bees is restrained, the eyes filled with constant light, burn and seek solace in shade. Temper revelation O Thou Benevolent one, with mystery, the refulgence of thy countenance with soothing sympathy; so that I may look on untired forever, and let the rapture of thy love pour into my heart making it bright and fresh for all times.

Evening[৩২]

Evening shade gathers, shadows stretch and linger, daylight waves, the dusky twilight lures me with her glamour, dark night awaits to enmesh me in her net of intangible dreams — O Thou All-Knowing one, let Dhruba (Loadstar) shine his brightest, Saptarshi (constellation of seven stars,

named after seven sages), hold their unflickering lamps high up, so that I may guide my frail boat aright on the unknown ocean tide; and steer straight till I reach the longed-for haven of the presence and ever-abiding peace.

My heart longs again to hear thy liquid notes, divine fledgling, love, thou guest of flitting spring; not this autumn but long ago, when soft south wind was waking the woods with its sandal-breath and opening buds fluttered their eyelids, I saw thee flash by on thy rainbow wings and heard thy rapture call. Since then fierce summer and weeping rain have passed and now autumn calls to me with her opening skies, spreading fields, marching breeze and the hushed voice of doves whispering vesper in quiet wood lands. Come flash by once again, pouring thy cascade of song and rouse in my widowed heart the laughter of my unborn babes.

৫.

46, Jhautala Road, Balligunge,
Calcutta, India
28th May 1913

Dear Friend,

Though you had not told me anything, when I received your last letter from Boston, at the end of March, I knew all was not right with you.[৩৩] I felt you were not well and that was why you were hastening home. As you had kept quiet about it, I could not ask you anything, could I? But all the same, I was ill at ease. It is a comfort to know that you were safe at home and among friends and relations who love you so. Don't you believe in telepathy? I do. More things are made known to us by it, than by telegraphy; but we dare not give them out as truth, as the message comes in ciphers and the code is known to few!

What ails me you ask — I hardly know. Is it anything definite? — a dream, a realisation, I am not certain and I dare not probe deep enough for final knowledge. Somehow my days have become unrestful, the cloister stillness of my heart has been disturbed, I am disappointed in my self. To doze in half lights is to be happy, for dreams come most when

one is half-roused. But to be fully awake, alive and sentient, to look into the inmost core of one's being is sorrow only, for it is to know the "Eternal Sadness of things". To be at once conscious of evanescence and immoratality and to bear the thrust of the double-edged sword in one's soul, without being able to realise, whether it is extacy or intense pain.

Yes I heard from Rabi Babu, he said, the language of the translations was good, yet something was wanting. The prose-poems in English had not formed into crystals perhaps, by that he means, had not assumed definite shape. I was myself aware that they had diffused and lost form. He does not discourage, but asks me to go on translating them. Did you enthuse about them to him — for he has had a fling at me saying — I shall not be wanting in friends if I needed to publish them[৩৪]. I know he thinks I have not used my gifts well — I have lazed, I have dreamed only and not realised anything . He thinks it is weakness on my part to be sticking at home and doing the monotonous routine of small duties. He is a man and can not realise that a woman's life is limited by many things — mostly by her own nature that can not alienate itself from those nearest her, she must first serve them before she can take her place in the wider life. With her the first maxim to be always followed must be "Charity begins at home" — I know it spreads wider — but leaving my duties at home undone, if I tried to do something outside, will it be good, I wonder. Can it bring self-satisfaction and peace of heart? Little duties are not always pleasant. They are irksome, to be compelled to live within the limitation of narrow walls — when the heart longs to have the infinite sky for her race-course is pain too, but inspite of all, to reconcile oneself to these, not for selfish motives, but because others have need of me can it be shirking of duty? If friends become doubtful of you, it is perhaps the greatest sorrow, to be misunderstood hurts. Yet to know one's limitation, and to try to conform to it, can it be wrong? Tell me. You are wise and have greater experience. Can renunciation ever be futile? I have digressed — yes, when you are quite well and when it will not be any worry to you, I shall send the translations to you. You can then with your friend choose the ones you think best, and have them published[৩৫]. I am not at all sanguine about their welcome in the West. They are frail flowers and transplantation will most probably kll them outright. To tell

you the truth, I shrink from publication even of the originals. My first book of poems was published seven years after they had been written, the second one ever after a longer period.[৩৬] I have had in my desk manuscripts ready for two or three small books. Yet I do not want to send them either to the press or before the public. The appreciation of a few friends and relations is happiness enough for me.

Tell me what you are suffering from and what is the opinion of the doctors. Do be good, and get well soon. You ask me not to worry, knowing you are ill; I can not promise that I shall not. Human hearts are not fossils but living organisms that respond to pain and pleasure. I am only human, and can I escape the possibilities. Don't you see the helplessness, and the hopelessness of it all, and how it will weigh on my mind. Who knows whether I shall keep well, I shall try to be so — that is all I can guarantee for.

I have read your opera several times and each time, I have found out new beauties.[৩৭] I like it very much. It is concise, well-proportioned and vivid. One can see the scenes and hear the sounds when reading it. I am sure the stage representation will be charming — I wish I could see it. Please do not doubt my sincerity, have I not been frank with you — perhaps imprudently so sometimes? I have just finished reading some plays by author Tchekoff. They are plays no doubt, but they are not dramas. There are beautiful thoughts in them, but they have no shape. They are long drawn and drawing, and lack the intenseness of feeling which make situation dramatic. In yours, one is even dominated by the strength of passion displayed by your savage knight and the lines

"Far though you fly
Never shall you overstep
The frontiers of my keen desire"

make one feel frightened. Please do not feel concerned about my sadness, it is a habit of years and has grown into a second nature, and the difficulty is that it gets beyond me sometimes and causes trouble. I shall however try to set the mental balance of things right as best as I can, and

gradually perhaps attain the longed for peace. Keats' lines haunt me day night–

"O for a draught of vintage that hath been
Cooled a long age in the deep delved earth
That I might drink and leave the world unseen
And with thee fade far away into forest dim,
Fade far away, dissolve and quite forget
What thou amongst the leaves hast never known,
The weariness, the fever and the fret."

Shall I ever come further East? If intent thought can regulate events as it is said to do, perhaps I shall come someday. I have a great wander thirst in me and ever and anon. I long to run away from my cramped life and taste the joys of a nomadic existence — wandering from one place to another feasting my eager eyes with beautiful sights — feeling more like a pilgrim than a tourist. I love to travel, the difficulty is about my mother. I can neither take her with me or leave her behind. Her health is delicate, and any discomfort may mean great illness for her. So I restrain myself and live in the home nest, all the year through though my longings are all for migration. Luckily I am exempt of all habits of creature-comforts. You have sent me your sea-thought. I am sending some of mine to you. That is all the return I can make. For an invalid, what gift more suited than flowers? My garden is full of white blossoms with deep searching perfume. Tuberose, jessamines, golden hearted white champaks and Hasu-no-hana spread their delicious fragrance all over the house. I am helpless. I can neither send nor take them to you. My little poems go. Please accept them with my best thoughts. Mother sends her kind regards — she is sorry you are not well -- and hopes that you may be so, soon.

Yours very sincerely
Priyambada

A Bengali grammar for you I am sending by this mail, it has been lying a long time with me. It is not a very good one, but this is all I could hunt up. Have I tired you out with my rambling letter? Tell me truly do you really need my letters now that you are at home?

The dream journey[৩৮]

Response there is none of floating boats on those waves. They rise and fall and overflow with the ever joy of soul And out of their depth rises a mountain king, with brow serene. The roaming ground of lights glorious, Where misty vapours in self forgetfulness gather in clouds of grace. On that mountain crown my companion-bird has built his nest. And in the moonlight, before it is dawn he sings alone, calling to me by my name. Ah that sweet name call, comes gliding through the air, sweeter and sweeter. Swimming through an ocean of dreams I shall surely reach there, the nest Elysian.

25.4.13

28.5.13

Ah me, every thought dissolves in tears, on this sunny morn, because thou art far away. Each breath turns into a sigh, and the flitting tremulous smiles look like drenched flowers of a rain-swept valley.[৩৯]

19.4.13 28.5.13

Euthanasia[৪০]

In thoughts of thee I live, with thoughts of thee I shall die — as the moon fed by sun's rays, lives at night, and by its effuigence dies at dawn.

23.4.13 28.5.13

Irrevocable[৪১]

All my thoughts have flown seeking thee, like arrows from the tense bow, and will alas never come back and fill the empty quiver of my heart.

1.5.13 28.5.13

৬.

46, Jhautala Road, Balligunge,
Calcutta, India 4.6.13
Night.

Dear Friend,

Please, please forgive me for the pain I have inflicted on you by my thoughtlessness. When I first wrote asking you about your home and relations, it did not then strike me that you could be hurt in any way, when

some days later, after the latter was posted and was beyond recall, suddenly it dawned on me that it might be so. I felt very penitent and wrote to you at once, asking your pardon, requesting you not to tell me anything. That letter must have reached you by now, tell me dear friend again and again that you have forgiven me and assure me also that you have forgotten that I had been thoughtless, stupid and unkind. I shall never be so again. I shall certainly shelter and cherish my dream foundling of cloud and mist with tender care and will not be aggressive, nor graspring in aught.

Tell me how you are now. Has the new treatment done you any good? Doctors are kindly people no doubt, they try their best to do us good, but their treatment sometimes is very harsh, and as they are neither all-knowing nor infallible, one naturally feels nervous. It will be a great relief to know that you are quite alright. Do you think it ridiculous of me to feel concerned and do you doubt the genuineness of it all? Don't, it is real enough, pleasure may be a mirage, but pain is only too real, it throbs with life so that it leaves no ground for doubt. I have often taken myself to task for this anxiety and said it was all a non-sense, a mood, a phase, a shifting cloud, a changeling dream but my inner self refuses to argue, clings to her own view with solemn silent dignity and so I let her alone. If she loves worry, she must have her fill of it — I can do nothing. I would not answer you, when you had asked me about my changing, in your first letter from Boston. It was then a mere possibility. I doubted very much that such a thing could be, but now I am certain of it. I owe it to you. Knowing full to all the extent of pain and struggle it will mean for me, yet I am rather glad that this change has come over me. Yet I hardly can let myself trust that I who was not even a name to you before October last, can really have appropriated a portion of your thoughts within these few months! Have you truly put some value on me? I know my worthlessness only too well, yet it is sweet to be made much of and even have undeserved praise. Tell me, when you first thought of me, was it after you left Calcutta, at Muttra, in Bombay, on the Indian ocean? What made you think of me? Are you never afraid that I may be a mirage, a Chimera, a will-o'-the wisp, an illusion only? I may [be] all these, yet who knows I may be a reality too! Please do not think of me as an impossible perfection — I am nothing of

the kind. I am only a human being, with very disenchanting limitations, if I have some good qualities, I have very many faults too. I hardly have any claims to reverence. Don't please say that you approach me with reverence. It makes me feel so ashamed. I am only a woman, a human being, and that I think is dignity enough don't you agree with me?

When I was in Mirga Pore I felt that you were compelling my thoughts in some mysterious way and as I then did not want it to be so, I wrote this poem.[8২]

> "Unknown stranger, why dost thou send
> unceasing thoughts, innumerable, like a
> swarm of rushing bees? seeking for the
> honey of lotus heart? The soft flower
> has long been enclosed in a crystal case.
> The initiated know that there lives not
> a hope for a drop of honey. Honey
> tempted delicate messengers, go back
> one and all go back home. Do clever
> diplomats ever waste life on a futile
> embassy?"

Comparing dates I find now, that it corresponds with the day you wrote your Jade tree poem.[8৩] So you see, my belief in telepathy is not all wrong! Oh dear me, so I became a Garuda on the night of the 7th May and bore you up to the seventh heavens?[88] You know the god the mighty bird carries on its back? — it is Vishnu, the Preserver. So you will have to become "Chaturverja" bearing in each hand the dire dise, club, conch and lotus. You will have to be a preserver indeed, all goodness and mercy before I can take up my work. Ordinarily our thoughts about Garuda is [sic] connected not only with power, but an overpowering meekness. When we want to speak of some one very humble, we say "ah, he is a veritable Garuda". I do not know why he the powerful one is associated with humility, perhaps it is only because, in representations of him we always see him kneeling with clasped hands before his divine master. Do you fancy me in that role? Yes, Kolha rather resembles a word we colloquially

use for the fruit plantain — and is supposed not to be polite enough.[৪৫] Would "Shukla" do? It is a Sanscrit word which means pure white, and is a feminine adjective and can used [sic] as a proper name too.

You want my permission to give me a gown that your ladies wear, do so if it is any pleasure to you, I would have preferred your bringing it to me, some day when you come. Tell me, shall I have to wear it as a cloak or use it as a dressing gown? You know, how restrained I have to be in matters of dress, so please do not give me anything too expensive — in matters of colour, I know, I can rely on you entirely. You ask me about my family crest — My father's people are Kulin Brahmins, people who have thought and thought and did away with all the superfluities of life. My husband's people belong to the landlord class, but they are Kulin Brahmins too. I do not think they have any crest. If among the Bengal gentry, any have it, you may be sure, it is an innovation, adapted in imitation of the West. It is the royalty and the Kshatriya chiefs of the land who I think really have crests, genuine and ancient. I love all white flowers that have a deep scent, jessamine, tuberose. So, Lotus is the emblem of our land, and Chrysanthemum, is it not yours — choose between these — your choice will please me more than mine own. The long rambling letter must come to an end. I am afraid I have tired you out. I have written as my heart has spoken. Taking no thought of prudence or convention, and I trust to your goodness and honour to guard my confidence. I am sending two poems to my dream foundling — please be not naughty, read them with child-eyes. The other was written about the time you were writing to me on the 4th of last month. It proves telepathy too. With very kind thoughts.

Priyambada

Dream-foundling[৪৬]

With thee in my arms I awake, and rouse thee with the ray-caress of my eyes. With thee beside my heart, I slumber and I dream. And all through the burning day, often and often I suckle and soothe thee with my life nectar, so that thou mayst live and live forever.

9.4.13

Lisp my babe and pour into my ears the music of sweet nothings that none dare say to me, touch me with pure gentle hands; be not blind like the naughty little god, but leaning thy tired head against my breathing breast, look with the infinite wonder of innocence into mine eyes.[৪৭]

17.4.13

Surrender[৪৮]

If with martial mailed fists, thou hadst knocked at my portal, surely it would have stood unyielding and measured strength with thee.

But hesitating was thy touch, soft and sweet as a child's, pleading for entrance, to its mother's chamber. Ah, what woman can resist such tender petition and withhold gifts from praying hands?

Take thou my gifts, impoverished, let me yet know the peace of uncovetous heart, the joy of uncraving days and for once let mine be the glory, that breathes in reaped autumn fields and in the rain-shorn fleecy clouds.

4.5.13

৭.

46, Jhautala Road
Balligunge, Calcutta
India. 13.6.13
Night

Dear San,

If moon, why not in the sky? Why in the water? Did the wise man think, that thus, she will be easier of capture. Deeming it difficult to reach up to the heavens, does he imagine to get at her by diving in the deep? In the water, she is only a shadow, and often does not even retain the form original and is an elongated unreality. The least attempt to grasp at her there, will be to break her into thousand scintillating bits, causing them to scatter and float far away, making it quite impossible to gather again, catch and retain in one's net. In the sky, though afar off she has at least the dignity of reality. She wanes and grows and with life at its last ebb,

bearing a scorched heart, still sheds beneficient rays to revive drooping plants, tendril-spreading creepers, dear delicate blossoms and sweet murmuring leaves. Or were you thinking of the moon in the days, when she lived secluded and secure in the ocean king's palace, when even the gods had not dreamt of her or thought of churning the restless waters to acquire her as the everlasting nectar cup filled to the brim?

Tell me your thought, and do not please laugh at my effusion!

Do we ever deserve the good or evil of this life. I shall be very sorry indeed, if I thought that sorrows came, because we dreaded them. And in happiness, do we not always think that we have had more than our dues and just because so, we felt happier. I might turn the tables and ask you in return what I have done to deserve kind thoughts from you—if you can tell it to me satisfactorily, I shall then try someday to follow your example. Does one ever know the whys and the wherefores of these things? Perhaps it has nothing to do at all with this life, and who knows it is not the link of another, which had to be and is. Why turn vivisectionist? Let mystery have its place in life, so that dreams may come and vision flourishes. I have told you time and often that I am quite an impossible person. I have either fore-thoughts or after-thoughts, the present somehow seems always absent. So after sending my last letter it slowly dawned upon me that with the knowledge of my hearts awakening you may take into your quixotic heart that it entailed upon you some sort of responsibility. It does not—I claim none. You had wanted to know, and thinking to make you happy, I have told you what I knew. If a word will make a universe, why withhold it? If it really brings you joy I shall be content. I have won a friend, I know, and don't you feel that you have gained one too? And the duty of each would be, to help the other to be true to his or her own best self. I shall only claim kindly consideration and tender thought, mine will henceforth be always yours. There are certain things we say only once, because we must, because to keep quiet is mutual pain. But once said, ever afterwards, silence best expresses the heart. We count our rosaries softly, and say our prayers only in the inmost sanctuary of our soul.

Why should we quarrel, and so soon—why even before we have had an opportunity of speech—don't now! The injunction of our wise old man

has been that we should speak a hundred things, but never write down one. I have disobeyed their dictates sorely—who knows what dire punishment is in store for me? I am sure I shall disappoint you, because I know, I shall be quite incapable of saying anything when you come. Will you not give me grace then? I am really a very silent person, except perhaps when the mood is on me, then I burst not often in talk, but in writing.

Why retaliation? Have I unfurled battle standard? If I did, are you quite sure, you will win? It will not be vengeance at all, if you ask me about my "past sentiments". I shall love to tell you all—the long long years of silence, has been a dead weight on my mind, and it will be a relief to lift it. Do you know what Mr. Dickinson asked me about you?[৪৯] We were talking of your chapter on flowers in your Teabook, when he suddenly said—Is Mr. Okakura fascinating? I was taken aback—and told him "Well, he is a very silent man". The old don did not take the hint and went on talking.

We are having a long spell of bad weather. For over a fortnight the sky is one uniform ashen grey—rain pours incessantly, no break in the clouds, not a shaft of light anywhere. The wind is lethargic and the trees stand with heads bowed with the weight of water and weep so. There is no flash of lightening, no clash of thunder message to awaken one up. My heart droops droops and I long to cease to be. Light-mendicant that I am I feel dreadfully miserable.

You say all your thoughts are mine. Yet you grudge me the gift of a few poems. Are they not your thoughts? What has come over you that your words do not tally with action? You say they are not good, please do not underrate my possessions—do let me have a chance of judging them. I am sorry. I had a thought of not sending any more of mine to you. You have had quite enough to last life time. Yet I send—because I am not you. Is it not curious that the same thought strikes you and me at the same time, though we are so far apart? You thought of cloud-capped peaks. I thought of them too a month ahead of you, so I send that poem. Can I help you to write aything. I am ignorant, neither versed in history nor in the manifold things. You know, only my heart blossoms out in verses sometimes. Would they bring you suggestions? You want to know the secret of my

art? It is artless-ness I suppose. For when the mood comes, I only feel, and say what I feel. A sort of prescience comes upon me, by which I know, that blossoms await gathering, and that I must not delay or else they will fade and vanish. My task is only to put the songwords that pour forth, without any effort on my part, on paper, enchain them in rhymes and swing them in rhythm. It is more unconscious yielding, less conscious effort. So when they do not please me, I am helpless. I can neither improve nor write them anew—the opportune moment gone, I have to discard them altogether.

Yes, the picture was taken before your poem reached me. I am pleased you like it. I must stop now. Artistic restraint is very much wanting in these letters. I do hope you do not keep them. Shall I hear from you soon—please write oftener, I worry so when I do not hear from [you] for a long time. Are you quite alright now? I was ill last week and had to take to bed. I am well now. I shall tell you about the publication of the poems later on, they are not translations enough to fill a book. With kindest thoughts and good night.

I am Priyambada.

A Query[৫০]

My eagle pinioned saviour (in the original the word is another name for Garuda) to what heaven aspiring heights wilt thou have me soar? Range what infinity in flight with thee? On what cloudcapped precipice build the eerie nest of our night slumber, and so pass on to space unending?

My jewel crested thousand hooded one, to what fathomless depths wilt thou have plunge, through what dream-lit shadow lands make me journey on, to a time that never was born?

Written 19.4.13

13.6.13.

৮.

46, Jhautala Road,
Calcutta, Balligunge, India
24.6.13

My dear San,

Latterly your letters have come intact, the seals have not been tampered with at all.[৫১] Why wont [sic] you say that my letters contained

a vast amount of foolishness too. Did you think I shall take offence. I am not so very silly! Or does the wise man really think that the precious epistiles held all the wisdom of the East in their weary length? I am not all ashamed that they are foolish—rather glad that they are so; as you say like them, as also because I feel happy when I write them. I shall ask Gagon Babu about his mails, when I meet him.[৫২]

I am sure I shall like your boatman.[৫৩] Will he tell me many many stories all misty and mysterious? (You will interpret—won't you?) Won't he tell me what he has seen, what guessed and what he knows? Will he relate to me the story of Urashima Taro, who went away with the casket and alas never never came back again to the Sea King's daughter? What do you say to him, of India—won't he like to come here to go to Budh Gya [sic]? Tell me, is your speech as sonorous as Sanscrit when spoken? I sat looking at the characters trying to find similarity to our ancient alphabet, Devanagari.

You love the sea, I love it too. I shall never forget how my heart was stirred, on the first sight of it. It was at Puri on a sunlit morning. It surpassed all my dreams of it, for it was more immense than infinity itself. The horizon could not bound it, but drew a line only over its heart, while it rolled on far far away, beyond all limit. It made me think of life, of love, which earth can not bind, death do[sic] not limit and infinity itself can not contain. For the first few days, I could not keep my eyes off it all through the day and most part of the night. I could not sleep and would not read as both these would have prevented my looking on. And then, I loved to bathe in it. To be tugged, pulled, pushed, tossed and buffetted by the waves was a delight to me. I laughed and yielded myself to them, feeling happy to have at last found play-mates quite to my liking. Their restlessness made the quiet and content. In the evening when the sun suddenly plunged into it as if for a dip, when it leaped up again at dawn refreshed but with red eyes (for being in the water too long) and when the moon's golden globe was slowly pulled with silver chains from the ocean-bosom. I was always on the beach, looking on and feeling happy. Tell me what dreams you brought home, twined in your fishing rod from the sea —were they happy ones? Send me some.

You ask me what I do the whole day? Also there is more dreaming and less doing in this silent little house. I get up early, say at 5.30 A. M. (I am not allowed to leave bed before that, only daughters are much too precious a possession—they are like sugar dolls, can not stand either dew or sun, much less rain) and go into the garden, walk about for a while trying to make out the needs of my little plants and then tell the gardener what he is to do about them, ask him to cut vegetables for the kitchen and flowers for our rooms. I see to it personally—as I do not like my flower, giving plants to be dealt with thoughtlessly. We arrange our flowers generally—sometimes letting the gardner do it. He is an old man and feels hurt if he is not allowed to do so. When mother is up, at half past six we have our morning tea, but do not eat anything. Then I give out the stores, arrange about food for the day and settle about marketing. These done, I see that the doe is taken out and given her food. On some days I clean her body with a brush. She is very grateful then, brushes her face against me craving for caresses. Her name is "Ena" — which means a doe in Sanscrit.[৫৪] She is growing stout at the expense of her mistress, who I hear is growing thinner. Let the gross body all go. Mother looks after the feeding of the birds. She is not over fond of the doe, that is why the poor creature has more love from me. At half past seven, I have my morning bath and get ready for my lessons with Suren's father who comes and reads with me daily for an hour and a half.[৫৫] We are revising the Upanishads. I read French with him too. Then about 11 A. M. we have our breakfast. Mother retires to her room, I to mine, I have a small one all to my [sic] myself (it is the one you see in the photograph which has one window open). Here I spend the whole of my day and half the night—but I sleep with my mother. In this little room I read, write, dream and do nothing, while the canary goes on singing. A sweet little boy, my cousin's son, is living with me now. I help him with his lessons, his dressing and teach him to keep his things tidy. After he comes back from his school we have our afternoon tea and if I am not going out anywhere I rest a little, lying on the floor, but if there is any engagement, I bathe again, change and go out. We dine early and are back home by half past eight. Generally we go and see our relations, who live near here. I love walking and if I can find a companion I do not bother about carriage. Sufficient unto the day are the duties thereof. I am

ashamed to own that I am not a clever cook. I can just manage to prepare ordinary things, a few sweets and perhaps one or two dainty dishes. I was needlessly taught Ethics, Psychology and Botany (all of which I have forgotten quite) but no cooking. I taught it to myself. I can embroider a little, darn and mend but can make no new dresses. I housekeep because I must but I am not so thrifty and careful or routine-loving as real good ideal housewives ought to be. I am neither useful nor ornamental—I am unsatisfactory. I tremble for the pronouncement of judgment from a very sane judge. I have a great deal of nervous energy and can bear physical hardship—though perhaps I am not very strong. I had painful operations done to me without chloroform by choice. I sat very quiet, only I could not keep my lips under control, they trembled so and my doctor-uncle's eyes filled with tears to see me thus,[৫৬] though he called me a brave girl. He says I am a sleeping volcano, are you not afraid that I might burst into burning lava and bury all you [sic] vines and you too in the bargain someday. One thing I can do rather satisfactorily, nurse sick people. I can keep up for nights and sit on through days by the bed without feeling tired or tried. I like to teach little children, they interest me so that I do not feel impatient when they are stupid, and last but not the least, I am passionately fond of wee babies, and feel a great joy in devoting my time to them. I think I have given a fair and maybe honest list of my few abilities and many disqualifications. If this letter floats on the drippings of egoism, do not blame me, you brought it on—trying to give evidence one promises to tell the truth and unconsciously exaggerates or minimises. Do forgive if anything seem unwelcome.

Tell me what thoughts torment you? Please do not worry, fret or feel sad about anything, if you do that, I shall lose all peace of mind. Let the past go, the future live unconcerned and the present though maimed, halting, like an incomplete child have more of kindlines from us. If more may not be, let little all-suffice. Getting up at two in the night, to go angling after dreams, is it wise? I do hope it will not make you unwell in anyway. I do not know if writing to you in Bengali would improve matters much with me either; but alien speech is always a difficulty. Yet I am very grateful to it because it has made our communication possible. You are naughty, professing love for India never tired to know her language.

Suren will be leaving England on the 27th, and reach here about the middle of July. All his family are doing well. I am not aware what the bath gowns are like, that you wish to send to his mother and wife,[৫৭] but you know the way we dress, and I am sure, will be able to make the proper choice. What can you do for me from Japan—do not let the mails come away without a letter for me. Tell me what I ought to want, I find it very difficult to choose anything when I am given the choice of doing so, all my needs seem to vanish all at once. Send me anything that pleases you, it will surely make me happy. I am sending you two picturers taken by my cousin, one, of the immaculate snows you love so, and the other, of a spray-uplifted wave. Tell me what you think of them, specially of the latter. I am also sending you a very small gift hardly worth acceptance, an empty little purse, take it please and make it useful in some way. Could you open it? Your atrocious poems make me happy and sad both, do send me more. I sat looking at the brushtraced characters in great joy, they make me think of the mysterious and the unexplored. Do breathe, do not stint yourself of the life breeze, the bird is of clipped wing, arrow-struck, can not fly away, will sing on till all its voice drop away and its eyes go quite glazed. Am I naughty? Yes some times. Great deal of it has been crushed out a long while ago, yet nature can not be killed altogether. I am cherishing the moribund morsel for some one's trial. Some soul-doctor injected life into it, I hear the heart beats growing stronger often and often. I too have thought that human lives are like fast rooted trees, they murmur and sigh, throw their branches about, moan and sway yet locked in by circumstances they stand immobile and fettered. Poor we, poor life, so sad, yet so sweet. Mother sends kind regards, I send nothing—do I now!

Priyambada

৯.

46, Jhautala Road
Balligunge, Calcutta,
India. 4.7.13

Dear Friend,

I have not had any letter from you this week. Mails from Japan come every tenth day, as I had your letter on the 23rd June. The prescribed ten

days are over and I am afraid I shall have none this week. Who knows whether next week shall bring better luck? You never write, unless you get a letter. Mine of the 29th May will not reach you before the third week of June. So till the weary end of this month, I can not reasonably expect any communication from you. If only one could always be reasonable, rational, cool and collected, never hankering after impossibilities, a great deal of pain would be avoided, but don't you think a rare bit of pleasure would be gone with it too? All my childish lightness of heart, thinking that your thoughts were mine, is gone, and I feel depressed. Yet my sadness is not all-selfish. You were not well and having no news, I worry a great deal about that too. Yet my helplessness keeps me quiet perforce. I pray, trust to the goodness of things and only hope for the best. Can't you see that, just because I have suffered much in life, my capacity for suffering has only increased and my inmost self become super-sensitive? Very little please much and yet again very little plunge me in deep gloom. But let selfish demonstrations cease, the super attenuated, thin, ungainly personel pronoun 'I', is not a consoling sight. Let us talk of something else. You will be glad to hear that your "White Fox" has been greatly admired here. (Please do not name it so, if you approve of my suggestion and call your heroine Shukla, (u is to be pronounced like oo). May not the name do for the opera too? Bibi, Promotho praise it highly.[৫৮] So does a foreign lady friend of mine and one Bengali writer whom you know. He is Mr. Aban Tagore the Painter's son-in-law.[৫৯] He himself writes well, has fastidious taste and appreciates real good things. My foreign lady friend is sweet. She is half Irish and half Italian, and is naturally and unconsciously a lover of the beautiful, passionately fond of art and full of romance and poetry. She is gentle and good, with soft dreamy eyes, pretty ways, a sweet smile and is always charmingly dressed. I am sure you will like her if you met [sic] her. I am fond of her, but I am ashamed to own she is ever so much fonder of me. Whenever she can, runs away from home and spends whole days with me. Everyone laughs at her for her overfondness of me, but she does not mind that in the least. Mother likes her very much. You can well understand why.

Tell me about your self; how far has the book on Chinese Art has

advanced, when will it be finished?[৬০] Are you quite well enough to take up work again? Won't you someday write about your wanderings? I am sure you can make an enchanting book about those. Won't you? The number of my translated poems is quite decent now, but as they are short ones, I think I shall have to do some more, and then you will have wider variety to choose from. I am trying to translate some nature poems I wrote last year. The phenomena of sun and rain, of mist and lightening, the panorama of the rural woods, bare wintry fields, the sky, earth and sea, their colours some how made me think of our gods, Mahadeva, Krishna, Radha, Rama, Brahma, Tara and others. The colour scheme of our mythology, the different complexions of our gods and goddesses, seemed to me to be no other than the eternal blue, green, grey, white and vermilion that meet our eyes at dawn and dusk, on dark and moon-lit nights in all seasons, and the star-spangled sky no other than the myriad-eyed God Indra keeping awake night after night with love-longing for the sweet, soft, verdant Earth maiden. So on and so forth. Does the idea appeal to you at all? I find the new rendering rather difficult, but hope with perseverance to make the result not quite disappointing. The rains yet reign supreme, with fluctuating sunshine, moaning wind, downpouring torrents, days pass away some how and when these are not a vapours [sic] heat tries one to the utmost physically and mentally.

Hoping to have good news of you soon and with very kind thoughts.

Au revoir
Priyambada

১০.

46, Jhautala Road
Balligunge, Calcutta.
India. 9.7.13
Night

Dear Friend,

It has been a beautiful day, a soft luminous sky, sunshine as much as you want, yet no glare, a tender haze delicately shaded the whole

horizon. White clouds glided by but cast no deep shadows, the fields, the trees, rain-washed and dust-free, looked a charmful green and soothed the eyes—the breeze was cool, light and playful, and I felt a lightness of heart, had a feeling of relief which I have not had for a long time. I was conscious of a wistful happiness—when suddenly every sorrow, disappointment and longing lost poignancy and a mellowed content settled on my heart. So from early morning I have been wanting to talk to you and to give you share of this unexpected restfulness, even from this distance. The pathos of the whole situation melts my heart in tenderness and all my selfish longings fade away at least for this day. I feel strong enough to bear every burden in patience, in considerate kindness never to be hasty or thoughtless. I am afraid I was not nice in my last letter. I was very worried, one can, I see bear thunderbolts with impunity, yet become quite restless when asked to stand constant prinpricks. Little things had tried my patience sore, and with the added anxiety and uncertainty about your health and at your silence. I felt very depressed—do forgive if I have caused you any pain—it was not my intention to do so—I felt sad and I wanted your sympathy. Have you not felt some times that thoughts that had oppressed your circumstances that had seemed quite unbearable, and even life had become quite impossible and you were feeling quite desperate when suddenly, unconsciously, without any effort on your part, the whole mental outlook changed, a tender pity filled your heart and you accepted every thing with a grateful resignation and felt strong enough for any kind of struggle, just because the day was serene and sunshine was gracious? Are the rains in your mother land very trying too and do you then fret like me and feel childishly delighted when there is a break in the clouds? I have been reading Hearne's life and letters,[৬১] quite infuriate [sic] things about his life had been published—why are such things allowed? Did you know him at all? Where are his wife and children? I have read most of his books about your mother land—he really loved her and his style of writing about her is exquisite. Tell me what you are reading now? I am revising the translation of my poems. I am sorry to tell you I find them very disappointing, they some how seem to me to be vey flimsy and shallow. Are they really so or has my mental condition changed and makes them appear

thus? Please tell me frankly are they worth publication. One other thing I must tell you, transposing them in a foreign language I see they look too bare, and in many instances tender thoughts which in the original had a delicate refinement of its own have altogether lost their delicacy and even seem indelicate. Tell me what am I to do about them? They are frail flowers and I am not at all a master artist and have not the cunning of hand that would enable one to preserve their dainty beauty—Shall I be justified then exposing them before strangers and bringing upon them either ridicule or pity? I shall certainly send the whole manuscript to you when you want it—but won't you ask the opinion of some others too before you get them published? I am afraid your partiality for them makes you overlook many defects. I am sending you a few today.

If the day has been beautiful the night is exquisite too now. The moon has shed a benign light all over the sky—and the innumerable starts [sic] throb and glow like so many lamps of boats bound for the voyage eternal over space infinite. What messages do they take, what delicious freight bear? Do not our thoughts, our growing longings newly born voyage like spring breath there too? I sit with my windows open, alone in great peace, the whole neighbourhood is asleep. I am awake with a fullness of heart that makes slumber impossible and dreams are far away. Yet I am happy. After I finish writing, I shall put out the light, envelopped [sic] in darkness shall invite the moonlight to bring me messages from the far off and reveal to me visions that the glare and the noise of day scare away. Every night before retiring I sit thus in the dark with eyes closed and gradually lose all consciousness of the barriers of time and space, the limitations of my physical being drop off and I am only a mind and a soul and all that I love best is so near me that I feel there is no separation, no parting.

Do you never try to collect your mind thus? There are certain thoughts that are like prayer and you never like to think them unless you are alone and in the dark. Suren will be back on Sunday the 13th. How happy his mother and wife must feel. The children are alright. Bibi and Promotho are still at No. 19.[৬২] Their house has not been set right yet. Rabi Babu had to undergo an operation, and this delayed Suren. I hear the operation has been successful. Rabi Babu will not be coming back till the beginning of winter. Gagan Babu

I hear has difficulty with his mail too.[৬৩] I think he will write about that to you himself. Can nothing be done? Tell me how you are. When I realise that for answer to this I shall have to look months ahead and that the letters which come bring me news of a whole month back I feel very unsettled and quite depressed often. I shall have to muster all my strength and call to help my best faith to live my present life. You will help me too in my difficult days and when I am unfortunately weak, won't you? With kind regards from mother and with best thoughts from me, I remain.

Priyambada

In The Rain[৬৪]

The stormy winds howl along, the rain beats from all sides, against my lonely being, overhead the sky is torn to shreds by cruel lightening, and all around the night is dark and dreary. I stand drenched and shivering at thy threshold, seeking sanctuary. Throw thou open the fast locked portals of the unmoved monastry and in mercy sweet, grant me shelter benign.

Written 23.4.13

After The Storm[৬৫]

Pouring showers, roaring storm, flashing lightening and booming thunder have all ceased. Now is heard only, the ceaseless drip, drip of rain from the shivering branches, the slow moaning sights of the weary wind. Lightening goes searching, for her beloved, with a flickering lamp, all over the infinite, and the thunder calls in a faint voice, my love, where art thou?

Written 11.5.13

Twilight[৬৬]

Lo, the evening comes, glooming shadow falls on wood lands near. Silence gathers like a rising flood. Incorporeal love, hovers in heart's sanctuary. Crimson sun hath set, ah, even the pale moon rises not; extinguished are all the stars by the brushing drapery of clouds. Palpitating heart undulates slower and slower. Sleep-arrow struck lie the dream fledglings and music slumbers deep.

Written 10.6.13

Tonight[৬৭]

Darkness-engrossed lie the deep forest glades, the rushes by the brook shimmer in gleams of glow-worm; And the scintillating stars of heaven, swim in a flood of divine moon-light.

Written 5. 5. 13

11.

46, Jhautala Road,
Balligunge
15.7.13

When I had chosen an infinite variety of names, thinking only of the charm of renewed novelty each time, I had forgotten that it is the gods and the immortals, that are entitled to such honour—names in legions—but alas, a doubtful privilege; for how seldom do I deign to remember them? I see the gods are angry at my presumption and have caused forgetfulness in one, by whom I would feign be remembered oftener. I humbly revoke all ambitious choice, it was my ignorance and inexperience that had made me thoughtless but now that I have learnt the lesson of knowledge, I would not aspire to any but a single name, which requires fair speech of me. Always I am afraid 'jewel voice' is no good in this noisy world—the trumpet and the clarion fare far better. It is only in the cloister and in the monastery that the silver tinkling bell has any influence. To what abysmal depth of past has the wise man of the sea-girt land dived, that the poor moon has become pure moon-shine, the twilight fragrance evaporated, the myriad names like the song of summer-bees gone into impenetrable forest regions—and are now fainter than far off echoes? Will this pale leaf, rain-stained, tired and torn with long voyage awaken remembrance? You were longing for a quarell [sic]—here goes the first breath of the storm. Be on your guard, as best as you can! Tell me are you quite alright again. Otherwise chivalry forbids a challenge.

The sky is steel-grey, there is a lull in the storm, rain bursts forth ever and anon in unrestrained showers, making the lazy active for the shutting-in of open windows to prevent flooding of rooms and the spoiling of dear books. Ah, the irony of the elements, no sooner the casement is shut and secure, the torrents cease, infinite blue is resplendent in sunshine, a

soothing breeze, gentle and caressing, calls to one to throw open the window and to let it come in. So the day passes, alternating in shadow and light in hazy mists and tender smiles.

Surene [sic] reached home yesterday, very much the better, in everyway for the change. He is busy again with his office work, quite happy and in perfect health. Did you get the Bengali grammar I sent sometime ago, will it be of any help? With very kind thoughts.

I remain
Ever of one name
Priyambada

A poem goes to awaken Sir Rip Van Winkle. As you are naughty you deserve no name. So I not address you with any.

Reveillez[৬৮]........

Speak, speak to me, though from afar, let thy words rouse response in the breeze, spreading an echo of murmuring melodies, all through the sleeping woods. Let crickets chirp, bees hum and butterfies flit on rain-bow wings, whispering thoughts to opening buds, that make them bloom in colours and unfold in fragrance.

Breathe, breathe the songs to the sky, thy reveries pour, gliding they shall overcome all space, prompting nightingales, at the dead of night, to sing a sleepless serenade to my dream, coaxing doves, to coo twilight caresses, to the glare of my mid-day thoughts.

20.6.13

১২.

46, Jhautala Road,
Balligunge
Calcutta, India, 27.7.13

Dear Friend,

Tell me why you do not write, unless you hear from me? Is it diffidence or is it forgetfulness. If I know the real reason, shall try not to be unreasonable and fret less than I do now. That I do need your letters, it is unncessary to assert, my conduct proves as much—just because I do so. I write even when

you are silent. And by giving, I ask of you the thing I want. It is not an infliction, is it? Tell me, why do things so immterial a as distance and silence slowly rise up as a solid wall and shut out the light and the breath of heaven, and make one to live a prisoner in suffocating darkness. These last three weeks I seemed to breathe in dungeon and with every effort to escape from this dread feeling. I just hurt myself on all sides for in the darkness, groping about I only knocked myself against things. If whose very existence I was quite ignorant of. Helpless because we are. May we be more charitable to others and may we too from our weakness, glean the strength of forbearance for others. I know life henceforth will mean a great mental strength, this constant separation will mean an insistent pain so acute that life a times may seem quite impossible, but in reality I believe it will not be so—as, suffering for something that is dearer than life itself—is the supreme joy. This knowledge will surely uphold and strengthen occasional weakness. Who can ever want to desecrate the gift received straight from divine hands, with selfish actions and black thoughts. And if suffering is inevitable, I am sure it will always be a consolation to think that one has borne it and have not caused it to others. If you had a mother. you would never have said that, to escape pain you wish to die. You do not know what the loss a child means to a mother. I do, so I try to avoid such thoughts. My own sad experience forces me to be more thoughtful of my mother. As it is, she has had great sorrows, her health is quite gone, without me she will be utterly helpless, otherwise, you can well imagine how little incentive I have for living.

I am sorry to have disturbed you by saying that I worry about your health. I know it is foolish of me to fret so, where I can do nothing—yet it is my nature stronger than all reasoning and wisdom. I feel so intensely that I make myself quite ill—and then there is a lull in the pain. I know it is wrong of me to be so very restless, for I am afraid that even from this distance, my feeling re-acts on you and makes you despondent. I shall try my best not to be so and in firm faith cling to the belief, that prayer reaches where praying hands do not and that God in his all goodness will never try me beyond my little strength. You will be very careful, won't you—do what the doctors tell you and avoid doing things that may harm your health in any way. Tell me do the doctors assure you of complete recovery? Do you suffer much pain? Will it be safe to go to China now, when it is being torn with interencine

wars?[৬৯] Have you friends there who will take good care of you. I often think of your sister, tell me of her sometimes. Does she live with you? You won't be offended, will you, if I ask you about your "cranky notions of life". I should like to compare them with mine and see if we have ideas in common.

This year the rains here are unusually persistent, often the weather is cyclonic and there is scarcely any sunlight for days. It will mean a very hard year for our poor. The almanacs presage all sorts of calamities. After a continuous bad weather for over a week, the sky has cleared up and there is a mild sunlight. I have kept all the windows of my litle room open, there is a soft cool breeze and the lawn in front looks so restfully green. White flowers in the garden, have given place now to a crowd of softly flushed small pink lilies and golden sunflowers. All is quiet, peaceful and fair, yet the feeling of incompleteness persists. Looking at the clouds sweeping by so proudly one would think that they ride and regulate pace of the wind which carries them—but in reality are they not carried whither the wind wist and where they are wanted. We too are borne about in this life just so, we are never free to do what we want, but only independent in doing what is wanted of us. I am really growing to be a veritable wise woman of the East and you are making me so. So you must never think me wanting in thoughts.

You must have by this time received the letter in which I have written about the crest. Did you get the pictures un-hurt. Tell me what you think of them. Every one here is well. Mother sends kind regards. I send my best thoughts.

Yours
Priyambada

Awakening[৭০]

Like a conch washed ashore, I live dead silent.

Out of a [sic] ocean of song I had come and the melody of endless music throbs in my heart.

Come my warrior, hold me with both thine hands and blow into my soul thy trumpet call;

So that roused I may summon a host of songs, making every grain of mute sand awake and sing in chorus the paen [sic] of fathomless life's rhythmic ever-flow. 27. 7. 13

১৩.

46 Jhautala Road
Balligunge
Calcutta, India.
5.7.13

Dear Friend,

Your dear letter is so short, yet I am content nay, I am more than that. I am happy, hecause it has brought me the news of your welfare and the message of your joy. Tell me are you really very happy? Though now I feel nearer to you, yet a strange shyness is stealing over me and I can not say what I feel. You will understand, won't you without my telling you, how it is with me too, your sympathy will surely bring you the knowledge! You only thought of me in other people's places, you thought nothing of me in my own house? You liked the play-hostess better than the real one? You are naughty—I won't talk to you. Tell me why did you sit so lost and quiet the afternoon, you came here; with your empty glass and plate and would not even put them back, till Suren relieved you of them. I was just going to do it, when he forestalled me. He is no blood relation of mine, only a marriage connection of my maternal uncle's the Chaudhuris.[৭১] You know four of my uncles have married into the Tagore family. So perhaps by courtesy of polite etiquette, I may be called a cousin. Though in reality there is no relationship. Tell me why do you want to know, would it please you more if Surene [sic] was really related to me?

You are very fond of him—are not you? He is very good. Yet the Tagores are our best friends. I have known them ever since I was a little girl and look upon them as upon very near and dear relations—and have been always treated by them with regard and consideration. I wish I was fortunate enough to have had a brother like Suren. You know amongst us, as amongst you, light eyes are not thought of much, as a little girl, my playmates often teased and made me angry, laughing at me—they would even ask me seriously if I saw better in the dark! So I had ever been rather difficult about them, but reading your brother's book lately, where he says that light eyes are thought amongst you as a sure sign of shallowness of nature, I felt quite ashamed. However, you have not thought so, and the

poor helpless eyes may well be content. I do hope you will never have cause to think so either. I will not now say anything about how sad I had felt to hear you say that you wished to die to escape "this pain." You will never wish it again, will you? Please promise me you will never do so. Tell me more about your new boat, will it be sea-worthy for long voyages? Will your old boatman be with you? I do wish health, happiness and content to you, when you go voyaging in it.

I have been keeping very poor health lately, and have been obliged to rest for days in bed. A slow sort of fever assails me for a day or two and leaves me utterly prostrate for weeks. Everyone is remarking I look really ill, so I am going away to Ranchi for a few weeks. I shall most probably go on the 17th of this month and be back by the 2nd week of September. I can't stay away longer as the little boy who stays with me has no holidays now. I am quite sure I shall come back thoroughly strong in health. Every year during summer we go away to the hills, but last year mother suffered from insomnia there and we could not go this year. In summer if you do not go to the hills, Calcutta is by far the best place to stay in the plains. So we stayed on, with the result that I am utterly useless. Please do go on writing to the usual address, and wherever I am it shall be re-directed to me. The house will go on just as it is now, only I shall not be there. Please do not worry about me. I shall come back certainly quite set up in health. For I am not ill, but ovewrought. The whole winter through I stooped over my desk writing from early dawn till late at night, and this I carried on for months at a stretch. And ever since February I have been poorly and been slowly losing in weight. The doctor prescribes all sorts of tonic, but I know a few weeks out of town, in perfect quiet and silence, I shall be my old self again. This town life tries me hard, for my heart is not in it. My days are filtered away without bringing me the consolation of work done. The dust, noise and the hurry make me discontent. I am even weak enough sometimes to wish for illness for a respite. Tell me all your news.

This year we have had a short summer and a very early rain which continues even now without break, and this I am afraid is the cause of much illness about town. Orissa has been overflooded and the poor are in great distress. In Bengal and in Orissa, they have neither been able to sow crops

at the proper time, and in districts where they could do it, the young crops have been quite drowned. So a very hard year is meanacing our helpless poor, I often think of them and feel sad.

So you have chosen the chrysanthemum for my cloak and I am thinking how I can impose the lotus on you. When I do find out, I shall let you know.

The last three days I had to take to bed again—and lying down I only read. Do you know Oscar Wilde's 'De Profundis'?[৭২] He wrote it in the last months of his imprisonment. Every line is instinct with beauty, and the manner of expression is unique and charming—you know the book, don't you? If not, let me send you a copy. I want you to enjoy what I have found so charming,—please remember to tell me whether you have read it or not.

The English word for taking leave is beautiful, good bye—God be with ye. So I say it to you wishing you all happiness.

Yours
Priyambada.

প্রিয়ম্বদাকে ওকাকুরা

১.

Dear Madam

I have read your poetry with intense joy—they are charming and so sympathetic to me. I regret that I could not read Bengali for they must be wonderful in the original. Perhaps I may learn some day.

Your kindness has added another bond which unites me with India. I hope you will send me your picture when taken. May I not hear from you again?

My address is The Museum of Fine Arts, Boston, Mass., U.S.A.

With renewed thanks, I remain

Yours very truly,
Okakura-Kakuzo

Bombay Oc. 12. 1912

I sail today for Europe.
Remember me to your mother.

২.

Indian Ocean
Oct. 15th 1912

Dear Priyambada Devi Sama

As I am drawing away from your shores, a strange sandness comes over me and I yearn to be once more in your beloved Bengal.

I have even made some attempts at versification, one of which I transcribe for your amusement. It is a longing for the Jade flower—the ambrosia of the Taoists.[৭৩] Is it never to be satisfied or is the beauty of a longing because of its being never fulfilled?

Your very truly,
Okakura-Kakuzo

May I hear from you again?

玉樹
雪山万重鎖僊鄉
玉樹花開隔渺茫
白石青苔明月上
幾生修得掬靈香

Which may perhaps be rendered thus :

The Jade-Tree
Across a chasm forbidd ,
On Haimavat's icy breast enshrined,
Blows a Jade-tree, white and serene,
How many lives, over and again
In entranced vision, must I sit
On the cold lichens of monlit stones,
Until I,—a purified soul.
Can sip of the scented dew of the holy Flower?

৩.

Museum of Fine Arts
Boston, Mass.
Dec. 3rd 1912

My dear Lady,

A petal of the Jade-flower has wafted over across the seas—your letter from Mizrapore. It has brought me all the messages of light and sunshine in the midst of this weary barrenness of the North American winter.

Truly you were well-named the Fair-spoken, the Jewel-voiced. I can dream myself away in the yellow twilight of your enchanted land. I wander with you over the battlements of your ruined castles, I ponder with wistful delight over those remains of the rock-cut past. The poor sparrows, twittering weakly in the snow across my windows, sings like a bulbul among the glorious foliage of your own forest—so dear to me. Oh! that I cannot there! Will you not write again? Soon? It is only charity to a forsaker lonely soul. I shall be grateful for anything you care to say about your life and thoughts. Ages have passed since we parted. Tell me, are you changed any?

Please do send me more translations of your poems. I venture to quarrel with you on your estimate of their quality. Why are they not wonderful? Is not greatness of poetry gauged by its power of touching the inner chords of things? Cannot a drop of water, a dewdrop rolling like a pearl on the lotus-leaf contain an ocean of ideals as lofty and universal as the ocean itself? It is the exquisite touch with humanity which moves me so much in your poems that I call them wonderful. I too like to pet and play tenderly with them. They are my own sadness, my own secret joy. Do send me more—it is a sin not to.

Is your picture taken?

Yours ever,
Okakura-Kakuzo

P. S. I may be in India again. When?
Who knows!

৪.

Museum of Fine Arts
Boston

My dear Lady,

Another Petal! Don't ask me about the Jade tree. You know better than I. Have you not found it flowering in your own garden? Are you not the flower itself? But this is not a reply to your letter. With oceans between us when what you wrote a month ago reaches me only yesterday, tenses become confused. The flow of your thoughts may have gone to the sea when I am addressing myself to the very source. A correspondence at such a distance could not be an interchange of questions and answers but a correspondence in another sense—a unity of mutual impulses.

Let not this consideration of time hinder you from giving freely of your passing sentiments. I am charmed with what you call your *garrulousness* (is there such a word and do I spell it rightly?). You know that I am not afraid of bulky envelopes from you and anything you tell me is a delight. I am grateful for this sunshine which has come in the afternoon of my stormy life. Let me revel in it to the full.

I have made a queer proposition to Surenne to find out a Bengalee bride for a young Japanese friend of mine. It is a thing which I would like to do myself if I was young and free. Surenne will doubtless tell you of my funny proposal. But do you think that any Indian lady would care to link her fate with my country men? If you feel there is a chance will you not help Surenne to find the right person?

You are most kind to take trouble on my foolish *Book of Tea.*[৭৪] Don't make it a serious task, it is not worth while. Cut thrash and murder every word in it as you like. I am certain that your beautiful diction will give it a wonderful resurrection. Can you tell me how I can learn Bengali? I expect to be in China next. May and shall be nearer you by a few thousand miles.

Have you sent your poems and your picture?

Always Yours,
Okakura-Kakuzo

Remember me to your mother.
Boston is sad and dreary, I am consoling myself with my work.

৫.

Museum of Fine Arts
Boston, Mass.
Feb. 4th 1913

Dear Lady,

Snow, snow, snow everyday and it was a delight to get your letter. Yes, what a long time it takes for a message to reach here. I am grateful for your poems and am hungry for more. No wonder that Dickinson liked them.[৭৫] Why not publish them? I would be selfish indeed to enjoy them alone. This is only a hasty acknowledge of your letter—for I am expecting your uncle in an hour.[৭৬] Babu Rabindra came yesterday with his son and his charming daughter-in-law.[৭৭] I am hoping to make their short stay here as little of a bore as possible though of course being a stranger myself I cannot do much. Their presence here makes me feel that you are not far from me.

I have heard nothing from Surrenne. Can you tell me how his company is getting on? Has he to go to England? I hope that everybody is well in Ballygunge.

Yours Ever,
Okakura-Kakuzo

I am writing a libretto for an opera which a French composer is to set to music.[৭৮] I intend to steal three or four lines from your poem. Will you give me the permission? I shall probably stay here to the end of April.

৬.

Feb. 20th 1913

My dear Lady,

Your letter has arrived conveying the dire threat of not continuing the "garrulousness" in case I do not respond in equal measure. I tremble. Is it not making it very hard for me? Please consider a man's limitation and be lenient. I have often taken up the pen to tell you of my surroundings and daily thoughts. I stopped because they don't interest me and I am afraid of

inflicting my petty vexations upon you. My life is simple indeed, spent mostly among the past, and the inspirations which moved people, hundred and thousand years ago. At times I come across something which touches me deeply, as a part of myself. I am thrilled and wish to say foolish and wild things which nobody will understand and then—perhaps—I think of you.

I have few friends. I go out very little into Society though the people here are very kind and solicitous about me. I make a brave attempt and go to their dinner-parties and come back bored and miserable. With best intentions they expect you to entertain them. Who am I, a weary spirit, to bring them laughter? I have a quiet apartment where two Japanese artists help me in keeping house and cook native dishes.[৭৯] I spend my evenings reading, dreaming and sometimes coining bad verses.

Two day[s] ago I finished the opera which I have told you about. It is ghastly performance and I am glad it is over. It is entitled the White Fox and is tragedy of a fox who transform herself into a beautiful lady to save a man and suffered in consequece—and is based on one of our old legends.[৮০] Does [sic] your foxes ever take human shapes and do such foolish things? If you care to see the manuscript I shall send you a copy as soon as it is typed. You will see that I have stolen your thunder. The lines I borrowed were :

"Words are but windows of thoughts
In black white how coldly clad!
My songs are but a flimsy dyke
To stem one moment the rushing tide
Of love's fierce waters, uncontrolled.
I cannot hold thee, dear, I cannot
Bind thee in words or in rhyme enchain.
I cannot hold thee, dear, I cannot
Twine thee in my songs and [call] thee mine."

Will you really permit me to put this into my hero's mouth? Somehow I wanted to have something of yours in my sad creation.

I have seen something of your uncle this last week. Your nephew and

his wife has [sic] just left me. They are all leaving for Chicago tomorrow. I am afraid America was a trial to your uncle—he was happier perhaps in London and of course his true place is in India. I have tried to persuade him to go back soon to his school. He has come to my den and saw the young artist who is desirous of obtaining an Indian bride. Thanks for your efforts in his behalf. I do not know how long I can stay here. It much depends on the progress of a book I am writing on Chinese art.[৮১] It looks like staying over to June.

Thanks for your poems. The last one was especiallly beautiful. Yes, I must learn Bengali but I am afraid that by the time I know enough to appreciate your poems I must lie under ground and hear the trees sighing over me. Perhaps my journey to China may lead me again to India. Your picture is a treasure. I was dreaming about the doe last night.[৮২] I send you one bad poem.

Yours very truly,
Okakura-Kakuzo

Don't laugh.

On Seeing a Picture

My cry is in the frost
Of the unawakened morn,
In star-swept peaks and silent ravines,
Where brooding mystery folds her wings.

My heart is in the mist
Of wistful lakes and lonesome trees,
Where moonbeams whisper to the ferns
And maiden night trembles in shadow's arms.

For I am a deer, free and wild;
I shy at man and his approach.
Thou alone, Saintly Presence,
Hast fearlessness on me bestowed.

O lotus-eyed! thy effulgent ray
Fills the forest with strange delight.
At thy jewel-voice, auspicious one,
I come! I come!

৭.

Museum of Fine Arts
Boston, Mass.

Dear Lady,

I am mailing you by registered post my first draft of the 'White Fox. It is an atrocious thing but in one way you have a right to see it. It will amuse you to see into what a poor setting your jewel lines are placed. The composer is now working on it and he thinks of producing it next Season (next winter). Till then it is not to be given publicity.

I am getting restless again and intend to start at the end of this month for Japan, to remain there a couple of months and to go to China. My address henceforth will be.

Idzura, Otsumachi,
Hitachi, Japan.

Will you not write sometimes and tell me how the world goes with you?

It is snowing here still and I long for the sunshine and flowers of the Orient. Your uncle has left for Chicago and I feel a sudden loneliness. I learn that Surenne had an addition to his family. I am very glad.

Please remember me to him, his mother, your mother and all who may remember me.

March 3 1913

Yours very truly,
Okakura-Kakuzo

৮.

Boston
March 4th 1913

Dear Lady,

Tell me by what name I can call you. I have thought of many but none satisfies me. Your letter arrived that night conveying your kindly solace

and the wonderful, beautiful poems. How can I ever thank you?

I am ashamed that I have unwittingly written of my loneliness in my former letters and caused you to extend your dear sympathy to me. Forgive me the slip of pen for nothing is further from my thoughts than to throw the shadow of my sorrow on you and cause you any pain,—you whom I know well to be so much in need of consolation. But somehow, something moved me to lean upon you. I hope it shall never happen again.

After all, my sadness seems to be my pet amusement. I take refuge in my solitude and have a secret festival. My past has been one long struggle after untangible ideals and vain longings, leaving me worn out, tired and often desirous of the long, long sleep. I wish sometimes to crawl into my shell and sing sad songs which is a way of laughing at myself. Yes, I have friends true and loyal, in spite of my way wardness. I take a great delight in some, like Surrenne in whose youth and future, I feel as I am living my own life. Yes, I have relatives who are very kind and watchful over my welfare—more than I deserve. As you say, I may be too exacting and conceitedly selfish. Perhaps I have not the capacity for enjoying what the gods have so bountifully given to me. I have to blame myself for thinking that I am alone.

To me the trouble of my well-wishers are that they lay store on my strength not realizing that I am a weakling who bears with difficulty the strain of life. They do not know that I am a wearing a mask of bravery and self-reliance in order to confront the world, that underneath it is a timid cowardly creature trembling at every commotion. It is fear which makes me proud. I long to hide my head in the folds of a gentle, saintly personage and cry, cry, cry. I want to be petted, cuddled and be allowed to do very naughty things. There!—you find the photograph of my poor humble self. Are you not disgusted? I am.

Please do not tell me that you are not the Jade-tree. I had hoped to have found the tree at last. Is it not there, half-revealed in the gleaming mist, enthroned in the immaculate snow of the Himalayas, bearing a prophecy of eternal spring? If I am not allowed to pluck a petal, may I not bathe in its fragrance from a distance? Don't tell me you are not the Jade-tree.

Your poems are always a wonder to me. They say what I want to

say and more.I like to imagine you in your garden in the vanishing light of a soft spring-day, hugging those tender thoughts to yourself and the gentle doe watching you with its deep child-like eyes—and the flowers scattering all over your white robe. Do send me more in any way or form you like. I know I am asking much but you must feel what they mean to me. By the time this reaches you I shall be rocking on the Pacific and I shall be nearer to you. Please let me hear from you.

Yours very sincerely,
Kakuzo

I cannot find any Bengali grammar here. What do you recommend for the beginner? It is such a difficulty to talk in an alien tongue.

৯.

Idzura, Otsumachi,
Hitachi, Japan
April 29th 1913

My dear Lady,

Your letter of March 3rd has come all the way back from Boston and I am glad to have this new sensation of hearing from you in Japan. What troubles me is the note of sadness which I somewhat feel in your letter which was always so joyous. You say that your song refuses to carol. What ails you? I am praying fervently for your peace and happiness. Thanks for your poem.—Yet it is rather melancholy. I hope that my own sadness has not cast its spell on you & added to your gloom. Did you hear from Rabi Babu about your poems?[৮৩] I know that he agrees with me about the publication, though of course I know how distant an echo a translation of a poem is of the original. If you permit me I shall be delighted to do everything necessary for the publication. I think that my literary agent, Mr. J. B. Gilder of New York,[৮৪] will be glad to see it presented at the same time in London and New York. Your uncle's book of poems has taken the West by storm and I have so doubt that yours will be welcomed with great eclat.

So Surenne has gone to England—I might have come back by way of Europe if I knew of it.

I have come home rather tired with the journey and am supposed to be quite an invalid. I pretend to be very good and do all what the doctors say. Young friends surround me day and night and tell me things which they think amuses me. As usual they ask questions which gods or a child only could answer and I try not to look bored. I hope that I am successful. My family overwhelm me with attention. I am very thankful, though it is a pity that they make so much fuss about a poor miserable creature like myself. I know of a simple medicine which will set me to right but like all the good necessary things, this remedy is not forthcoming—perhaps never [ever?] unattainable.

I sit by the beach and watch the sea rolling all day along. I wonder whether some day you may not rise out of the sea-mist. Are you ever coming further East?—to China?—to the Malay straits?—to Burma? Rangoon is but a stone-throw from Calcutta. Vain, vain dreams! Yet how sweet.

My journey to China will have to be postponed three or four months on account of my health. It is not serious so please do not worry if ever you are kind enough to do [so]. Your photograph by your French friend has not yet reached me and I am waiting for it with impatience.[৮৫] What did you think of the *White Fox?* Do tell me frankly, won't you? Thanks for permission to use your lines.

Please keep yourself well.

Yours very truly,
Okakura-Kakuzo

Remember me to your mother and friends.

A Sea-thought

I see a star,—my polar star,
I know the coast where my boat is bound,
Alas, my rudder is broken, my sail in shreds,
I drift alone on the dark, silent sea
Is it the night-dew or my tears
That my sleeves are heavy and wet?

Oh! for a breeze, a current high
To lead me to my haven and to Thee!

১০.

Tokyo
May 4th 1913

My dear Fragrance-that-comes-in-the-Twilight,

I have come to Tokyo a few days ago for a special treatment according to my doctor's advice. It is nothing serious and is supposed to have something to do with my intestines. I think it is not necessary but am weak enough to have the doctors do their worst. What a bother is our body'! I intend to go back to Idzura in two weeks. Are you well?

Your letter addressed to Idzura, dated the second of April, reached me this morning. I regret that Tokyo is not nearer Boston. Yet I ought to be grateful to the postal system. Every letter from you gives me a new delight. If you only knew what a joy and blessing you are conferring you will feel well repaid for the trouble of writing to me.

You ask me about my relations.[৮৬] I lost my father fifteen years ago —my mother when I was only seven. I have one brother living—the one who wrote the Book[৮৭] and a widowed sister who is kind and good to me. I married according to the old usage, I at seventeen, my wife at fourteen. I have two children, a boy and a girl both married and living in a home of their own. The grandchild is the offspring of my son. Tomorrow is the boy's festival and they are sporting huge paper caps and pennants from their roof as this is the first anniversary of the birth.

I have been a wanderer since I was twenty. Since I married off my daughter ten years ago I have rarely stayed at home. But why ask me about my home life? I am to blame for my own unhappiness. I am wayward and have peculiar, idiotic, cranky notions about life which good ordinary people find hard to bear up with. You will find much in me which will repel you if you know more about me. Can you not accept me as a waif cast on your shores, a foundling of the clouds and mists whose excuse for approaching you is his deep reverence for you? I sadden to write about my life—perhaps I can tell you orally some day.

Your poems are always wonderful. How is it that your Muse has again found its voice? Do please write to me. Yes, you can show the White Fox to Mrs. Chauderi [sic] or anyone whom you choose.[৮৮] I want you to tell me whether the name Kolha suggests anything low or mean to the Bengali mind. If so you can suggest some other?

Yours very truly,
Kakuzo

Kakuzo means Intelligence or one who attained Knowledge. Of course it does not fit myself. The first word, Kaku, was a name running in my family for generations.

১১.

Tokyo
May 8th 1913

My dear One of the Nameless Name,

Last night I had a dream. I was a pilgrim walking on high mountain tops. I could see myself silhouetted against the sky towering like a huge Rishi of old, crossing one peak after another with giant strides. Suddenly a thunderbolt struck me and I fell headlong in the abyss below—fell, fell without ceasing, as one does in dreams. Then I touched the bottom and it was soft and warm and it began to move upward bearing me higher and higher. It was some Garuda-like bird soaring with mighty wings taking me up into the heavens. I beheld the peaks where I trod before vanishing far down in the distance—I strained my neck to get a view of the Garuda's face, and lo! it was yourself. Is it not funny?

But why inflict such nonsense on you? Do you really care? Are you not tired of my letters? Please tell me frankly. Perhaps a severe rebuke from me [you] will do me some good. I find my thoughts wandering in spite of myself into places where it perhaps should not. Your picture has not yet arrived from Boston. Did you mail it at the same time with your letter? I hope you are well.

Ever yours,
Kakuzo

I am thinking of sending you with your permission a Japanese gown *(haori)* though I am afraid our materials are too thick compared with your own delicate fabrics. It may however do for the cold climate. Will you kindly tell me what your family crest is (I mean your own)? Can you send me a small drawing of it? Or will you prefer your favourite flower as an emblem? My family arms is the wisteria.

I am greatly better.

১২.

Idzura, Otsumachi,
Hitachi, Japan
May 17th 1913

My dear Moon in the Water,

Your letter on the New Year day has come. I am deeply touched by the fact of including me in your prayers. What can I do and have done to deserve such sweetness from you? I too have prayed for you. It will be interesting if the spirits who carry our prayers should meet in mid-ocean and exchange confidences. I should like very much to be eavesdropping when they whispered secrets on the star-lit billows. Your description of a Bengali New Year seems to resemble so much ours that I believe you will find yourself very much at home here. Indeed we are all one. It would be an everlasting delight if we could meet on some cloud-capped hills and spend our lives writing about the unity of Asia and things that will bring the East into closer union. Why did we not meet long, long before? But then I am grateful that we have met at last.

You ask me where Idzura is? It is a small promontory north of Mito, which is again north of Tokyo. You will not find it on the map. Why are you trying to read books on Art? Binyon is [as] good as any but art is to be felt, not reasoned and written about. Your poetical genius will open the door into the portals of Eastern Art than all the books ever written on the subject. Why have you decided not to publish your poems? Is it not a pity? Your poems are wonderful for their introspection—I am ashamed of sending any more of mine for they cannot express what I feel. Even at best I flit along the surface of my thoughts. Tell me the secret of your art if you can.

Please do not worry about giving me pain by asking me of my relations. All my thoughts are yours you can never pain me in any way. Perhaps some day I may retaliate by asking you about your past sentiments. Can we not have our first quarrel? But I am afraid, timid of making you frown.

Please send me your family crest. The silk is waiting.

When shall I hear from you next?

Yours very truly,
Kakuzo

Are you well?

I am decidedly better. Your picture has come back from Boston. It is fascinating. Have you taken it before I sent the poem about the deer? It is a saintly presence indeed.

১৩.

Idzura
May 25th 1913

Dear One of Myriad Names,

This morning your letter of March 23rd has come back from Boston. Is it not strange that all your letters of later date should arrive long before this? You say that the seals of my letters are often broken. Yours are not to all appearances. Why should they tamper with our mails–I wonder? I often correspond with Gagen Babu of Jorasanko. Will you ask him whether he finds difficulty with his post also? Surely the people who were over curious must have been amused at the vast foolishness in them (I speak for myself). They contain dangerous matter,—very dangerous to myself.

You tell me about your pets—what a menagerie you keep! I too like animals though through laziness I keep them wild. Not that I sometimes make war on them. Many years before I loved to shoot and nowadays I indulge in fishing. Yesterday I went for the first time this summer on the sea though it was chiefly angling for dreams and endeavouring of [sic] get rid of tormenting thoughts. In summer I go almost every morning to

fish, awaking at two or three in the morning and having my breakfast on the waters, reading sometimes and playing with the romance of the sea till noon. My boatman is an old denizen of the sea,[৮৯] learned in the ways of the aquatic tribes, a philosopher, like all fishermen who has communed with the deep all their lives, a poet in nature because he has learned to read the sea, its mysteries and its dangers. We are great friends and I talk India to him. He is a worshipper of the Dragon-King — a Naga Rajah which we got from you. Perhaps you will like him.

I send you at your command some more atrocious poems,—one of them accompanied by the odd characters for your amusement. When I said "words are widows of thought", I of course meant the written word —for is not the spoken word the most wonderful gift we possess? The quality of the voice gives one an insight in the soul than the thought itself. Is it not so? With the written word it is really impossible. I wonder whether I shall gain a great deal in writing to you in Japanese instead of English. Surely I shall know how to address you in politer [and] less brutal matter and shall veil my thoughts better. The imperfection of my English makes me every coarse but perhaps more frank. Between one who understands, any medium of communication will mean something vastly vital than to those who care not to go beyond the surface of things. Please do write to me. Can I do anything for you in Japan? Do you want anything? I shall be only too pleased to relieve you of even a small part of the weariness of the weary thing they have made of life. I am better physically. I am thinking of sending to Surrenne's mother and wife some Japanese bath-robes or clothes which our ladies wear after bath in evening at home. Do you suggest anything else? How is Surrene's family in his absence?

With best regards to your mother.

Yours very truly,
Kakuzo

The picture of your house has given me many hours of delight. I can imagine many things happening there. How is the naughty doe by the way? Tell me how you spend your day? Are you a good cook, a needle-worker and an accomplished able-bodied housekeeper? Are you very naughty too, sometimes?

A Strange Bird

A strange, little bird has alighted on my window-sill. Its wondrous
eyes like mighty sword-blades or stars
on an entranced lake, Peer deep into
my very soul. Its plumage is
halved with the gold of some glorious
southern sky, Its voice flings sunshine into my desolate chamber, I know not its name or whence it cometh.

What tidings does it bring of
a far-away clime? Vague memories of a long-forgotten summer, Sweet prophecies
of a coming spring crowd upon me. I sit with bated breath, afraid that it will fly away. I dare not move. You may say that the bird has bewitched me.

Idzura, May 25th 1913

相逢如夢別経年
手撫孤松思悄然
巌上側身夜蕭颯
流星一点人南天

Which means something like this:

Our meeting was a momentary dream, our parting, a reality sand and long;

I caress a solitary pinetree and pity its fate similar to mine

Rock-chained, sighing, restless in the night.

Lo! A meteor has flown into the southern sky,—why could it be not myself?

Idzura, May 20th 1913

১৪.

Idzura
June 28th 1913

Dear Moon-Soul,

Your letter of just a month ago arrived after an eternity together with the Bengali grammar. Do I need your letters now that I am at home? What a question? I must ask you whether you want mine. Tell me really are you not tired of hearing from me? The Bengali Grammar looks very formidable.—I shall try what I can do about it. I am very stupid at languages—as in [a] great many things.

You ask me the great quesiton— the limitation of life—renuciation and freedom? You know very well that I am the last person to show you the way. Believe me nothing can be more perfect than your natural self. Your devotion to your mother, your interest in the little great things of domestic life are far more of consequence than anything you may accomplish outside. I speak not of woman but also of man as well. We all know what after all our work for society means. To be a man, a human being first, before being a minister of Society, to me seem essential. Let us strive for realization within our limitations. The worries, the tortures of daily life are more difficult to conquer than armies. Let us both suffer and be comrades in the eternal struggle.

I am worried because you say that you are worried about my illness. My ailment the doctors say is the usual complaint of the twentieth century —Bright's disease.[৯০] I have eaten things in various parts of the globe—too varied for the hereditary notions of my tomach and kidneys. However I am getting well again and I am thinking of going to China in September. So please do not worry. I am much concerned about what you say about yourself—the restlessness which comes over you. I too feel the sadness of things—I wish to die and escape from this pain. But then I am glad that I have this pain, this sadness, this restlessness. Try to keep yourself well.

Yours,
Kakuzo

You have not yet told me your crest.

Your poems are wonderful as usual. I specially like the "Irrevocable."

১৫.

Tokyo
July 7th 1913

Dear Jewel-voiced,

Your letter of June 4th has just arrived carrying its divine message. I am entirely overcome. The universe seems to have suddenly [become] young again. You ask me when I began first to think of you.—I believe it must be from several incarnations before. It was quite a natural thing from the very beginning, the night we dined at the Chauderi's [sic] on the 16th of September, and, again when you were playing the hostess to the ship's officers at Surrenne's. When Kakut Khan was drawing ethereal strains from his sharod [sic] at the Justices the Bhairabi sounded very true because of your presence there—graceful and unassuming—yet how distinguished! The night of my departure you have riveted the chain. What occult powers did you use with those heavenly eyes of yours? Your entrancing—but I dare not say these things to you. You ask my forgiveness for giving me pain—don't you know that I have lost the power of being pained by you?

I have come to Tokyo for a Committee meeting and shall stay about two weeks. So you see that I am well and strong. Three days ago I launched my new boat—The Ryu-wo (Dragon King). It is built after my own design—a combination of a Japanese fishing boat and an American yacht. It looks like a good sailor. This summer I shall mostly be on the water—I am drifting on the ocean of joy. I do not know where this will land me. Nor do I care.

The crest for the cloak I have decided to be the Chrysanthemum. You may smile.

Yours,
Kakuzo

May I ask you to tell me how related you are to Surrenne? He said you were his cousin. How?

A Confession

Of yore I loved,
Or fancied that I loved.
I wove garlands of idle songs
And flung them on the maiden fair,
I set a pebble in my would-be gold
And wore it high on my conceited brow.

But in thy presence, my lute is dumb,
I dare not string the flowers of my thought.
Nor need I raise my lowly voice, O Jewel mine,
For the sea and stars are singing all of thee.

১৬.

Idzura
July 22nd 1913

Dear Jewel of the Lotus,

You say Ena is growing stout at the expense of her mistress and that you want the gross body to all go. Can you be really ailing? Have I brought such sorrow into your life that you feel like vanishing away? Forgive me, forget me, scorn me, do anything that may bring you peace and rest. I cannot bear to think that you are suffering for my worthless sake.

I have returned here after a busy fortnight in Tokyo and vicinity and got your two letters yesterday. During my work your name was always ringing in my ears. I could not write to you,—letters seemed such empty, meaningless things. The only way of expressing oneself was to take the next boat to India. I have consulted the shipping list in my agony. What a madman I have made of myself! Today your first letter is a great rebuke to me. Truly you are the Kannon Saint in disguise.[৯১] You tell me to be free, to help others and be true to my own self. Yes, I shall try my best.

I am struck more and more by the immense difference that lies between your serene moon-like soul and the muddy pool which I am conceited enough to call my mind. I am really unworthy of you—a

wayward, selfish, pig-headed, nasty brute, worn out and bearing the ugly scars of life's inglorious battles. I wonder what you saw in me and cannot realize the great event at all. Can it not be a dream after all? One thing that comforts me is the news that you are naughty and are keeping it for my benefit. It will do me immense good if you vent it on me now and tell me how ridiculous I am. Won't you now?

In your day's programme you have not told me when you went to rest at night.

In haste to catch the mail.

Yours
Kakuzo

Prof. Dickinson has just written that he is in Japan.[৯২] I shall enjoy seeing him who has lately (in our phrase) touched the fragrance. I envy Ena.

Thanks for the purse. I know that you do not describe your accomplishments fully. I am becoming frightened about your perfection. Tell me what you cannot do.

১৭.

Idzura
Aug. 2nd 1913

Dear Lady,

I have again and again taken up my pen and am surprised that there is nothing to write about. All is said and done—nothing to write about. All is said and done—nothing remains but to prepare contentedly for death. It is a vast void—not darkness but full of amazing light. It is immense silence caused by overwhelming din of clashing thunder. I feel like a monarch sitting alone in a great theatre and looking at a brilliant performance all by himself. Do you understand?

No—there is nothing to write about.

Hoping that this will find you well. Are you really better? I am well and happy.

Yours,
Kakuzo

An Injunction

When I am dead,
Beat no cymbals, no banners display.
Deep in the pine-leaves on a lonely shore,
Bury me quietly—her poems on my breast.
Let the sea-mews [sic] chant my dirge.
If a monument they must raise,
Plant me some narcissus, a plumtree of fragrance rare;
Perhance, one distant mist-white night
I may hear her footsteps on the moonlight sweet.
Aug. 1st 1913

১৮.

Tokyo
August 11th 1913

My dear Lady,

I have just mailed by parcel post an assortment of Japanese wearing apparel some of which I beg for your gracious acceptance and the rest for other members of your family. I have marked on the objects the persons for which I have intended them. For yourself.

1 Haori (gown with the Chrysanthemum crest).

1 Obi with Chrysanthemum design. (thick sash which our ladies wear round their waist. You may find some other use for it).

1 Obi (of what is known as the Hakata loom).

1 Shigoki (sash).

with Chrysanthemum design.

For your mother,

1 Obi.

For Surrenne's mother,

1 Obi.

For one you call Bibi,

1 Obi.

1 red Shigoki.
For Surrenne's wife.
1 Obi.
1 red Shigoki.
For Surrenne's children,[১৩]
4 Shigoki.

I also sent 6 bath-robes. You can wear them in the house *en deshabille.* I wish you to take two of them and distribute the rest to your mother, to Surrenne's mother, to Bibi and to Surrenne's wife.

I hope they may be acceptable.

Yours very truly
Kakuzo

P. S. I want you to do some commission for me. Enclosed is a small cheque on the Japanese bank in Calcutta. I wish you will kindly see that the duties are duly paid. (I know not what the customs charges are. The declared price is about Rupees 100). If anything remains over after paying the duty, will you see that Eda [Ena?] and your favourites receive some offering from me? I want to make them happy even for a moment. I am grateful for their bearing you company. And if anything is left over can you not buy toys for children? Of course please tell me if the amount is insufficient. I am better and going back to Idzura tomorrow. Saw Dickinson for a moment—rather like him.

May this find you well!

১৯.

Akakura Springs Echigo
Aug. 21st 1913

Dear Jewel-voiced,

I shall be frank with you. I had a collapse—slow fever and heart complication. The doctors prescribed a complete rest and the mountains

and I am here since last week with my daughter and favourite sister. Please don't worry for it is nothing serious. I am already feeling the effects of the cure. I don't mean to be ill very long. Next year I am chosen to be the exchange professor for America and have to start in November. Perhaps I may give up going to China.

It is a curious decree of Fate that I who was so robust in health till now should fail when I have just begun to taste the joys of life. Perhaps it is a punishment for the wild reckless career of my youth. Yet I am in perfect peace with the universe and grateful, oh, so grateful for what it has granted me of late. I am perfectly content and even boisterously happy. I laugh at the clouds that sweep in and swirl round my pillow.

This is one of my country residences perched on the hip of the Mioko mountain—an extinct volcano and the house is nearly 3500 feet above the sea. In one of the chambers, a crystalline hot carbonic spring is bubbling day and night. As I look from my window, the Mioko (mountain of subtle fragrance) towers its head to my west, yonder looms the Kurohime (Black Princess) waving her head of black pines and next to her stands the Idzuna (corruption of Ishana) sacred to the great god. To the east rise the Madara ranges flowing into an ocean of green and purple hills far away into the south. It is an inspiring sight and I wish you could be here. No—I do not want [you] to see me on invalid.

Are you well? Did you make any use of the haori?

Excuse me this scrawl in bed.

Yours,
Kakuzo

Your letter arrived just now. I have no stomach for a fight at present, though I am glad that you feel like it.

নোটবুক[১৪]

More things are known to us by telepathy than by telegraphy, but we dare not give them out as truth utterance, for the message comes in ciphers and the code is known to few.

Days of dalliance, bright red poppies of a season, have bloomed, faded, dropped their petals, burst their seed pods and are gone forever. And now you come upon me unawares asking for a stirup cup. Looking within I find it all barren, looking out and around, I see every thing dried up, and know not where to turn to, for your satisfaction.

What is your need, dear friend, what would you have of me? Love, the delicate flower of a season, bearing the charm of blushing dawn, filled with nectar, pure with dew, enthralling with scent, will not bloom out of its time, and I am helpless with pain. My heart cries out against refusal and can not let you go empty-handed. Will you then, accept of me, affection? Not the product offspring of a season but the growth of a life time, and be my friend and foster brother for good? I have need of such a one. One, whom I shall cherish with kindness and look for consideration in my days of dearth: One, who will shelter me from the hot sun and the cruel storm and shall perhaps with his care, let new flowers, pure and white, bloom again on my barren heart. If you will have this of me and let me too have it of you, I shall indeed feel rich beyond all expression.

I who have been a widow, for more than half my life, find at last, alas, I have become an old maid. Fond of cosy corners, familiar duties, confirmed habits and settled routines. Egoist in some things, dilettante in others. Monotone soothes me, variegated checks repel me; grey and white hold more charm for me than pink and blue. I avoid bridal red as frightened animals shun blood, and find love speaking to me in a forgotten tongue. Strange moods come over me, I am garrulous and silent by turns. I might do for an occasional companion, a hostess or a guest for a while. friend

of a rainy afternoon, a nurse for a sick day — but I can be nothing more. Neither a sweet-heart, nor a wife, even less a mother.

The beauty of a longing it seems to me, is that it makes existence living, and life charming. I for whom it was ordained that I should build up a shelter for myself out of the debris of a life, have found it so. I have longed for things never found, dreamt of joys never realised — and yet I am happy. Trials have not daunted my spirit, deprivations have not denuded my heart, nor disuse dried up the milk of human kindness in me. God, who gave me generously I do not know for what untoward act of a former life thought it fit to break down all the receptacles into which I could pour out my overflowing heart. Bereft of husband and child, never having a sister or a brother, I found the accumulated love paining my heart beyond endurance. And eager for giving, I had also misplaced my gifts and poured the drink of gods into hands, not worth the name of human beings, who came in the disguise of friends and turned out to be foes. The pang of disappointment at the time was very great. But after long years of pain, silently borne, I have discovered at last that nothing has been wasted. The joy of giving has amply made up for all the disquiet of disappointment, for all the weakness of misplaced charity, and for all the sorrow of being misunderstood. I know now that grimy hands can never mar the heavenly light of love, nor earthy touch spoil its celestial quality. I am sure now that men and women, whether great or low, good or naughty, God's creatures all, are worth the gift.

We long, because we must, for within the prison bars of this finite fleshy body, lives the infinite soul, twin-born, with the sun, moon and stars, earth, air and water. The human heart too has its ever renewed spring like the revolving earth, its unending light like the limitless sky, unfathomed depths like the ocean, its every breath turning with life like the air. Dry leaves fall off, the earth is rejuvenated, shadows pass away, the sky smiles with the infinite grace of Amitava. A cyclone blows, poisoned germs lie dead, dust and dirt are scattered abroad. From the slimy depths slowly pushing her way up the lotus reaches the light and gradually opens out her hundred petals. From the unknown depths, the venturesome may even bring up pearls pure, perfect and shining like the tear drops on the eyelids of ever merciful Gautama.

Is any longing, whether great or small, even partially fulfilled? Is reality ever as charming as the dream? I who have lived only a life of dreams, find myself frightened of satisfaction. I would rather fast on eternal dreams than feast in disenchanted realisation. 6.11.12

The meaning of a longing, it seems to me, is to make mere existence living and life charming (lovely). For only through it we feel the stirring of the God soul in us and know ourselves blessed, just as a mother recognises the quickening of her child by the fluttering in her womb and dreams of incomparable bliss.

The longing for the unattainable, the desire of the moth for the star, does it not make one float and glide away on the cool night air, skim through darkness and while still on earth, forget all else and feel somehow that we are nearing the ever constant love lamps of Heaven. This delusion (illusion) may not content one for all times (ever), for the satisfaction is but (momentary) transient. Yet the delicious oblivion though fleeting (momentary) is (it not simply) perfect (and most beautiful). Cold wisdom dictates it is not futile either, for it saves us from [burning] are our gossamer wings!

8.11.12

But I would not be wise before my time, I would rather scorch my wings and die in search for light and warmth than live forever to grope in darkness and shiver in cold. 8.11.12

Our winter is coming. It is the end of autumn, mellowed and subdued. It has neither the cruelty nor the barrenness of [the] occidental cold season, for our sky is seldom bleak and our trees ever bare, for most of them are evergreens and a few only shed their leaves entirely. The green meadows look softer and fresher with the generous fall of (generous) dew and glisten with brightness in the morning sun. Birds sing, the doves constantly and other songsters occasionally, the cuckoo, the finch and the golden throated bird we call papiya. Little humming birds flash forth like living jewels in the air and whistle in soft whispering notes (tones) and kokil, our bird of love, precursor of spring, prince of melodians, previous to his migration (departure) to other lands and climes, pours forth a prelude of farewell chants, enchantingly beautiful, which makes one dream only of spring

when entering the portals of winter. Gossamer grey mist getting whiter in the morning light and orange yellow at sunset, is fascinating, wooing the eyes by their delicate charm for constant looks. For the drapery of thin chiffon soft and yielding, reveals more than it hides and no forbidding curtain is ever drawn between our longing eyes and the pleasures of gardens of Nature. 10.11.12

The warrior has girt his loins as if for a fray, hoping a surrender. What if I declare war too, and refuse to treat with him unless he signs a truce?
12.11.12

Why should the thoughts of a stranger scarcely known, who came into my life, just for one twilight hour, haunt me so all through the day? Does he think of me too and with hankering in his heart try to span the distant void and reach me by unceasing dreams? I wonder, cannot make out, and long to know. 17.11.12

In my sleeping dreams I place thee on my heart clasp and hold thee there in love and try to soothe the burning of thy overtaxed brow with the soft cool touch of my face. I look into thy eyes that droop, tired of dreams and long to revive them with the light of my smiles; alas the vision vanishes when I awake and I can do nothing. 17.11.12

Sometimes Narcissus like I am in love with self and delight to look into my heart lost in contemplation. It is neither vanity, nor egoism for that would at once mar the beauty and spoil the pleasure. It is rather like the innocent joy the water lilies have, when bending down they see not only the image of their flowery self but the reflection also of the limitless pure blue sky; which looks on them always with love, showers light and mercy and keeps them ever fresh and fair.

I look entranced into my soul dear Lord, for I find there thy infinite mercy, thy unbounded light, thy ever abiding peace, made finite to suit my need and my limitation

17.11.12

How big was the chink in thy soul, dear heart, that I have filled up with my love? Was it just a tiny hole that we see in the wooden frame of the windows, through which the sun and moon peep, smile and wink some times? Or was it, beloved, a big one, agape, like a smashed window pane with bits of glass jutting out, looking like a slashed sword wound? Which pains more because it cannot bleed? Let me lay my loving heart against the hollow and press it with my breast so that the suppressed pain of thy unrelieved sorrow may pour into my heart and ease thy long misery!

19.11.12

How I love my hard white bed, after the long day it rests my tired back and eases the weariness of my weak limbs. It does not yield to me with soft insistent clinging but resists rather and with its self-sufficient restraint brings forth again my retired strength. 23.11.12

What an ecstasy it is to watch at dawn the gradual evolution of colour in the sky. When lingeringly the night recedes, the sun comes eagerly, reveals a new day. Pearl grey turns to opal then to coral pink until at last flushed with ruby red, the whole sky awaits expectant in hushed silence for the first caress of light. The night of separation had been long, dark and dreary and alas dreams brought never a satisfaction. 23.11.12

Rarely rarely comes the delight of thy remembrance from afar, passing over hills and dales, mountains and rivers, oceans and continents to reach me. Does it then I wonder retain the spirit of freshness and fervour with which it had first started on its journey? 26.11.12

Reading the story onc could not but read between the lines and feel simultaneously sad and happy. One had hardly dreamt of such revelations and at last realised verily truth was stranger than fiction and ever so beautiful. 27.11.12

Just a hairpin, they call invisible, fine, with a burnished copper sheen, like the auburn threads in the love locks of my sweetheart, bearing alike

crinkles. I shall hide it in my breast pocket, for though fine, though invisible, it has sharpness enough to poke through my eyes and pierce into my heart. 23.11.12

It is so pathetic to see the spirit [of] comraderie between two spirit imbibers — their bond of union is but liquid (though perhaps of the fiery sort) and can be without much effort very soon dissolved. 28.11.12

An admirer of good poetry loves to enjoy it as a connoisseur does rare wine, sipping slowly and lingeringly to feel the incomparable taste of it on his tongue, the gradual rising glow in the brain, the flow of new life coursing through every vein, the glamour of memory is then made luminous by the dawning of revived dreams. I have not tasted sparkling champagne or still Burgundy, neither sipped ruby claret nor amber Moselle and have not even looked at Lachryma Christi which must be divine. But I am drunk of the shirazy that Sadi praises, Hafiz loves so — I have taken copious draughts of the 'some rasa' that our sages are in ecstasy about and have seen visions that come of them. It is the drink of nectar that pours into one, with the song of birds in the incense of flowers and from the tremulous sheen in the shifting colour of the sky and the water. 28.11.12

I thank my friends, very much for saying, that my poems are wonderful, but even a mother's partiality for the children of her heart will not let me admit that they are so. They are just pretty frail and delicate and I am afraid will not outlast their time. That is why I feel weakly affectionate about them and love to see them petted and praised.

I send you a few lines of Bengali verse along with its translation. I am afraid trying to transpose them in English prose, I have not been able to be quite faithful to the original alas for no fault or neglect of mine but for the fact that appearance in foreign apparel always bears the semblance of a disguise.

Of all the places visited this year Budh Gya impresses me most. For there the unique renunciation of Prince Goutama and the undimmed light of Amitava seems still to linger on there. Sitting on the balcony in the sunlit

morning after a night of storm as I saw the ochre-coloured flag wave and flutter on the pinnacle of the monastery, I felt a stirring in my heart which I had never experienced before. It was like the quickening of a new life in one's womb — and I felt faint with longings, unknown before and hopes unthought of formerly. Yet somehow I seemed to remember that this was not quite a novel experience and that I had been there and known the message, that the ochre-coloured flag was now crying ineffectually to make me understand in its silent language. Do what I would, I could not get rid of the impression that I must decipher and express its tidings as best as I can. The scene though quite unknown before, did not seem unfamiliar and gradually a consciousness came upon me, that this was not my first visit and I had once before lived the monastic life there. I had bowed with reverence under the Bodhi Druma, burned incense, lighted lamps, served the needy and the poor. The ultimate culmination of my life came to me in this revelation and I knew that some day, sooner or later, I shall again wend my weary steps to this sacred place and find at last the longed for and yet unacquired peace. 28.11.12

Bhratidwitiya ceremony comes today, it is the occasion when the sister does honour to the brother by offering him loving gifts of cloth, sweets and if a Brahmin, a small coil of sacred thread. I who do not possess either a brother or a sister have improvised all my cousins, into being so and have provided small gifts for all their little hands. Though in this competition, I cannot cope in quality with those who have grown up brothers and sisters. yet I exceed in number, for I count them by dozens, ranging from babies to young men of score and five. Perhaps the thoughtful may give me precedence for quality too, because, is not latent life more potent than the actually living and does not a seedling hold more possibilities of growth than the bursting seed-pods. It was a delicious pleasure to see them rush forward for their little gewgaws, with eager eyes, laughing mouths and outstretched hands. And ah me — what wise discussions after they got the things. What judicious scrutiny, critical comparison and solemn passing of judgments. Who would not be a child again to enjoy that unconscious spontaneity of action and that naturalness of love, always

innocently unwise as they, beckoning the moon for a caress; staring wide to let sun-light pour into one's heart, dip one's feet in the ocean water, call to the waves for a chase, frolic with the wind and lie on the soft cool green breast of the earth, clasping her in a close warm embrace.

I am frightened of misleading others and afraid of being misunderstood. How very often I have hurt others by apparent disregard and hidden unbearable pain just for that reason.

I get up very early in the morning, often at four, sometimes a little later. For the winter days are short and the encroachment of darkness importunate, so unless I steal a few small hours of the night opportunely and add to my day, I cannot meet with the demands, that are made upon my time. The few hours of the morning I keep for myself, trying to realise the dreams of the night and the fancies of the day in my own words, that speak sometimes in different language. Poems pour out in the mother speech but prose is pressing too and I distribute it with discrimination into little cups of English and large goblets of Bengali; sweet or bitter as the mood yields and the manners (modes) dictate. 1.12.12

Japanese ideograph to the uninitiated ought to look like hieroglyphic, but I do not know why, I seem to see them as a swarm of bees, rushing up eager for a drink of sweetness, out of the chalice of flowers. Poor honey-suckers, they will surely break their soft heads and perish, before they earn any satisfaction if the heart of the jade flower be their longed for and ultimate destination and its unavailable, impossible nectar their utmost ambition. 1.12.12

The winter garden is bright with flowers — not natives of the soil, but kindly strangers who come for a while to make our life bright with colour and sweet with scent. They are our season flowers, the rose, the chrysanthemum, pansy and violet. It is curious that these domiciled ones flourish only when the flowers of the land Ashoka, Champak, Ketaki, Kadamba, Shephalika, each reigning supreme for a season, from spring to autumn,

in perfect bloom and in potent perfume, fall victim to time; and lotus not only the flower of the whole land but the emblem of it disappear under deep water. Of all the indigenous flowers, the ruddy vermilion Jaba (hibiscus) blow undaunted all the year through, fluttering their veined bright petals in the face of the piercing cold wind; sturdy mary-golds, pure white kundas and skyblue aparajitas, nod their heads and laugh at old time and his sharp scythe. These flowers are daily gathered in large numbers, as offerings to the gods and are in full-bloom the whole year round, except perhaps the kunda and the mary-gold, which only come to perfection and flower in abundance during the dark days of winter. Roses slowly open out their wax like white or blushing soft pink petals as the bleak winter advances and chrysanthemums make the gold of their hearts purer and shine brighter, hanging their numerous feathery petals, like some divine fledgling, tremulous though unyielding, as the cruel winds roar on slashing and scattering tender the leaves with their uncharitable whiplike blows. And one is reminded only of love sincere and unselfish, delicate as the dream of budding youth, holding on firmly to the strength of its divine birthright, giving in neither to powerful time, nor to cruel circumstance. Retaining all along the purity of its form and the immortality of its soul, though rains wash away the honey and splash their petals with mud.

1.12.12

My heart is heavy with the burden of unrealised hopes, which when I reason with self, I find quite beyond the limitation of possibilities. Yet unconsciously why do we, I wonder naturally, long for things that may not be and that do not even hold the slightest probability of bearing the fruit of our importunate expectations. As children we call to the moon, crave to embrace the wind, gazing at the distant infinite horizon feel that we would certainly reach it. We clamour because the ocean yields not to us as a weak play-mate should — then slowly does this hankering for the impossible, the unattainable grow into us as a second nature, stronger perhaps than even the original one and compels us to forget self and reasoning. Or do we hanker for things beyond, only because, there is an affinity between our soul and the uncontrollable energies of this universe,

the ancient undying elemental fascination for all that is powerful, a feeling which we have in common with all-power-ful nature. 1.12.12

You complain I am too reserved, too secretive and never show you my heart. How can I do it, when the almighty and all-knowing thought fit to hide it beyond our sight, that even to have a passing glimpse one must either shatter shadowing ribs or pierce through the protecting breast.

2.12.12

I may not perhaps show you the fleshy bulb, but don't I reveal the soul of it in my eyes. Can't you read the poems written there through them and see the light, that never shone on any sky or sea but there? If you cannot, will not or having seen, is not happy, then indeed I am helpless.

2.12.12

In friendship I think one not only does away with nationality but with sex too. You think of her or of him as a friend, an epithet which by the dictates of unyielding grammar must always be common gender. When thinking of them, you forget, whether they are English, Indian, French or Chinese. They bear the magic name that is balm to every pain, benediction in every evil and consolation in every sorrow, they make you happy and you are content.

A man impulsive by nature, is universally more generous in gifts than a woman, and even when he has unusually small hands like hers, surely gives you more than she can, though she may hold out hands exceptionally large ones, like his ought to have been! For untold generations, women have been made housewives and storekeepers of his home and heart. It rested with them to make every thing comfortable and the two ends meet within their means. And this long and necessary training have grown upon them as a second nature, checked their spontaneous charity, made them discriminate and thoughtful givers and sometimes brought themselves even to the verge of miserliness. And changed even those who were naturally more generous and better-impulsive by birth.

We are receptacles of all that his gifts can bring us, earnings of his labour and caresses of his love. He toils on to make himself rich or famous, so that he may please us, and have his attentions attended to. Like a vassal

and a novice he brings his homage and worship, lays them at our feet and we deign to receive them as a queen or a divinity should and slowly this unconcerned acceptance of more than our dues adds to our pride and develops our vanity. Gradually we come to dictate for things that we ought in reality to receive on bended knees, and with supplicating hands. Vanity makes us egoists and we forget the limitations of our nature and unconsciously make demands quite inadequate to our capacity and our worth.

But we [give] him our gifts too after the long weary day, we light our evening lamps, make ourselves pretty and await his home coming. Let him rest, bring him cooling drink and soothing food and with tender hands attend on him. How we long to share his difficulties more than his pleasures and to see his dear eyes light up with love, are glad to lay down all that we hold sacred to him. What a divine happiness it is to put upon his knee the sweet soft body of our first babe, and to see him fondle and praise it. Do we not feel supremely proud when he deigns to find out the likeness of ourselves in his child. What may not, if she chose a woman be, to the man who loves her, his sweetheart, his wife, sister, mother, friend and companion, all blended into one unique whole — his world, his universe, his infinite life. What a waste of gifts to make oneself the play thing of, what a sacrilege to be his mistress only. What man who really loves can wish for such perversion, to aid and abet such degradation?

Of all the deprivations of widowhood, the barrenness of my womb I have grudged the most. To the mother, the little being, that is born of her, is more than human. He is a fairy prince bearing the insignia of love's royal birthright on his pure brow. He is the golden link that connects the divine with the human. He is what nothing else can ever be or ever was. He is love's love, he is unique illumination, a priceless gem, a rare bit of art, a melody of the stars and the spring breath of the awakening earth. To look into his innocent limpid eyes, to press one's lips on his pouting milk flavoured mouth, on the dimpled pink cheeks, to brush one's forehead with the touch of his downy hair and to feel the warm soft clinging tongue and lips sucking at one's full breast, ah, God, what joy can compare with it?

A person of moods is apt to forget the sequences of tenses. For he is under the control of the many and the various, [the infinitive, indicative, subjunctive, imperative], consequently includes all times. 7.12.12

Alas my imperatives have all the indefiniteness of the subjunctive, and I seldom get what I want; would they be more successful, I wonder, if I could make them indicative? Or would they glide away from my untrained grasp and fly to the infinitive?

Writing a great deal, I now find that the mystery of doing it well, smoothly, fluently, evenly and continuously, is to keep the pen clean, to wipe it often and to soften it by keeping it soaked in pure water. A rusty pen, invariably I see, scratches the paper, makes the writing halting, the sentences look scrappy and the letters uneven. It not only sputters ink on the paper, but also on those unfortunates who happen to sit near the writer. 14.12.12

To fulfil the aesthetic or the artistic requirement of a friend or a lover one need only be like a flower; frail, fair, delicate; fresh or drooping as the mood demands. Ravishing with colour, suggestive with scent, illuminating the infinite with just a glance, holding unending possibilities in a single drop of honey, everlasting life in one fluttering breath, the invocation of the eternal in one trembling aromatic sigh. To please rather with suggestions than with satisfaction, awake desires, create longings and with the gift of just one tremulous touch, rouse dormant life and have the butterflies of hope flitting about in numerous iridescent colours.

15.12.12

But to be a support, companion, friend, sweetheart or a wife to man, to still the hankerings of mind soul, to fill the void in his heart and life, one has to become a tree or a creeper; afford shade, shower flowers, drop fruits, entwine with tendrils, to rest, to please, to appease and perhaps to satisfy him to the verge of satiety. 15.12.12

My life, is it life at all, some will ask, because of its monotony. This quiet

existence, simple habits, invariable duties day after day, may disenchant an outsider and perhaps make him doubt that there is any living force dormant or even latent in it somewhere, which though not obvious, is still surely there. Inert waters, do they not hold a strong current in their silent depths; and the serene sky, does it not teem with myriads of atoms so full of eternal life? 16.12.12 my birthday

In my happy childhood, did I ever dream that a time will come when life bereft of all its charm, stand bare and barren before me, and require of me all my strength, all that is of some worth in me, to put forth its utmost energy and make an oasis of a desert? Have I succeeded in doing so? Have I been weighed and found wanting? I hope not. Dear God, thou hast made me suffer, hard have been thy dictates for my little strength, but I have not succumbed, I have not lain down weeping on the ground, and said I cannot. I thank thee for the little trickling of life thou hast still left in the fountain of my heart, and for the faint trembling light at the shrine of my soul. I shall make something of them yet, some seedlings to sprout, a few blossoms to bloom, and with faltering hands I shall place them at thy dear feet and feel myself blessed indeed. 16.12.12

Have the tears I have shed dimmed the inner light of my soul, have the sighs made it flicker? Ah no, they have not. The inmost shrine, the holy of holies where dwells God's hallowed light, is shut in with crystal doors, the outer rays come pouring in through the bright transparency and add lustre to the inner light, but rain and storm beat only their wings against the adamantine strength and fall down frustrated. 16.12.12

How does one reveal self? Unconsciously perhaps, in gestures,.in look, in passing remarks and in simple spontaneous actions. But with conscious effort is it possible? Does not laboured attempt degenerate expression into affectation and so mar its natural charm? Trying to speak of myself at your request, I am afraid of misleading you. For I see that conscious effort leads to a tendency of working up a make believe mood, and compels you to say things which, when analysed aright expose some taint of falseness

lurking in them. Tell me is it nice to make a show of thin ungainly personal pronoun 'I' and really invest it with all the dignity of a first person? It is a soft vowel only, why make it arrogantly discordant? In sanscrit though 'he' the English third person is named first person or prathama purusha, yet 'I' not the first person as in English is the 'good person', uttama purusha. One cannot but admire the refined egoism of an ancient speech. I always thought, discoveries made by ourselves were ever so much more interesting than inventions worked out by others. But you seem to think otherwise. How can I convince you that I am right, from across the seas?

23.1.13

Besides is self an undivided whole, a definite entity? Is it not a bundle [of] contradictions, a crowd of elfish changelings, a concourse of restless elemental forces trying to mingle and make a universe? Ought not self be taken as a collective as well as a proper noun? Do I possess the master gift which can speak a volume in a word? Have I found the intense, miraculous light which will reveal in a flash, the one in many? I feel the divine blessing is not mine. Who knows whether I shall ever have it. Till then I must be content with faltering speech and dim sight and often mistake the counterfeit for the coin. Have I the audacity to introduce it to others knowing full well its worthlessness. Disguise is inevitable sometimes, and must be excused; but false impersonation, except in declared masquerades or on the stage, is never pardoned. In ordinary life under sober questioning eyes, sheltered by a sky that does not even admit of mists, to do so will be, to say the least foolish indeed. 23.1.13

Moods come and pass, phases grow and vanish, days advance only to recede in darkness, we may not even linger long in the twilight. And all the while the infinite, the eternal and the unchanging background of the sky and the mind, stretches on who knows where; always the same and forever serene. This callous unconcern of the infinite, when life trembles in the balance and shivers my hope, is shattered with pain, would rouse rebellion in any one, even the meekest. Yet time and space, with the mysterious power of no beginning and unknown end lure us only perhaps only to win over our mortal self. 24.1.13

Whoever knew that, awakening would mean so much pain. A sadness broods over my heart day and night. Sunlight has lost its brightness, the caress of the summer breeze, bringing a message of the far off ocean pleases me not. The sweet mystery of misty moonshine hangs like a death pall, shutting me out from my dreamland.

When the earth wakes up from her long winter sleep, is it thus with her too? Is the exuberant joy of the first rousing, tempered later on with burning pain, aflame like a censer before an altar? Before the buoyancy of spring, has had time to take full possession of her, does she suddenly realise, that this joy is only flitting and that the inexorable heat of summer and the uncompromising beating down showers of Rain are the only realities that await her — and (then) does she know that the fulness of autumn wealth and the attainment of perfect peace is very far off. My somnolent existence so long had given me an idea, that to wake up, to feel the rush of life in every vein of my lethargic being would be a great joy. I had thought that shadows will become realities and penury turn into a store-house of rich possessions. Ah the first awakening was joy unparalleled. To feel the perfumed breath of blooming spring, all over my weary soul, to listen to the anthem of thousands of joyous birds, to hear the soothing murmur of myriads of fresh-born leaves, to see the miracles shining light and to guess the mystery of gloaming shadows, was ecstasy indeed. But alas my princely guest has departed with his retinue of fugitive spring delights and Summer claims me as his own and regins supreme on the scorched quivering sky and earth as on me all through the long restless day and the swooning night I only suffer. 21. 4. 13

Who wants to be perfect — I don't. Perfection means cessation of growth, I want to be imperfect and to grow, to be alive, awake and aflame with longings. I want to be a flitting, drifting, changing, tossing feeling and a moving being. I crave a life of many moods, of incessant dreams and ceaseless wonder visions. I want to feel the breath of spring to blow pure into my soul, the shadow of benign autumn clouds of [on?] my brow and the marvel of lightning miracles in my weary heart, and on my bosom I want the heaving rhythm of eternal ocean, the caress of harmony and the

chorus of discord. I want to sit in enraptured silence listening to the music that fills the oratorio of the infinite and I long to hear the moaning of the bar to, where time currents cease and the limit of unit being merges into the illimit of the all-being. 22.4.13

A long spell of bad wheather. The sky mourns in grey. No sun moon or stars give us alms of light. The days weep so, the wind moans on, I hunger after light and my eyes fill with tears. 6.6.13

I who have been teaching myself the canons of deprivation, I do not know for how long — suddenly — find that I have become covetous and grasping. To crave for anything seems so degrading. To accept one's days as they come fraught with joy or despair, to be grateful both for sunshine and rain, and to conform to the dictates of the all-knowing, may be with a bleeding heart, that has been my sole aim so long. But I have become dubious of these, instead of peace, truce, resignation, I want to unfurl battle standard and measure strength even with the almighty. So alas I am now an outcast from my heart's heaven, I am forlorn, hopeless and miserable. 2.6.13

What awful bad weather. Continuous rain for a week at a stretch. The sky is solid uniform grey. There is no break in the clouds anywhere, not a shaft light to be seen, seek wher[ever] I would. No flash of sudden lightning, no clash of resounding thunder message making one to start up. awaken with a thrilled heart and a renewed sight in the tired eyes. The constant drip drip of rain, a hopeless outpouring, sustained, unchanging, ceaseless and the helpless monotone moaning of the weary drenched heavy wind, weigh on the mind during the long lonely day and the tired restless wakeful nights. Light-mendicant that I am, the unmoved darkness all around make me feel dreadfully miserable. I long to give up every struggle, laying my forlorn heart against mother earth, I want only to weep. If the sun and moon and stars have forgotten to give me my daily pittance do thou merciful mother, gather me to thy restful bosom. I am aweary and can stand no longer with hands outstretched begging for a dole of light. Let me lie down, rest, sleep and waken no more. 9.6.13

Ah, why did you break my life with your longing? My past is gone, the present is quite absent, and I can build no future, try as I would. The dream-steeped, vision absorbed days are a menace to other people's routine of comfort and though I see I am wanting in consideration, I have not the strength of resistance. I glide and yield to the pressure of the intangible and leave my palpable duties undone. Seeing I am to blame, I feel no longing to improve. 9.6.13

Just because thy ways of thought were not as mine, thou hast placed the barrier of the infinite betwixt my mortal self and thine. Thou hast attained enlightenment supreme, darkness forever dispersed; I am alas in utter darkness and grope along helpless and forlorn. No consolation can I reach through the gloom, hast thy sympathy all vanished, like flimsy mist? 7.9.13

Dark moonless night, gloomy clouds rise high, spread wide. With a heart wounded to the core, throbbing against freedom, barring ribs I toil on through the day. Silent night brings not rest. Sleep comes not, I dare not toss, moan and sigh, lest I should disturb another, my forehead burns, scalding tears only make the support of pillows unbearable. 7.9.13

Thou art free at last, come wrench my soul from this frail body — it awaits thee, beloved, do not delay. 7.9.13

Thou wert my dream indeed, and now the dream is dispelled, life alas has become a nightmare. 8.9.13

On the dark dark night of my life-sky slowly arose a light, making me dream of a new dawn. That vision of light was not a sun but a meteor; a flitting resplendant flash gone forever. Gloomy sombre life creeps on; all hope of light has forever set. 9.9.13

Thy presence looms more immense than infinity itself, thy soul-breath fills the ambient air to the full, I see, I feel, yet I live not. 10.9.13

In the wake of dark night slowly follows dawn, the sky from grey to opal turns, quivers in reving light, I look up, I know thy call, and bowing down offer acceptance. 11.9.13

The moon is filling gradually up, the broken cup-rim shape, from crescent to a golden orb grows — and when on the dawn of the full moon it plunges into the deep sea, will its rays bear me to thee? 11.9.13

Was it just a year ago we met — or was it aeons before? What karma kept us apart so long, ah, what will again bring us together. 11.9.13

With the point of thy sharp-edged sword thou hast put the vermilion mark on my forehead — in lacquer-red liquid painted my feet, and with memory's fast iron wristlet thou hast claimed me beloved as thy bride for eternity. 12.9.13

With softly scented cream white flowers, night-dew — drenched, I offer my thoughts to thee at dawn. In my love, in my longing and in my remembrance do thou find rest and peace. 13.9.13

When this frail body all-wearied with the great burden of pain seeks the shelter of thy bosom dear mother earth, when the heart bursts all its bonds and finds liberation, then shall peace come and sorrow altogether cease. Till then with tottering steps I must trudge along, cherishing one forlorn hope that I may meet somewhere him here-after.

Thy death-arrow has struck deep, sharp and poignant into the very core of my heart, and it will not be long ere I join thee in the silent shadow land.

Wait a while with patience and think not of me as thoughtless that I do not join thee at once. The heart, the soul, the mind with all its hankering love have gone to thee, only the weary burden of flesh takes time to burn up and vanish wholly into the awaiting elements.

Thy hand-traced characters bearing the tidings of thy thought come to me still — divine messengers from the shores of eternity.

My whole life had been washed in a continuous flow of tears, sorrow chastened I lived, and peace was not off — ah, why this new mystery of meteor light and why this sudden all-engrossing gloom!

The anniversary of our meeting of a year ago comes tomorrow — would that it could be the final consummation, the union everlasting. 15.9.13

I can not take up this weary burden of life again dear God, be thou all merciful let me lie down and die. 17.9.13

A great joy filled with all eagerness seems to possess my soul—shall I meet thee my beloved my soul-mate? 20.9.13

Ah what impatient breathing, what restless eager sentient fluttering touch I feel all over my being — beloved, await a while, let the cool soft silent night descend all around, I shall then yield all unto thee. 20.9.13

This great great stillness, solitude all round, this perfect quiet bring no peace to me, because thou art not. The infinite sky has shrunk to nothingness and like a miser's purse gives no comfort to my poverty-stricken miserable soul. Ranchi 21.9.13

Up the narrow hillpath I go on alone, it is steep and rugged, often I have to stop for my breath becomes short and resting a while I slowly climb up again to the steps of the temple for I think up there nearer the purer blue, in the greater light and fresher air, I shall feel the touch of thy free–soul breath more, and closer. 22.9.13

Every day that is added to the burden of my days tries my little strength more and more, I bend lower down and still lower– dear mother earth take me into thy bosom and give me rest all abiding. 22.9.13

The whole day long I only pore into books seeking a little light for my darkened eyes, a little balm for the throbbing wound in my forlorn heart, yet no solace can I find anywhere. 22.9.13

Ever and anon I seek the sanctuary of solitude and beyond the ken of prying eyes I offer to thee my tears in sacred secrecy. 23.9.13

Things that had pleased me so always have lost all their charms —neither the sunlit sky not the beauty-adundant green earth bring me comfort any more. 23.9.13

Weary, weary I drag myself through the short autumn day – yet I have no consolation for I know not how many more are yet in store for me. 23.9.13

To be weakly yielding to my sorrow would make me unworthy of thee, so I tax my patience to the utmost and try to be strong and bear up—yet strength and patience both are unavailing and I long for rest and unawakening sleep. 23.9.13

Dark days and darker nights only spread endless before me. I toil on and see no light anywhere—will it be always thus, will there not ever descend from thy enlightened soul any message of love and light to guide my tottering steps? 23.9.13

Every pain we bear, every suffering we undergo is an asset and a gain, helps to burn up the dross there is in us and makes us more acceptable of our beloved dead. 24.3.13

Try as I would to strengthen to shelter and hold up my heart in grace, to make her go on with life, ever and anon arises the forlorn cry from the very depth of my being, I can not, I can not. 24.9.13

Sufferings of a life time had lost their weight because of thy thoughts for

me — now bereft of that sole comfort, life's burden has become too heavy, I can neither move not creep along. 24.9.13

Bright brave morning glories tossing their gay heads against the sunlit blue of the sky— they are happy, they have seen the sun they had waited for through the dew-drenched night and long before he sets they would droop in tender delight and pass away. 24.9.13

Do thou give me a message of thy kindliness taken of thy thought for me and make this utter void conceive of a little light a little comfort to rest my eyes and lean my heart on for a while. 25.9.13

Thou hast passed away beyond all earth limit, yet within my heart thou art ever present, beloved this barrier of flesh prevents perfect union, intercede the gods, break the prison and take my all unto thee.25.9.13

My thoughts range infinity and reach thee, dear love; let thy thoughts so reach me too and bring me patience. 25.9.13

I know such perfect love was not of this world and would never find fulfilment here—yet nothing can keep us apart, when the boundary of earth is passed—when infinite and ethereal regions receive us both. 25.9.13

When the ochre-coloured light covers the west and the tired sun renounces the world—a great peace slowly descends on my heart for I feel myself nearer by a day to my ever longed for last goal. But when the dawn bursts forth again in the bridal red no sympathetic joy responds in my heart and the chorus of birds only brings tears (fills my eyes with tears) to my eyes. 25.9.13

In sorrow or in joy how helpless we are—and the gods to whom we pray for support how unapproachable they seem; when dark days come and our little light of job how utterly lost it is in their ineffable splendour. 25.9.13

You have left me alone to carry on the hard task of continuing a life bereft of all joy, emptied of all hope. Because you have deemed me worthy of this devotion I try to take up the overstraining burden and yet I am weak weak and my heart is full of despair. 26.9.13

My heart throbs with pain and incessant beats against the ribs, like the restless sea dashing upon rock-bound shores— but the sea is more fortunate, it can overleap the limits when it listeth, alas, my poor heart can only beat on imprisoned,helpless with unceasing pain. 26.9.13

Overhead a cruel sun dominates the whole sky, beneath me all around lies the sandy parched land broken and agape, yet from somewhere unseen comes the cool gurgling sound of flowing water. 26.9.13

How much longer can this clay body bear the strain of this great burden, this torture and this ever burning pain in the heart is a problem that seeks solution every day. 27.9.13

I opened my eyes before dawn and saw the border of the eastern sky slowly reddening. With a connection deeper than one's heart-blood, silent beside the setting frail moon of dark nights stood morning star awaiting to plunge together into the sea of all oblivion. 28.9.13

The moon with his glowing star mate is gone, vanished is the flush of awakening dawn, from the sky a white light chaste and bright (brilliant) falls slowly from the heavens to the earth, yet on the wood border of the horizon, on the far away grey hills floats a dewy hazy mist.

28.9.13

The uniform grey of my life was tinged with the varied colours of thy thoughts, and against the unchanging background rose the rainbow of promise and hope, spanning earth and heaven — alas now, as that colour is gone, silver grey has become sombre black and life is garbed in weeds indeed. 29.9.13

Though in my heart of hearts I know this life can not go on so, much longer; Yet outward life is unchanged, the wearisome invaried routine continues still the same. 29.9.13

To believe that thou art not any longer makes me feel so weak that I constantly pray to the gods to work miracles again and make mortal man ever living. 29.9.13

Sun-light heralds a new day, life is born anew after the deep dark oblivion of night, flowers open their eyes and rejoice in the bright light. I too slowly open my tired eyes, but shut them again; the glare hurts, and I long for the cool shadow of dream-bound darkness. 30.9.13

Beyond the horizon, what is happening, who knows? My love messages cross the earth limit, do they bring thee any comfort? 30.9.13

Night and day thoughts of thee are never estranged from my heart, O thou who never live in my life, yet because thou hast passed away, I have no life to live any longer. 30.9.13

I see the horizon kissing limits of the wide earth narrowing all around, infinite times unknown boundary pressing close upon me, I do not see beyond the day, and the murmur of eternal life's ceaseless ripples reach mine ears softly, oh so softly. 30.9.13

Be what may I shall bow to it in sweet patience. Come what may I shall accept of it with pure content, for nothing can estrange thee from my heart, no power can relax the intensity of my thought for thee. 30.9.13

A part of my being has become desperate and would accept of no consolation, another has become insane and rejoices in dreaming impossible dreams. 30.9.13

When evening shade gathers and the blue of heaven turns grey, sunset glow

slowly fades from the skies, silence deepens, the stars come out one by one and flash soul messages— then I sit alone in the dark awaiting thy presence, ever as long as life abides in me, that still twilight hour shall always be thine. 30.9.13

The glare, the noise, the rush of life that assail me during the day and burdens on the wound of the heart too painful to bear. 1.10.13

I had given up and only given things that might have made me happy, to please others, and now I find there remains nothing left to give up but life, to please myself. 1.10.13

Shall I forget thee—never! I have closed all the doors of my heart and shut the dream of thee in secure—and so thinking only of thee I shall reach my long long sleep. 2.10.13

Thy dear name has become in my heart a mantra, secret and sacred, and oft repeating it softly all day long, I shall attain salvation. 2.10.13

Though the heat-tired flowers droop dew-drenched in the silent shade of the evening and the weary sun sinks slowly in the bosom of the ocean, yet I seeking thee have lost all sense of weariness of body and soul, and toil on up the steep hill path, my heart all concentrated upon the heavens above. 2.10.13

Shall I like a village maid rush, cry and break my head against the stone walls—because God's decree has parted us—my tears fall silently at night, I bear the sorrow-wound deep in my heart, and looking at my placid eyes none knows how I suffer. 2.10.13

Do what I will, I can not console my aching heart, it only cries forlorn for its departed mate. 3.10.13

This place steeped in silence, coloured with the green and blue of earth

and sky, flooded with sunlight has no message for my heart, my eyes look on but the fascination that lived in nature so long is gone, gone forever.
3.10.13

Alone I can only shed tears and sit unconsoled while my heart goes moaning, in unreconciled darkness. 3.10.13

The sunset sky this afternoon had a unique beauty on a golden stream of light floated dark clouds like a flotilla of funeral boats slowly moving on towards a shore far off and unknown. 3.10.13

Days do not pause to take us with them, companions of the voyage infinite; neither does sorrow cease, yet lingering my life drags on its course somehow. 3.10.13

All light has died in my eyes, yet I am not blind; only my songs unable to bear the sombre darkness of my heart have gone to sleep never again to wake up. 4.10.13

It is a wonder that when all one's heart is quite dead seeming life still lingers on. 4.10.13

I know the uttermost limit of endurance has not yet been reached—a burden or two still remain to be heaped on, then quite prostrate I shall lie down, die. 4.10.13

I await a message, which I know surely will come, and then my day will be done, and I shall attain rest and peace. 4.10.13

Thou knowest my heart, I want to know thine. When that knowledge dawns upon me, new life will be born in me, and I shall reach another sphere.
4.10.13

Sooner or later the great rest so longed for will come, but my overtired

being has no patience, and wants it to be at once. 4.10.13

Small, blue, golden-hearted flowers lie strewn all over the ground where I walk in the morning— dear love, from thy celestial home dost thou in the night scatter bits of star encrusted heaven upon this earth for my comfort? 5.10.13

Come to me as sleep, sweet dreamless sleep dear love, and merge my whole being into thine. 5.10.13

I have kept awake too long dreaming, I am aweary and long for deep quiet slumber. 5.10.13

Misty white moonlight veils the whole world in a dream canopy dear love where art thou, in what distant sphere separated that we too can not lie together sleeping bathed in this chaste light? 6.10.13

Stars float on a sky flooded by moonlight like eyes of lovers dream-lost in melting love. 6.10.13

Silence once talked (spoke) to me in soothing language, sunlight fell upon my weary eyes with a wooing caress making me look around in tender delight— alas, silence has become mute and sunlight cruel so my only solace now is to sit with closed eyes, still and silent, hoping to catch some message unawares from the noise around. 7.10.13

For long hours I walk about in the moonlight with my lonely shadow for a companion. 8.10.13

What thoughts come to me in those lonely hours when silence of deep slumber reigns over all — you know. You have escaped the barrier of flesh and to your luminous soul-eyes nothing remains unrevealed.

8.10.13

Sunlight has turned to mist in my eyes because the hope of meeting the light in thine is gone. 8.10.13

The face of the earth is blurred because of the mist that covers my sight and the message of the stars is gone forever. 8.10.13

On the black barren rock slender two reeds sway in the soft moonlight, they are apart, yet they touch each other tenderly a boulder keeps them apart yet at [as?] every breath of wind they touch each other tenderly. 9.10.13

In the shadow of the hill I had thought to live secure, yet cruel rain and storm tear my flower creepers and suddenly break through my thatched roof. 9.10.13

My heart was too full of thought of thee yesterday so I had no speech. 11.10.13

I can hardly believe that these weary weary days will drag me on to weeks and months and that with darkened eyes and a crushed heart I shall have yet to exist. 11.10.13

I sit eagerly awaiting thee, yet thou comest not and not even in my dreams do I see thy face for the sight of which I so long for. 12.10.13

Impossibilities I crave for in place of realities and all things that are have become to me non-existent. 12.10.13

Years ago this day brought me a great joy, I gave birth to a son— he is gone, even the memory of his dear tender touch has faded away from life. Yet as it is [the] only lucky day in my life I go on hoping against hope that some message so longed for, may come to me from there. 12.10.13

Ah this fluttering restless soul, eager for its flight into eternity, breaking

its head against the cage of this body when will it find liberation and be at peace! 13.10.13

To see the world going on just as before has made me sceptic about the mercifulness of the gods.

Ah, what good to pray and lay down the best of oneself as offering at their feet if justice is unavailable and if even a transient look of wistful pity is never vouchsafed of us.

A mortal mother with all her faults frailties her limited knowledge can never bear to see one of her children suffer as I am suffering now, yet the gods the omniscient, the ever present ones with the control of the infinite and eternal in their grasp are quite indifferent to the heart rending pain of their human children; the invariable routine of the universe is enacted daily as usual whether hearts are dead or lives are being broken on the rock.

Yet to have sweet simple faith is the best comfort that one can think of in this sorrowful earth, and because I have lost it, my pain is insufferable.

15.10.13

The fuel is burned up, the beautiful ruddy flame has vanished and only the pale grey ungenerating ash remains. 17.10.13

The last bit of little light is gone from life, uniform sombre black surrounds all— hold up thy polar star now steady and bright and communicate to me the strength to look up and go ahead. 17.10.13

With every breath the murmer of thy name stirs my heart, with every look awake anew the longing for the light that lived in thine eyes. 20.10.13

With every breath the murmer of thy name stirs my heart, every look I cast around renewes the longing that pines in my being for the light of thine eyes. 20.10.13

Beloved where art thou, reach me in thought, reach somehow and soothe my ever restless crying heart. 20.10.13

The limitation of day and night is gone from my life–for there is nothing but darkness before me always. 22.10.13

It had rained in torrents but of that flood (nothing) (survives) no trace lives now to give memory life— only the trembling lotus has stored a few drops that gleam like diamonds. 18.11.13

I can do nothing with my throbbing heart, alas, I can bring it no quietude for it beats with the rhythm of the ocean's restless tide and knows no stillness.

I can weave no garlands with my longings to wind round thy clasped hands and make thee prisoner. Alas they are flowers of the sky, eternal, illusive. I know not how to pluck them and unfold their message. The zephyr breath of spring knows their thoughts and shakes the soul in speechless perfume.
6.12.13

Every moment to us is momentous, because of the uncertainty that lives hidden in it. 19.12.13

When I think of my life, not rich perhaps in hopes, but precious with memories I do not feel poor at all. 5.1.14

Our world is within us, and when that is shattered, we have no other.
Barisal. 21.6.15

Who calls me to the unknown, with the glance of the sky and the fondling touch of the breeze? That is why leaving my couch I stand entranced at the open window. Eagerly I have come down from the balcony and offer myself to the embrace of the outstretched darkness. Alone I stand in the silent yard.

তথ্যপঞ্জী ও পরিশিষ্ট

তথ্যপঞ্জী

প্রথম পর্ব

১. 'মনের দিনেক কথা' রচনাটি প্রিয়ম্বদার অন্য দুটি পূর্ব-প্রকাশিত লেখার সমাহার ('মানসিক', *ভারতী*, পৌষ ১৩২৩ এবং চৈত্র ১৩২৬)। এটি একটি স্বতন্ত্র লেখা হলেও 'মানসিক' শীর্ষক রচনা দুটির অনেকাংশ এতে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব

১. ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল : ১৯১০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের একটি প্রস্তাব রাখেন। এই বিষয়ে তাঁর লেখা প্রস্তাবটি *ভারতী* পত্রিকায় চৈত্র ১৩১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে আলোচ্য প্রস্তাবটির বঙ্গানুবাদ করেন প্রিয়ম্বদা দেবী। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের কলকাতা শাখার সম্পাদিকা কৃষ্ণভাবিনী দাসের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, 'প্রায় ৪ বৎসর হইল শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামক একটি নারী সমিতি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের সকল ধৰ্ম্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে একত্র আনয়ন করিয়া শিক্ষাদ্বারা তাঁহাদের নৈতিক, মানসিক ও অবস্থাগত উন্নতি সাধন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য' (দ্র. কৃষ্ণভাবিনী দাস : 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল', *মহিলা*, কার্ত্তিক ১৩১৯)। কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যুর পর প্রিয়ম্বদা ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের 'সেক্রেটারি' নিযুক্ত হন (নিযুক্তির সঠিক তারিখ জানা যায়নি), এরও আগে তিনি মহামণ্ডল-পরিচালিত অন্তঃপুর শিক্ষা-কার্যে অংশগ্রহণ করেন (দ্র. প্রিয়ম্বদাকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, পত্র ৯, ৮ মার্চ, ১৯১২, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৩৮)। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল বিষয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও তাঁর স্মৃতিকথায় কিছু আলোচনা করেছেন (দ্র. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : *জীবনকথা* [দ্বিতীয় পর্ব,] *এক্ষণ*, শারদ ১৪০০)।

২. দ্র. শ্যামলাল গোস্বামী : 'স্বদেশী সাধনায় বঙ্গমহিলা', *মাতৃ-মন্দির*, অগ্রহায়ণ ১৩৩০।

৩. শার্লট পারকিন্স্ গিলম্যান (Charlotte Perkins Gilman), ১৮৬০ - ১৯৩৫, কনেকটিকাটের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। লেখিকা হ্যারিয়েট বীচার স্টো তাঁর এক সম্পর্কিত প্রপিতামহী ছিলেন। গিলম্যান-এর *Women and Economics* (১৮৯৮) তাঁকে প্রসিদ্ধি দেয়। তবে এর আগেও (১৮৯২) *New England Magazine*-এ তাঁর লেখা একটি বড় গল্প 'Yellow Wallpaper' বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। শিল্পোন্নত সমাজে পারিবারিক চৌহদ্দির বাইরে মেয়েদের বেরিয়ে আসতে হলে সমাজকে সন্তান পালন ও তার ভরণ-পোষণের মতো কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এমনই দাবি তুলেছিলেন গিলম্যান তাঁর *Women and Economics* বইয়ে। তাঁর শান্ত ও নিস্তরঙ্গ অবয়বের আড়ালে ছিল ক্ষুরধার লেখনীর তীব্রতা। গিলম্যানের *Man-Made World* (১৯১১) গ্রন্থটি তিনি

সমাজবিজ্ঞানী লেস্টার ওয়ার্ড-কে উৎসর্গ করেন। সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে ওয়ার্ডের তত্ত্ব—তিনি বলেছেন যে গোড়ায় ছিল এমন এক সমাজ যেখানে নারীই ছিল প্রধান (gynaecocentric theory of life) এবং সেই সমাজ পরিবর্তিত হয় পুরুষ-আধিপত্যাধীন সমাজ-ব্যবস্থায় (androcentric theory of life) — সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে গিলম্যান তাঁর পুরুষ-গঠিত পৃথিবীর ধারণা গড়ে তোলেন।

ষাটের দশকের মার্কিন মহিলারা তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র প্রভৃতির সন্ধান পান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্লেমিংস গ্রন্থাগারে। তাঁর আত্মজীবনী 'শার্লট পারকিন্‌সের বেঁচে থাকা' *(The Living of Charlotte Perkins Gilman)* ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার পর তিনি আত্মঘাতী হন।

সুদুষ্প্রাপ্য *Man-Made World* বইটি প্রিয়ম্বদার অনুবাদে *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকায় প্রকাশ পায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ থেকে। কিভাবে এই বইটির সঙ্গে তাঁর পরিচয়লাভ ঘটেছিল এবং কেনই বা অনুবাদের জন্য বইটিকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি তার কোনো প্রমাণ আমরা পাই না। তবে, সম্ভবত প্রিয়ম্বদার পরে বাংলায় গিলম্যানকে নিয়ে চর্চা আর হয়নি। গিলম্যানকে বাঙালি পাঠকের কাছে হাজির করলেন নবনীতা দেবসেন দীর্ঘ ৬৮ বছর পরে ; *দেশ* পত্রিকায় (শারদীয় ১৪০২) প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'Yellow Wallpaper' গল্পের অনুবাদ।

তৃতীয় পর্ব

১. উইলিয়াম হেনরি হাডসন (William Henry Hudson), ১৮৪১-১৯২২, ছিলেন এক দরিদ্র মার্কিন পরিবারের সন্তান। আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেসের কাছে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে হাডসন অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু ১৫ বছর বয়সে বাত-জ্বরে আক্রান্ত হবার পর পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তাঁর আজন্ম-লালিত প্রকৃতিপ্রীতি সুদৃঢ় হতে থাকে। এরপর থেকে বিভিন্ন আর্জেন্টিনিয় এবং ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রকৃতি বিষয়ে নানা নিবন্ধ এবং দক্ষিণ আমেরিকার পটভূমিকায় গল্প লিখতে থাকেন। ১৮৬৯ সালে (মতান্তরে ১৮৭৪) তিনি বৃটেনে আসেন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম *The Purple Land* (১৮৮৫) ; বইটি মূলত দক্ষিণ আমেরিকার পটভূমিতে লেখা গল্পের সংকলন। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত *Argentine Ornithology* বইয়ের অংশবিশেষের রচয়িতা ছিলেন তিনি। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত *The Naturalist in La Plata* বইটি তাঁকে পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত করে তোলে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হল *Idle Days in Patagonia,* বইটি ১৮৯৩-তে প্রকাশিত হয়। সারা জীবনে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞান-ভিত্তিক বহু রচনা, রোমান্স-ধর্মী গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখেছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। ১৯০১ সালে তিনি Civil List Pension পান এবং এই বৃত্তির মাধ্যমেই তাঁর পক্ষে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ সম্ভব হয়। ১৯০৪-এ তাঁর বিখ্যাত বই *Green Mansions* প্রকাশিত হয়। বৃটেন বিষয়ে তাঁর কিছু বই *British Birds* (১৮৯৫), *Afoot in England* (১৯০৯), *A Shepherd's Life* (১৯১০)। প্রাণীতত্ত্ববিৎ আলফ্রেড ওয়ালেস (Alfred Russell Wallace) এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রথম প্রকাশিত তালিকাপঞ্জীর প্রধান সম্পাদক, লেখক রিচার্ড গার্নেট (Richard Garnett) তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

সমসাময়িক বাঙালী সমাজেও হাডসন যে সাদরে পঠিত হতেন তার প্রমাণ পাই প্রিয়ম্বদার লেখায়, রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণে। প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'Idle days in Patagonia যদি পড়ে থাক আমাকে পাঠিয়ো, আমি ওটা আমার Idle days in Mazaffarpur এর জন্য সংগ্রহ করে এনেছিলুম—যদি ঐ জাতের আর কোনো বই থাকে প্রবাসের জন্য আমাকে পাঠাতে পার ?' (দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র ৮*, কলকাতা : বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ১৭৬, পৃ. ২০৯)। *পিতৃস্মৃতি* (কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬) বইয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন : 'সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডব্লিউ. এইচ. হাডসন সম্বন্ধে বাবার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মনে পড়ে দিদি আর আমি যখন বেশ ছোট ছিলাম, আমাদের ইংরেজি জ্ঞান ছিল যৎসামান্য। হাডসনের ভ্রমণকাহিনী থেকে বাছা বাছা অংশ বাবা আমাদের পড়ে শোনাতেন। হাডসনের রচনার মধ্যে বাবার বিশেষ প্রিয় বই ছিল *The Naturalist in La Plata* ও *Green Mansions*। রোটেনস্টাইনও বাবার মতো হাডসনের অনুরাগী ছিলেন, তিনি উদ্যোগী হয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। . . . এই ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে এই বিচিত্র মানুষটির সম্বন্ধে বাবার শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে যায়।' পরিশেষে রথীন্দ্রনাথ বলছেন, হাডসন তাঁর 'প্রেম উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন প্রকৃতির কাছে—যে প্রকৃতি আরণ্যক, যা সভ্য মানুষের সংস্পর্শে মলিন হয়নি।'

২. *The Naturalist in La Plata* (London, Chapman, 1892).
Idle Days in Patagonia (Londan, Chapman, 1893).
'লা প্লাটার প্রাণীতত্ত্ববিৎ' প্রবন্ধে *Idle Days in Patagonia*-র পরিবর্তে প্রিয়ম্বদা দেবীর *Idle Rambles in Patagonia* লেখা পাঠকের কৌতূহল জাগায়।

৩. মেইগ্নান-এঁর পরিচয় অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি। তবে বইটির নাম ও প্রকাশনার তারিখ পাওয়া গিয়েছে এবং বোঝা যাচ্ছে এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ।
Victor Meignan, *Over Siberian Snows: records of travels* [tr.], with 16 plates, (London : Sonnenschein, 1885).

৪. আলোচ্য ব্যক্তি উইলিয়াম হেনরি হাডসন কিনা অথবা প্রবন্ধটি হাডসনের কোনো রচনার অংশবিশেষের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ কিনা—সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল না।

৫. স্যার রবার্ট স্টাওয়েল বল (Sir Robert Howell Ball): বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ। ১৮৪০ সালে ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫ অবধি শিক্ষালাভ করেন। প্রধানত জ্যামিতি এবং আবর্ত গতিবিদ্যা (rotational dynamics) ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। ডাবলিনের রয়াল কলেজ অফ সায়েন্সেস, ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৮৮৬ সালে নাইট উপাধি পান। তাঁর রচিত কয়েকটি বই : *The Theory of Screws: A Study in the Dynamics of Rigid Body* (১৮৭৬), *Treatise on Spherical Astronomy* (১৯০৮) প্রভৃতি। বল ১৯১৩ সালে মারা যান।

৬. নিকোলা টেসলা (Nikola Tesla) : তড়িৎ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক। ১৮৫৬ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সীমান্তের নিকটবর্তী স্পিলিয়ান লাইকায় জন্মান। প্রথম জীবনে ক্রোয়েশিয়া ও অস্ট্রিয়ায় এবং পরবর্তীকালে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

ভিয়েনার পলিটেকনিক তাঁকে ডি. এস-সি উপাধি প্রদান করে। তাঁর চর্চার বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা ও দর্শন। আমেরিকায় বসবাস করতে শুরু করার পর টমাস এডিসনের সঙ্গেও কিছুদিন কাজকর্ম করেছিলেন। বিনা-তারে বিদ্যুৎ সঞ্চালন (transmission of power without wires) তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনা। এছাড়া আমেরিকার নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সুবিশাল বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পরিকল্পনাও তিনি করেন। নিউ ইয়র্কে ১৯৪৩ সালে তিনি মারা যান।

৭. উইলিয়াম হেনরি ওয়াডিংটন (William Henry Waddington) : ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক, মুদ্রাতত্ত্ববিদ। ১৮২৬-এ জন্মগ্রহণ করেন। ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে গ্রীস, এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ায় ভ্রমণশীল হন। ১৮৭৩ সালে তিনি ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী, ১৮৭৯-তে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এবং ১৮৮৩-৯৩ তিনি ইংল্যান্ডে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম *Voyage Archéologique en Gréce et en Asie Minure,* 6 volumes (১৮৪৭-৭৭)। মৃত্যু : পারি নগরে ১৮৯৪ সালে।

৮. ফ্র্যাঙ্ক হেগার বিগলো (Frank Hagar Bigelow) : মার্কিন আবহ-বিজ্ঞানী (বায়ু-বৈজ্ঞানিক)। ম্যাসাচুসেট্‌স-এ জন্মান ১৮৫১ সালে। ১৮৮০-তে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. এবং ১৮৯৯-তে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। আর্জেন্টিনার আফিসিয়ানা মিটিওরোলজিয়া-য় আবহবিদ্যার অধ্যাপক, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সৌর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, যুক্তরাষ্ট্রের আবহবিজ্ঞানের জলবায়ু বিভাগের কর্মকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্পেন, পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি নানা স্থানে পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানীদলের সদস্য ছিলেন। শিক্ষকতা ও গবেষণার পাশাপাশি আমেরিকার নানা জায়গায় যাজকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। মৃত্যু : ১৯২৪।

৯. Okakura Kakuzo : *The Book of Tea (New York,* Fox Duffiled and Company, 1906)। উৎসর্গ : আমেরিকার বিখ্যাত ম্যুরাল শিল্পী জন লাফার্জকে। ১৬০ পৃষ্ঠার এই বইটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত : 'The Cup of Humanity', 'The Schools of Tea', 'Taoism and Zennism', 'The Tea Room', 'Art Appreciation', 'Flowers', 'Tea-Masters'। প্রিয়ম্বদা দেবীর 'চা-গ্রন্থ' রচনাটি *The Book of Tea*-এর প্রথম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ভাবানুবাদ। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে জাপানের রাজনৈতিক উত্থান এবং পাশাপাশি এশিয়ার অন্য অনেক দেশে বিদেশী শাসকের উপস্থিতি—এই পটভূমিতে পশ্চিমের সামনে প্রাচ্যের দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতির মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়াস করেছিলেন ওকাকুরা তাঁর ইংরেজি ভাষায় লেখা বইগুলোতে। *চা-গ্রন্থ* প্রকাশের পর পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ওকাকুরাকে নিয়ে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় কালক্রমে বইটি অনূদিত হয়েছিল।

প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বইটি পড়ে নানাভাবে অনুপ্রাণিত হন। প্রমথ চৌধুরী ওকাকুরার *চা-গ্রন্থ* বিষয়ে বাংলায় একটি কবিতা লেখেন। প্রিয়ম্বদা দেবী ওকাকুরাকে লেখা ১ অক্টোবর ১৯১২ তারিখের চিঠির সঙ্গে সেই কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়ে দেন : 'To Japan did China teach the cult of tea,/ And tinged her thought with its yellow hue . . .' ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এই বইয়ের ফরাসী সংস্করণের সপ্তম অধ্যায়ের একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন (দ্র. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, 'শিল্প সৌন্দর্য্যবোধ', *জয়শ্রী,* আষাঢ় ১৩৪২)। (এছাড়া

দ্র.'প্রিয়ম্বদা দেবী ও ওকাকুরা কাকুজো প্রসঙ্গ', বর্তমান গ্রন্থে পৃ. ১৩৯ ; ওকাকুরাকে লেখা প্রিয়ম্বদার চিঠি, পত্রসংখ্যা ১, পৃ. ১৪১)।

১০. Okakura Kakuzo : *The Ideals of the East* (London, John Murray and Company Ltd, 1903)। তাঁর প্রথম ভারত-ভ্রমণের দু'বছর পরে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ। 'আর্য্যা নিবেদিতা' বইটির পাণ্ডুলিপির পরিমার্জন করেন এবং পরে প্রকাশকালে একটি ভূমিকাও লিখে দেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : '. . . ওকাকুরার *Ideals of the East, Book of Tea* প্রভৃতি বইগুলি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই তাঁর কদর বুঝবেন। তাঁর ভাষায় হয়ত ইংরেজী ব্যাকরণের ভুল থাকতে পারে, সেগুলি আমাদের ১৯ নংয়ে ভগিনী নিবেদিতা দেখেশুনে সংশোধন করে দিয়ে ছিলেন।' (দ্র. 'জীবনকথা', দ্বিতীয় পর্ব, *এক্ষণ*, শারদ ১৪০০, পৃ. ৪৯, ১১১)। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় হয় ভগিনী নিবেদিতার সূত্রে। প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়েও সুরেন্দ্রনাথ *The Ideal of the East*-এর কথা উল্লেখ করেছেন : 'Okakura himself was silent, but was being vigorously talked to chiefly by Nivedita ... all her complimentary reference—either to himself or to his country, then coming into the lime-light, or to his book, the manuscript of which Nivedita, to her great delight, had been privileged to peruse,...' (দ্র. Okakura Kakuzo, *Collected English Writings* 3, Tokyo, Heibonsha Limited, 1984, p. 234).

The Ideals of the East বইটির শুরুতে রয়েছে 'Asia is one', এই শ্লোগান। ওকাকুরার এই বাক্য ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের যুবচিত্তে অনুরণন তুলেছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রিয়ম্বদার চিঠি, পৃ. ১২৯)।

১১. আঁরি ফেদেরিক আমিয়েল (Henri Frédéric Amiel) ১৮২১-৮১। সুইৎজারল্যান্ডের এই চিন্তাবিদ ও লেখকের বিশেষ কোনো লেখা তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, ১৮৫৪-এ *Gains de mil* এবং ১৮৭৬-এ *Les Etrangérs* -এর মতো দু'একটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া। সেই সময় তাঁর তেমন কোনো পরিচিতিও ছিল না। আমিয়েলের সুদীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণমূলক রচনা *Fragents d'un Journal Intime* প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে, তাঁর মৃত্যুর পর। এই জার্নাল আমিয়েলকে মৃত্যুপূর্ব প্রসিদ্ধি দেয়।

প্রিয়ম্বদা দেবী যে সময় আমিয়েল অনুবাদে মন দিচ্ছেন, সেই সময়টার দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। তখন (১৩১৭-১৩২২ বঙ্গাব্দ) *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*--র সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৩৩ শকাব্দে (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রিয়ম্বদার 'সাধুবাক্য' নামে দু'টি লেখা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৪ শকাব্দে তিনি 'ভক্তবাণী' নামে একাধিক লেখা লেখেন *তত্ত্ববোধিনীর* জন্য। এই সময় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীও গীতা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখছিলেন *তত্ত্ববোধিনীতে*। হয়তো সম্পাদকের উৎসাহেই তখন পত্রিকায় এই ধরনের লেখা ছাপা হচ্ছিল। একই সময়ে প্রিয়ম্বদাকে একটি চিঠিতে (পত্র ৫, বর্তমান সংকলনে পৃ.১৩৪) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তুমি নিজের মধ্যে একটি প্রবল শক্তিকে জাগিয়ে তোল ... সত্য হও, দৃঢ় হও ...'। আর আমিয়েলকে অনুসরণ করে প্রিয়ম্বদা লিখছেন, 'আমি আমার কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু সে কর্ত্তব্য কোথায় ? সে কর্ত্তব্য কি ?...'

১২. *ছিন্নপত্র*-এর মতো *চৈতালি* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা নদীবক্ষে পদ্মাবোটে থাকাকালীন

লেখা। *ছিন্নপত্রাবলী* বইয়ে *চৈতালি* কাব্যগ্রন্থের একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়। *চৈতালি*-র 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ বলছেন : 'পাতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ ; অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্য খেত ধূ ধূ করছে। কোনো-এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। ... মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়।' (*রবীন্দ্ররচনাবলী* ৩, কলকাতা : বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৩৯৩, পৃ. ৫)। ১৩১৮ সালে তাঁর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে দশদিনব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতা থেকে অতিথি হয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুকুমার রায় প্রমুখ। এঁরা, এবং শান্তিনিকেতনস্থ অজিতকুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায় প্রমুখ প্রতিদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো-না-কোনো কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতেন। ২১ বৈশাখের আলোচনার বিষয় ছিল *মানসী* ও *চৈতালি*। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যা বলেছিলেন তার অনুলিখন করেন ক্ষিতিমোহন সেন (দ্র. 'চৈতালিটা আমার বড় আদরের', *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৫)।

চতুর্থ পর্ব

১. এটি সম্ভবত প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রথম প্রকাশিত রচনা। বামাবোধিনী সভা-কর্তৃক আয়োজিত বালিকা সমিতিতে লেখাটি পাঠ করেন প্রিয়ম্বদা, তখন তাঁর বয়স ছিল পনের-ষোল বছর।

২. প্রিয়ম্বদা রচিত গ্রীক মিথলজির এই কাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অভিড-এর *Metamorphoses* কাব্যে যে বর্ণনা রয়েছে, তার থেকেও প্রিয়ম্বদার বর্ণনা কিছুটা ভিন্ন। অনুমান করা যায় যে প্রিয়ম্বদা দেবী ক্যালিস্টো-আর্কাস-এর কাহিনী নিজের মতো করে কল্পনা করে নিয়েছিলেন। *The Oxford Classical Dictionary* (Oxford : Clarendon Press, 1970), পৃ. ৯৪-এ ক্যালিস্টো সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'Probably a by-form of Artemis, in mythology, daughter of Lycaon. She was loved by Zeus and bore him Arcas. Either Artemis, angered at her unchastity, or Hera then turned her into a she-bear; or she was shot by Artemis. In her transformed shape, either Artemis mistook her for a real bear and killed her, or her own son pursued her (as a quarry, or because she was trespassing on the precinct of Zeus Lycaeus), when Zeus took pity on them and transformed him into the constellation Arctophylax, her into the Great Bear.'

৩. উক্ত *Classical Dictionary*-র ১৯৬ পৃষ্ঠায় আর্কাসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 'Eponym of Arcadia, son of Zeus and Callisto. Being left without a mother, he was reared by Maia. His grandfather Lycaon, to test the omniscience of Zeus, killed him and served up his flesh. The God over-threw the table, destroyed the house with a thunderbolt,

turned Lycaon into a wolf, and restored Arcas to life. Later, meeting Callisto in bear shape, Arcas pursued her into the precinct of Zeus on Mt. Lycaeon. Both thus incurred the death penalty when Zeus turned them respectively into the Great Bear and Arctophylax.'

৪. প্রিয়ম্বদা দেবীর ছোটদের অনেক রচনা সত্যঘটনার আশ্রয়ে লিখিত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'হাইদর' গল্পটির নাম আমরা করতে পারি। প্রিয়ম্বদার স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীব-জন্তু-প্রীতির কথা সুবিদিত ছিল। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরে বাসকালে নিজের বাড়িতে তিনি একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানাও তৈরি করেছিলেন। তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন। হাইদর ছিল তাঁর অতি প্রিয় একটি ঘোড়া। খয়রাগড় নেটিব স্টেটের রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে পুরস্কার-স্বরূপ কিভাবে তিনি এই 'কুলক্ষণযুক্ত' ঘোড়াটি পেলেন তার কৌতূহল-জাগানো বিবরণ ছোটদের মনের মতো ভাষায় প্রিয়ম্বদা গল্পটিতে বিবৃত করেছেন। প্রসন্নময়ী দেবীর *তারাচরিত* বইয়ের 'পাগড়ি ভাই' অধ্যায়েও এই ঘটনাটির বর্ণনা আছে। আমরা নীচে পুরো অধ্যায়টি তুলে দিলাম :

প্রথমে যখন তিনি খয়রাগড়ের রাজার মোকর্দ্দমায় সেখানে যাইয়া রাজাবাহাদুরের সহিত দেখা ও আলাপ করিলেন, তিনি ত বাবু সাহেবকে দেখিয়া তাঁহার কথাবার্তায় মুগ্ধ হইয়া পাগড়ী বদল করিয়া "পাগড়ী ভাই" সম্পর্ক পাতাইলেন, মোকর্দ্দমায় জয়লাভ হইলে রাজমাতা "পাগড়ী পুত্রে"র হস্তে সুবর্ণ বলয় ও কণ্ঠে স্বর্ণহার পরাইতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। যবনিকার অন্তরাল হইতে তিনি দেখিবেন এবং মহা-রাজকুমার পরাইয়া দিবেন, এই প্রস্তাব করা হইল। তারাদাস বড় অশ্বপ্রিয় ছিলেন ; তিনি রাজ-অশ্বশালে একটি তেজী সুন্দর অশ্ব অযত্নে রক্ষিত আছে দেখিয়াছিলেন এবং কাঞ্চনহার ও বলয়ের বিনিময়ে সেইটি চাহিয়া বসিলেন। রাজ বাটীতে এই অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনায় একটি হাসির রোল পড়িয়া গেল। দেওয়ান সাহেব আসিয়া গোপনে বন্ধুকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সেই অশ্ব অতিশয় দুষ্ট, কুলক্ষণযুক্ত, শ্বেতললাটে কৃষ্ণ টীকা। সেটি যদিও মূল্যবান তবুও নানারূপ উৎপাতের জন্য রাজমাতা তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে ব্যস্ত। অমনিও কেহ লইতে চাহে না, অমঙ্গলের মূর্ত্তিমান আকর। রাজজননী এমন অমঙ্গল যুক্ত অশ্ব পাগড়ী পুত্রকে দিতে অসম্মত হইলেন। তাহার পরিবর্ত্তে অন্য পয়মন্ত অশ্ব ক্রয় করিবার জন্য আশাতীত রজতমুদ্রা দিতে চাহিলেন এবং রাজা বাহাদুর, বাবুসাহেবকে আরো কিছুদিন রাজবাড়ীতে বসিয়া গান বাজনা করাইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া, দৈনিক উকীলের ফী সমানভাবে ব্যবস্থা করিতে দেওয়ান সাহেবকে আজ্ঞা দিলেন ! অকারণ বসিয়া বসিয়া রাজ-অর্থ গ্রহণে তিনি সম্মত হইলেন না এবং সেই অকল্যাণকর অশ্ব লইয়া রায়পুর ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুবান্ধবগণ অশ্ব দেখিয়া বাবুসাহেবের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত চিত্তে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

হাইদার (ঘোড়ার নাম) তখন মূর্ত্তিমান অমঙ্গলস্বরূপ, তাহার নিকট কোন লোক যাইলে সে পদাঘাত করিতে ও কামড়াইতে উদ্যত হইত। চীৎকারে অশ্বশালা সর্ব্বদা অশান্তিময় করিয়া তুলিত ; কিন্তু তারাদাস তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বাধ্য করিবার জন্য গুড় ও বুটি একত্রে বল্গায় বাধিয়া মুখে লাগাইয়া দিতেন, যখন তখন কাছে যাইয়া সাবধানে সুরস ফল খাওয়াইতেন এবং হঠাৎ পৃষ্ঠোপরি উঠিয়া বসিতেন। দিন কতক এই প্রকার করিতে করিতে প্রভুর প্রতি অশ্বের স্নেহ

সঞ্চার হইলে, তিনি রীতিমত তাহাতে আরোহণ করিয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অশ্বের সুঠাম সুন্দর গঠন দেখিয়া অনেক রাজপুরুষ বহুমূল্যে তাহাকে ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। ক্রমে "হাইদার" ছত্রিশগড়ের একটি খ্যাতনামা অশ্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়া, "ঘোড় দৌড়ে" যাইয়া পুনঃ পুনঃ জয়ী হইয়া পুরস্কার পাইতে লাগিল। কুকুর যেমন প্রভুভক্ত ও অনুগত হয়, সেই-রূপ "হাইদার" বাবুসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণে বেড়াইত, ডাকিলে গৃহমধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান থাকিত, তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ মাত্র অশ্বশাল হইতে বাহিরে আসিত ও তিনি গাত্রে হস্তার্পণ করিলে পরিতৃপ্তি বোধ করিত। রাজপুতের যেমন অশ্ব নিত্য সহচর, তাঁহারও সেই প্রকার ছিল। (পৃ. ১৯-২১)

দ্র. *তারাচরিত*। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। কলিকাতা। ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৩২৪ সাল। উৎসর্গ : কল্যাণীয়া—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী প্রাণাধিকাসু। প্রিয়, "তারাচরিত" তোমাকেই দিলাম। 'মা'। ১২ই অক্টোবর ১৯১৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১১৬। মূল্য : আট আনা।

পঞ্চম পর্ব

১. দ্র. পর্ব ৩, টীকা নং ১০, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩১। ওকাকুরার *The Ideals of the East*-এর আদর্শের প্রতিধ্বনি পাই প্রিয়ম্বদার এই চিঠিতে।

২. প্রমথলাল সেন (১৮৬৬-১৯৩০): কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁর অনুগামী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নেতা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বিলেত যাত্রা করেন (১৮৯৭-৯৯)। ১৯১০ সালে বার্লিন মহানগরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। এঁরই চেষ্টায় রোটেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতার ইংরাজি অনুবাদও করেছিলেন প্রমথলাল।

৩. ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় (১৮৪৭-১৯১১) তাঁর সহধর্মিণী অঘোরকামিনীর মৃত্যুর পর এই বইটি লেখেন। বইটির আখ্যাপত্র নিম্নরূপ : *অঘোর প্রকাশ*। (স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবনকাহিনী)। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বিবৃত। বাঁকিপুর। অঘোর পরিবার। ১৯০৭।

৪. শম্ভুর সঠিক কোনো পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। তবে প্রিয়ম্বদা যে এই বালককে বিশেষভাবে চিনতেন তার প্রমাণ পাই তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৩৪)। শম্ভুর এক বোনের আগুনে পুড়ে মারা যাবার ঘটনায় প্রিয়ম্বদা দেবী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন, সে কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে একটি চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন।

৫. দ্র. পর্ব ৩, টীকা ১২, বর্তমান সংকলনের পৃ. ২৩১।

৬. *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় ১৮৩৩ শকাব্দে 'বিজয়া' ও 'চরিতার্থ' নামে প্রিয়ম্বদার দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাদুটির কোনো একটির কথাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বলছেন।

৭. মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯): রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা; প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯): রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, রথীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী।

৮. নির্ম্মলাদিদি : চিঠিপত্রে 'মিসেস্ সোম' হিসেবেও অভিহিত। প্রতিমা দেবীর জন্য এঁর কন্যাকেই গৃহশিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিযুক্ত করার কথা চলছিল।

৯. বেলা : মাধুরীলতা দেবী (১৮৮৬-১৯১৮): রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

১০. রথী : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১), রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; শরৎ : শরৎকুমার চক্রবর্তী (১৮৭০-১৯৪২), মাধুরীলতার স্বামী।

১১. মিস্ সোম : নির্মলা সোম-এর কন্যা।

১২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩) : *দাসী, প্রদীপ, Modern Review, প্রবাসী* প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক।

১৩. 'তারার শরীর এখন কেমন আছে আমাকে লিখো'—প্রিয়ম্বদার একমাত্র সন্তান তারাকুমার বারাণসীতে অ্যানি বেসান্টের স্কুলে পাঠরত অবস্থায় মাত্র ১২ বছর বয়সে ১৯০৬ সালে ওলাওঠায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। *এক্ষণ* পত্রিকার শারদীয় ১৪০০ সংখ্যায় প্রকাশিত ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'জীবনকথা'য় তারাকুমারের মৃত্যুর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তারাকুমারের মৃত্যুর পর ১৯০৭ সালে *তারা* নামে প্রিয়ম্বদার একটি শোককাব্য প্রকাশিত হয় (দ্র. বর্তমান সংকলনের পরিশিষ্ট 'ক', পৃষ্ঠা ২৪৩)। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে যে তারার উল্লেখ করেছেন এর সঠিক পরিচয় জানা যাচ্ছে না, খুব সম্ভব এই ব্যক্তি প্রিয়ম্বদার পুত্র তারাকুমার নয়। প্রিয়ম্বদার জীবনের একমাত্র অবলম্বন তারাকুমার ৫/৬ বছর আগেই মারা গিয়েছে—রবীন্দ্রনাথ তা কি জানতেন না ! প্রিয়ম্বদা যে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় জীবন অতিবাহিত করছেন রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তা জানতেন, কারণ তাঁর সেই সময়ের অনেক চিঠিতেই তার স্পষ্ট আভাস আছে।

১৪. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ-প্রিয়ম্বদা পত্রাবলীর মধ্যে গাজিপুর থেকে লেখা কোনো চিঠির হদিশ পাওয়া যায়নি।

১৫. *প্রবাসী* পত্রিকার মাঘ ১৩১৮ সংখ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুদ্রারাক্ষস' ছদ্মনামে *ডাকঘর* নাটকটির একটি সমালোচনা লেখেন।

১৬. দ্র. সৌদামিনী দেবী : 'পিতৃস্মৃতি', *প্রবাসী*, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩১৮ এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯।

১৭. দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' *ভারতী* পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮. দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি', *প্রবাসী*, মাঘ ১৩১৮।

১৯. দ্র. পর্ব ২, টীকা ১, বর্তমান সংকলনের পৃ. ২২৭।

২০. দ্র. পর্ব ৩, টীকা ১, বর্তমান সংকলনের পৃ. ২২৮।

২১. প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯) : *আয্যাবর্ত, অশোকা, বনলতা, পূর্ব্বস্মৃতি, তারাচরিত* প্রভৃতি কবিতা ও গদ্যগ্রন্থের রচয়িত্রী, প্রিয়ম্বদা দেবীর মা, স্বনামখ্যাত আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, কুমুদনাথ চৌধুরী—এঁরা সকলেই ছিলেন প্রসন্নময়ীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বাংলা সাহিত্যে প্রসন্নময়ী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। আমরা অনুমান করতে পারি যে সহজাত প্রতিভা ছাড়াও প্রিয়ম্বদার সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশের পেছনে প্রসন্নময়ীর প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

২২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পুত্র সুরেন্দ্রনাথের (১৮৭২-১৯৪০) বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল ওকাকুরা কাকুজো, ভগিনী নিবেদিতা, ব্যারিস্টার পি. মিত্রের মতন মানুষদের সংস্পর্শে এসে। ১৯০২ সালে ওকাকুরা প্রথমবার ভারতবর্ষে এলে তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় হয় নিবেদিতা-আয়োজিত একটি আসরে। 'We were invited to meet the guest of honour, Okakura Kakuzo, of the elite of Japan

... লিখেছেন সুরেন্দ্রনাথ, ওকাকুরা সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণে (দ্র. *Visva-Bharati Quarterly,* Vol. XI Part II August, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৬)। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই ওকাকুরা সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'তা, তুমি তোমার দেশের জন্য কি করবে বলে ভাবছ ?' তারপর ক্রমে ক্রমে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, শিল্প-রসিক মানুষটির সঙ্গে এক নিবিড় বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৯০২ সালে ওকাকুরা যখন ভারতবর্ষের শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য পরিদর্শনে বুদ্ধগয়া, নালন্দা, মাউন্ট আবু ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তিনি। ওকাকুরার রসবোধের এক কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত স্মৃতিকথায়। 'In Bombay Okakura caught sight of a Japanese steamer moored alongside one of the dock wharves. This roused in him a longing to give me a taste of *sake*, which for the Japanese has all kinds of associations and ceremonial uses, apart from its merits as a drink, and also to lay in a stock for himself. What if the stuff was not allowed to be brought off the ship? It would have to be smuggled out! Okakura made me put on an overcoat with large pockets, his *Kimono* being equal to any great coat in that respect.' 'জীবনকথা', দ্বিতীয় পর্বে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ওকাকুরা এবং সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন : 'আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথকে তিনি খুব ভালোবাসতেন, ১৯ নং স্টোর রোডেও কিছুদিন ছিলেন !' (দ্র. *এক্ষণ,* শারদীয় সংখ্যা, ১৪০০, পৃ. ১১১)। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *জোড়াসাঁকোর ধারে* গ্রন্থে ওকাকুরা ও সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের কথা লিখেছেন।

বর্তমান সংকলনের অন্তর্গত প্রিয়ম্বদা-ওকাকুরার পত্রাবলী সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার এই বন্ধুত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

২৩. দ্র. 'আশাতীত', *পত্রলেখা*। এটি এবং নিজের আরো কিছু কবিতার ইংরেজি ভাবানুবাদ করে ওকাকুরাকে পাঠিয়েছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী।

২৪. মূল বাংলা কবিতাটির সন্ধান আমরা পাইনি।

২৫. দ্র. 'দুর্ব্বোধ', *পত্রলেখা*।

২৬. দ্র. 'ভাগ্যহীন', *পত্রলেখা*।

২৭. দ্র. 'বসন্ত বায়ু', *পত্রলেখা*।

২৮. দ্র. 'অশেষ', *পত্রলেখা*।

২৯. দ্র. 'অকৃতজ্ঞ', *অংশু*।

৩০, ৩১, ৩২. এই কবিতাগুলির মূল বাংলা পাঠের সন্ধান আমরা পাইনি।

৩৩. দ্র. ওকাকুরার চিঠি, পত্র ৯, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৮১।

৩৪. ঐ। এছাড়া, দ্র. পঞ্চম পর্ব, টীকা ৮৩।

৩৫. এখানে 'Your friend' বলতে প্রিয়ম্বদা সম্ভবত জে. বি. গিলডার-এর কথা বলছেন, যাঁর উল্লেখ পাই ওকাকুরার ৯ নম্বর চিঠিতে।

৩৬. এখানে সম্ভবত কিছু ভাষাগত অসংগতি থেকে গেছে। প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রথম কবিতার বই *রেণু* প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। ১৯০৬ সালে একমাত্র পুত্র তারাকুমারের মৃত্যুর পর ১৯০৭-এ প্রিয়ম্বদার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *তারা* প্রকাশিত হয়, যদিও এই বইয়ের আখ্যাপত্রে প্রিয়ম্বদা দেবীর কোনো নাম ছিল না। ১৯১১ সালে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *পত্রলেখা* প্রকাশিত হয়। চিঠির বয়ান থেকে মনে হয় যে *পত্রলেখাকেই* তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করছেন।

৩৭. *The White Fox* বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ওকাকুরার পত্র ৬ এবং ঐ সংক্রান্ত টীকা ৮০।
৩৮. দ্র. 'স্বপ্ন প্রয়াণ', *অংশু*।
৩৯. এই অংশটি কোনো বাংলা কবিতার ভাবানুবাদ কিনা বলা যাচ্ছে না।
৪০. 'সুখমৃত্যু', *অংশু*। উল্লেখ্য, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র ১৮৩৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় Goldsworthy Lowes Dickinson -এর 'Euthanasia' নামে একটি লেখার প্রিয়ম্বদা দেবী-কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ পায়।
৪১. 'চিরগত', *অংশু*।
৪২. 'প্রত্যাখ্যান', *অংশু*।
৪৩. দ্র. ওকাকুরার চিঠি, পত্রসংখ্যা ২, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৭৩।
৪৪. দ্র. ওকাকুরার চিঠি, পত্রসংখ্যা ১১, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৮৪।
৪৫. দ্র. ওকাকুরার চিঠি, পত্রসংখ্যা ১০, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৮৩।
৪৬. 'স্বপ্ন শিশু', *অংশু*।
৪৭, ৪৮. মূল বাংলা কবিতাদুটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।
৪৯. গোল্ডস্‌ওয়ার্দি লোয়েস ডিকিন্‌সন (Goldsworthy Lowes Dickinson), ১৮৬২-১৯৩২ : কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজ এবং লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক। চীন ভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত *Letters of John Chainaman* বইয়ের লেখক। *বঙ্গদর্শন* পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'চীনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধে এই বইটি বিষয়ে আলোচনা করেন (আষাঢ় ১৩০৯)। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বইয়ের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ করেন এবং তা *ভারতী* পত্রিকার আষাঢ় ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। ১৯২২ সালে ইংল্যাণ্ডে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। *পথের সঞ্চয়*-এর 'ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ' অধ্যায়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯১৩ সালে ডিকিন্‌সনের কলকাতা ও শান্তিনিকেতন আগমনের সময়ে সম্ভবত প্রিয়ম্বদা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯১৩-তে ডিকিন্‌সন জাপানেও গিয়েছিলেন (দ্র. ওকাকুরার চিঠি, পত্রসংখ্যা ১৬, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১, এই পর্বে টীকা ৪০)।
৫০. মূল বাংলা কবিতাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।
৫১. দ্র. ওকাকুরার চিঠি, পত্রসংখ্যা ১৩, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৮৬। এদেশে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের সঙ্গে, বিশেষত নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রিটিশ সরকার ওকাকুরার চিঠিপত্রের ওপর কড়া নজর রেখেছিল, এটা আমরা অনুমান করতে পারি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর 'জীবনকথা'য় 'স্বদেশী ও ওকাকুরা' শীর্ষক বর্জিত অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন।
৫২. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) : ১৯০২ সালে প্রথমবার ভারত আগমনের পর ওকাকুরা শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। ওকাকুরার মাধ্যমেই জাপানী শিল্পী টাইক্কান-এর সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের আলাপ হয় এবং তিনি কিছুদিন তাঁর কাছে জাপানী চিত্রকলা বিষয়ে কাজ শেখেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলন-কেন্দ্রিক নানা ধরনের কর্মোদ্যোগের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন গগনেন্দ্রনাথ। ১৯১২-তে ওকাকুরা দ্বিতীয়বার যখন ভারতে আসেন তখন বস্টন সংগ্রহশালার ওরিয়েন্টাল আর্ট বিভাগের জন্য প্রাচ্য (বিশেষ করে ভারতীয়) শিল্প-নমুনা সংগ্রহের দায়িত্ব তিনি গগনেন্দ্রনাথকেই দিয়ে যান।
৫৩. ওকাকুরার মৎস্যজীবী বন্ধু সুজুকি শোবেই (Suzuki Shobei) ছোট্ট বন্দর হিরাকাতা'র

বাসিন্দা ছিলেন। ওকাকুরার মৎস্য শিকারের সদা সঙ্গী ছিলেন তিনি। (দ্র. ওকাকুরার চিঠি, পত্রসংখ্যা ১৩, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৮৬)।

৫৪. ফাল্গুন ১৩২৪-এর *সন্দেশ* পত্রিকায়, প্রিয়ম্বদা দেবীর একটি রচনা প্রকাশিত হয়—'এণা, পোষা হরিণীর গল্প'।

৫৫. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)।

৫৬. প্রিয়ম্বদার মামা সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরী।

৫৭. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও সংজ্ঞা দেবী।

৫৮. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)।

৫৯. সম্ভবত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), 'ভারতী' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। এঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয় মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৬০. সম্ভবত বইটি ওকাকুরা শেষ করে যেতে পারেননি।

৬১. বস্টন থেকে ১৯০৬ সালে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয় (সচিত্র, প্রকাশক: Houghton, Miffin and Co.)। লেখিকার নাম এলিজাবেথ বিজল্যাণ্ড (Elizabeth Bisland)। বইটির নাম *The Life and Letters of Lafcadio Hearn*। এই বইটি বিষয়ে *The New York Times Saturday Review of Books*-এ অপ্রিয় সমালোচনা করেন James Hune Ker। কুৎসাপূর্ণ এই প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তর হিসেবে ওকাকুরা টোকিও থেকে অক্টোবর ১৯০৬-তে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিটি ৩ নভেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যার *New York Times Saturday Review of Books*-এ 'In Defence of Lafcadio Hearn : Mr Okakura Kakuzo Gives us an Authoritative Japanese Opinion of the Self-Exiled American Writer' নামে প্রকাশিত হয়।

লাফকেডিও হার্ন (১৮৫০-১৯০৬) ছিলেন প্রাবন্ধিক, সমালোচক। তিনি গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুড়ি বছর বয়সে আমেরিকায় যান এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জাপান-বিষয়ে প্রথম থেকেই তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, সেই আগ্রহের ফলশ্রুতি হিসেবেই ১৮৯০-তে প্রথমবার জাপানে আসেন। সেই সময়ে মাৎসুয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন হার্ন এবং জাপানী মেয়ে কিয়োজুমি সেতসুকে বিয়ে করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং কোইজুমি ইয়াকুমো—এই জাপানী নামটি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কুমামোতো দাইগো উচ্চ বিদ্যালয় এবং টোকিও ইম্পিরীয়ল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। তাঁর লেখা *Glimpes of Unfamiliar Japan* এবং *In Ghostly Japan* বইয়ে বহির্বিশ্বের কাছে জাপানের এক উজ্জ্বল ছবি তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি Fenollosa এবং ওকাকুরার বন্ধু ছিলেন। ওকাকুরার কাছ থেকে তিনি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। *In Ghostly Japan* বইয়ে ওকাকুরা বিষয়ে তাঁর লেখা একটি নিবন্ধও আছে।

৬২. কলকাতায় ১৯নং স্টোর রোডে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি।

৬৩. দ্র. ওকাকুরাকে লেখা প্রিয়ম্বদার চিঠি, পত্রসংখ্যা ৮, এবং এই পর্বে টীকা নং ৫১ ও ৫২, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ১৫৭, ২৩৭।

৬৪. দ্র. 'গৃহ হারা', *অংশু*।

৬৫, ৬৬, ৬৭. প্রকাশিত কোনো কাব্য-সংকলনে কবিতাগুলো পাওয়া যায়নি।

৬৮. 'কথা কও', *অংশু*।

৬৯. ১৯১১-তে চীনে প্রথম 'বিপ্লবে'র সূচনা হয়। এই সময়ে সান ইয়াৎসেনের অভ্যুদয় ঘটে এবং মাঞ্চু রাজবংশ অপসৃত হয়।

৭০. 'উদ্বোধন', অংশু।

৭১. আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথনাথ চৌধুরী, মন্মথনাথ চৌধুরী এবং সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরী ঠাকুর পরিবারে বিবাহ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রিয়ম্বদার মামীমা ইন্দিরা দেবীর ভাই, তাঁরা (প্রিয়ম্বদা ও সুরেন্দ্রনাথ) বৈবাহিক সূত্রেই আত্মীয়তাবদ্ধ ছিলেন, রক্তের সম্বন্ধে নন।

৭২. অসকার ওয়াইল্ড : আইরিশ কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক। *The Picture of Dorian Gray, Importance of Being Ernest, The Happy Prince* ইত্যাদির রচয়িতা ওয়াইল্ড (১৮৫৫-১৯০০) ছিলেন উনিশ শতক-শেষের এইসথেটিক মুভমেন্টের (aesthetic movement) এক প্রধান শিল্পী। সৌন্দর্যের উপাসক এই লেখক নিজের লেখায় এবং জীবনযাপনে অনুভূতির তীব্রতা ও বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। ওয়াইল্ডের এই প্রয়াস সব সময় সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। ফলে ১৮৯৫ সালে তিনি লর্ড অ্যালফ্রেড ডগলাসের সঙ্গে সমকামিতার অভিযোগে দু'বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর কারাবাসের ফসল *Ballad of Reading Gaol* এবং *De Profundis*। বাইবেলের লাতিন সংস্করণের ১৩০ নম্বর গীতমালার প্রথম দুটি শব্দ 'de profundis', যার অর্থ 'হৃদয়ের গভীর থেকে'। ওয়াইল্ডের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত ঘৃণা, যন্ত্রণা আর অপমান প্রকাশ পেয়েছে কারাগার থেকে ডগলাসকে লেখা এই সুদীর্ঘ পত্রে। *De Profundis* প্রকাশিত হয় অসকার ওয়াইল্ডের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর, ১৯০৫ সালে।

De Profundis-এর লেখকের প্রতি প্রিয়ম্বদা দেবী যে এতখানি সমব্যথা অনুভব করছেন তা হয়তো কিছুটা তাঁর নিজের অবস্থানের কারণেও। মনে রাখতে হবে ওকাকুরার কাছে তিনি সঙ্গোপনে যে আবেগ প্রকাশ করছেন, প্রিয়ম্বদার সমাজেও সেই আবেগের প্রকাশ সহজ স্বীকৃতি পেতো না।

৭৩. চীনদেশে তাওবাদের প্রচলন হয় খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, কিংবা তারও আগে। তাওবাদের প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ *তাও-তে-চিং*-এর লেখক বলে যাঁকে মনে করা হয়, সেই লাও-ৎসু খুব সম্ভব এই সময়েরই মানুষ ছিলেন। লাও-ৎসু'র সমসাময়িক ছিলেন কনফুসিয়াস, যাঁর মতাদর্শের প্রভাবও চীনদেশে ব্যাপকভাবে পড়েছিল। কনফুসিয়াস ও লাও-ৎসু এক অর্থে হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, অন্য অর্থে তাঁরা একে অপরের পরিপূরকও ছিলেন। কারণ, কনফুসীয় চিন্তাধারার বিষয়বস্তু যদি হয় মানুষের সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সংগঠন, তাহলে তাওবাদের অর্থ আত্মিক সংগঠন, সঠিক পথ (তাও) এর অনুসন্ধান ও অনুসরণ। চীনদেশের অপর গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাওবাদের সংমিশ্রণ ঘটে পরবর্তীকালে এবং খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে এই সংমিশ্রিত তাওবাদের প্রভাব জাপানেও এসে পড়ে। দৃশ্যগত সত্যের আড়ালে এক ধ্রুবসত্য লুকিয়ে থাকে, তারই উৎসে পৌঁছনর পথ খুঁজে চলেন তাওবাদীরা তাঁদের যোগ এবং আচার-রীতির মধ্য দিয়ে। এই আচার-রীতিতে মহামূল্যবান জেড পাথরের নানা ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাওবাদীদের প্রধান পূজ্য দেবতা 'জেড সম্রাট'। ওকাকুরা তাঁর *প্রাচ্যের আদর্শ* গ্রন্থে লিখেছেন : 'লাওৎজে, সোসি অথবা তাঁদের প্রকৃত উত্তর সাধক আলাপচারী সম্প্রদায়, যাঁরা সেই নৈর্ব্যক্তিক ও পরম পবিত্র সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আনন্দ পেতেন এবং কথা বলার সময় জেড-এর হাতলওয়ালা চামর দোলাতেন...' (সুধা বসু-কৃত অনুবাদ, কলকাতা : কল্পন, ১৯৯৫)।

লাও-ৎসুর পরবর্তী সময়ে যখন অন্য অনেক ধর্ম, বিশ্বাস, পন্থার সঙ্গে তাওবাদের সংমিশ্রণ ঘটতে শুরু করে, তখন তাওবাদীরা অমরত্বের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে ওঠেন, এবং এক সময় তাঁরা যাদুবিদ্যার চর্চায়ও লিপ্ত হন।

তাওবাদের অনুষঙ্গ ওকাকুরার নানা রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে। প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর কাছে সেই মহামূল্যবান জেড-পুষ্প যার ঘ্রাণে তিনি অমরত্ব লাভ করবেন। উল্লেখ্য চীনদেশে জেড পাথরটিকে পাঁচটি চারিত্রিক গুণের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়— দানশীলতা, নম্রতা, সাহসিকতা, সুবিচার এবং প্রজ্ঞা।

৭৪. দ্র. প্রিয়ম্বদা দেবীর 'চা-গ্রন্থ' নামক প্রবন্ধ এবং তৃতীয় পর্ব, টীকা ৯, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ৮৮, ২৩০।

৭৫. সম্ভবত ওকাকুরার তৎকালীন সেক্রেটারি মিস ডিকিনসন, যিনি *The White Fox* অপেরাটি টাইপ করে দিয়েছিলেন।

৭৬. ওকাকুরা এখানে, এবং পরবর্তী চিঠিতেও (পত্র ৬), রবীন্দ্রনাথকে প্রিয়ম্বদার 'uncle' বলে ভুল করেছেন। তিনি হয়তো তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কটি ঠিক ধরতে পারেননি। প্রিয়ম্বদার ১৩ নম্বর চিঠিতে দেখি তিনি ওকাকুরাকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

৭৭. পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে, চিকিৎসার্থে ইংল্যান্ড হয়ে আমেরিকায় আসেন ১৯১২ সালে। আমেরিকায় তাঁরা নানা স্থানে যান, নিউ ইয়র্ক, রচেস্টার, শিকাগো, বস্টন ইত্যাদি। এই সফরটি যে রবীন্দ্রনাথের ঠিক মন-মতো হয়নি তা আমরা জানতে পারি প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখা ওকাকুরার পরবর্তী চিঠি থেকে। বস্টনে থাকাকালীন অবশ্য তাঁর ওকাকুরার সঙ্গে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্র. Stephen N. Hay, *Asian Ideas of East and West* (Harvard University Press, 1970)।

৭৮. ফরাসী সুরকার ও ভায়োলিনবাদক শার্ল এম. লোয়েফলার (Charles M. Loeffler), ১৮৬১-১৯৩৫: ফ্রান্সের Alsace Lrraine প্রদেশের অধিবাসী। ওকাকুরার লেখা তিন অঙ্কের অপেরা *The White Fox* (১৯১৩) -এর সুরকার ছিলেন তিনি। (দ্র. Okakura Kakuzo : *Collected English Writings.* Vol. I. Tokyo Heibonsha, 1984).

৭৯. এই দুই শিল্পীর পরিচয় জানা যায়নি। সম্ভবত এঁদেরই একজনের জন্য ওকাকুরা একজন বাঙালি পাত্রীর সন্ধান করছিলেন।

৮০. ওকাকুরার *The White Fox* গীতিনাটকটি জাপানের বহুলপ্রচলিত 'শিনোদা অরণ্যের শৃগাল'-এর লোককাহিনী অবলম্বনে রচিত। জাপানের লোককথায় শৃগালের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, এই প্রাণীটি নানা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী, এমনকি মানুষের রূপও ধারণ করতে পারে। তেমনি এক শৃগাল এই গীতিনাটকের মুখ্য চরিত্র। 'In the absence of a wife, the fox takes her form and lives happily with the husband until the return of the true partner forces the pretended wife to leave in sorrow.' (Okakura Kakuzo. *Collected English Writings*, Vol. 1, Tokyo : Heibonsha, 1984, p. 329)।

এই অপেরার রচনাকাল এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর সঙ্গে পত্রবিনিময়ের সময় দুটি একই, তাই প্রিয়ম্বদা-ওকাকুরার চিঠিতে যেমন *The White Fox*-এর প্রসঙ্গ বার বার ফিরে এসেছে, তেমনি এই অপেরাতেও প্রিয়ম্বদার উপস্থিতি স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। শুধুমাত্র প্রিয়ম্বদার পদ্যাংশ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই নয়, এই অপেরার বিষণ্ণতায় যেন প্রিয়ম্বদার বিষাদ এসে ছায়া ফেলেছে। দুঃখিনী 'কোল্‌হ্'-র নাম নিয়ে ওকাকুরা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, বাঙালি শ্রুতিতে এই নামটি মধুর শোনাবে তো ? ওকাকুরার পত্র ১০-এর উত্তরে প্রিয়ম্বদা বলেছিলেন, 'শুক্লা রাখলে কেমন হয় ? শুক্লার অর্থ শ্বেত-

শুভ্র'। (প্রিয়ম্বদার পত্র ৬)। ১৯১২ সালে ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাবার সময় থেকেই এই শ্বেত শুভ্র মূর্তি ওকাকুরার মনে গেঁথে গিয়েছিল : I like to imagine you in your garden ... the flowers scattering all over your white robe ...' (ওকাকুরার পত্র ৮)।

বস্টনে থাকাকালীন, ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *The White Fox* গীতিনাটকটি রচিত হয়, এবং মার্চের ২ তারিখ ওকাকুরা তাঁর এই রচনাটি উৎসর্গ করেন বস্টনের শিল্প জগতের অধিষ্ঠাত্রী মিসেস ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনারকে। ঠিক কেন যে এই অপেরাটি লিখেছিলেন ওকাকুরা তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে, তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। অন্য কারো কোনো রচনা তাঁকে এই অপেরা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল কি?

১৯৭৯ সালে নিপ্পন বিজুৎসু-ইনে সংরক্ষিত ওকাকুরার সামগ্রীর মধ্য থেকে একটি চটি বই উদ্ধার করে হাইবনশা পাবলিশার্স। দেখা যায় সেটি একটি অপেরার খসড়া রচনা। তিন অঙ্কের এই গীতিনাটকের নাম ছিল *The Sacrifice*, ১৯১১ সালে রচিত, নাট্যকার এবং সুরকার আমেরিকার ফ্রেডেরিক এস. কনভার্স (১৮৭১-১৯৪০)। যদিও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে ওকাকুরা এই অপেরাটিকে ভিত্তি করেই তাঁর অপেরাটি লিখেছিলেন, তবু দুটি রচনার সাদৃশ্যও অস্বীকার করা যায় না।

The White Fox মঞ্চস্থ অবস্থায় দেখে যেতে পারেননি ওকাকুরা, তবে তাঁর মৃত্যুর পর ২৭ অক্টোবর ১৯১৩-তে মিসেস গার্ডনারের ফেনওয়ে কোর্টের বাসস্থানে এই অপেরার অংশবিশেষ অভিনয় করা হয়। ১৯২২ সালে *Complete Works of Tensin* (Nippon Bijutsu-in)-এ *The White Fox*-এর প্রথম প্রকাশ ঘটে, পরে ১৯২৩ সালের ২১ জানুয়ারি আমেরিকার *Sunday Herald* পত্রিকায় অপেরাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে *Sunday Herald* লেখে, 'Drama by Kakuzo comes back to Hub—"White Fox" written by the Late Japanese Savant for Mrs. Gardner.' (Yasuko Horioka, *The Life of Kakuzo*. The Hokuscido Press, 1963, p. 89)।

৮১. দ্র. টীকা ৫৬, পর্ব ৫। এছাড়া দ্র. ওকাকুরাকে লেখা প্রিয়ম্বদার চিঠি, পত্রসংখ্যা ৯, বর্তমান সংকলনের পৃ. ১৬০।
৮২. প্রিয়ম্বদার পোষা হরিণ 'এনা'। দ্র. ওকাকুরাকে লেখা প্রিয়ম্বদার চিঠি, পত্রসংখ্যা ৮ এবং পঞ্চম পর্ব টীকা ৫৪।
৮৩. দ্র. পঞ্চম পর্ব, টীকা ৩৪ ; ওকাকুরাকে লেখা প্রিয়ম্বদার চিঠি, পত্রসংখ্যা ৫, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ২৩৬, ১৪৫।
৮৪. দ্র. পঞ্চম পর্ব, টীকা ৩৫, বর্তমান সংকলণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৬।
৮৫. প্রিয়ম্বদার এই ফরাসী বন্ধুর পরিচয় জানা যায়নি।
৮৬. ওকাকুরার পিতা কান-ইমন, মাতা কানো, সহোদর ভাই ইয়োশিসাবুরো, সহোদরা বোন চো, স্ত্রী মোতোকা, পুত্র কাজুয়ো, কন্যা কোমাকো, পৌত্র কোশিরো।
৮৭. ওকাকুরার ছোট ভাই Okakura Yoshisaburo-লিখিত *The Japanese Spirit* বইটি লন্ডন থেকে ১৯০৫-এ প্রকাশিত হয়।
৮৮. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।
৮৯. দ্র. ওকাকুরাকে লেখা প্রিয়ম্বদার চিঠি, পত্রসংখ্যা ৮, এবং পঞ্চম পর্ব, টীকা ৫৩, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ১৫৬, ২৩৭।
৯০. কিডনির একধরনের প্রদাহ। এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে শেষ পর্যন্ত ওকাকুরা মারা যান।

৯১. কানন, অথবা কাওয়ানন। অবলোকিতেশ্বর। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার পনেরো শতাব্দী পরে এই অবলোকিতেশ্বরকে নারীমূর্তিরূপে পুজো করার প্রচলন দেখা দেয় জাপানে। *প্রাচ্যের আদর্শ* গ্রন্থে জাপানী শিল্পী কানো হোগাই-কৃত কানন দেবীমূর্তির একটি চিত্রের বর্ণনা করেছেন ওকাকুরা এই ভাষায় : 'মধ্যগগনে তিনি দাঁড়ান ; তাঁর ত্রিস্তরবদ্ধ শিরশ্চক্র আকাশের সোনালী উজ্জ্বল আলোর আড়ালে অন্তর্হিত। তাঁর হাতে একটি স্ফটিক পাত্র। সেই পাত্রটি থেকে বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়ছে সৃষ্টি-বারি। আর সেই এক এক বিন্দু জল থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এক একটি মানব শিশু। শিশুদের দেহ জ্যোতিশ্চক্রের মত জন্মকালীন পরিচ্ছদে আবৃত! তাদের চেতনাহীন দুটি চোখ তুলে ধরেছে দেবীর দিকে ...' (সুধা বসু-কৃত অনুবাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭)।

৯২. দ্র. পঞ্চম পর্ব, টীকা ৪৯, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৭।

৯৩. সুরেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যারা যথাক্রমে :
(১) সুবীরেন্দ্র (জন্ম ১৯০৫) (২) মঞ্জুশ্রী (জন্ম ১৯০৭) (৩) জয়শ্রী (জন্ম ১৯০৮) (৪) প্রবীরেন্দ্র (জন্ম ১৯০৯) (৫) মিহিরেন্দ্র (জন্ম ১৯১৩) (৬) সূনৃতেন্দ্র (জন্ম ১৯১৮)।

৯৪. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রিয়ম্বদার নোটবইটি কখনও যে ছাপা হবে সেরকম কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল না—একান্তই অন্তরঙ্গ এই বয়ানে সে-কারণেই নানারকম ভাষাগত অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়— সেই সবকিছুকেই অটুট রেখে এটি এই সংকলনে পুনর্মুদ্রিত হল।

পরিশিষ্ট ‘ক’

তারাকুমার

প্রিয়ম্বদা দেবীর একমাত্র সন্তান তারাকুমার ১৯০৬ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই অকালমৃত বালকের স্মৃতিতে হেমচন্দ্র সরকার *মুকুল* পত্রিকায় (দ্বাদশ খণ্ড, দশম সংখ্য, মাঘ ১৩১৩) লেখেন : ‘... একাদশ বৎসরের একটী বালক, গত জুলাই মাসে অকালে কীটদষ্ট মুকুলের ন্যায় মায়ের ক্রোড় হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। ... সে বাঙ্গলা, ইংরাজী, লাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং সংস্কৃত ভাষা অনায়াসে পাঠ করিত। তাহার ভাষা শিক্ষার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। যাহা একবার শুনিত, তাহা কখনও ভুলিত না। ... আমরা তাহাকে সেই “তপোবনের হরিণ শিশু” বলিতাম, ...। তাহার মাতা তাহাকে তপোবনের “সিংহ শাবক” বলিতেন।’

এই আদরের ধন হারিয়ে প্রিয়ম্বদা শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর ‘জীবনকথা’, দ্বিতীয় পর্বে লিখেছেন, ‘প্রিয় [কাশী থেকে] ফিরে এসে শুধু এই কথাটি বল্লে যে— “লোকে ছেলের মরা মুখ দেখ, বলে গালি দেয়, কিন্তু আমি তাও দেখতে পেলুম না”।’ (*এক্ষণ*, শারদীয় ১৪০০, পৃ ২৯)

প্রিয়ম্বদার সেই গভীর ব্যথার প্রকাশ ঘটেছে তারাকুমারকে লক্ষ্য করে রচিত এই কাব্যগ্রন্থে।

তারা

ক্ব নু মাং তদ্বধীন জীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্ন সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষত সেতু বন্ধনো
জল সংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ
১৩১৪

কুন্তলীন প্রেস।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

আমার সর্ব্বস্ব তুমি, তোমা ভিন্ন কিবা আমি,
কি অস্তিত্ব মোর ?
ব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত আজি, শুধু, প্রাণে বেঁচে আছি
পথ চাহি তোর।
শোকভরা হাহাকার অশ্রুধারা অনিবার
এ পত্র লিখনে,
এ উৎসর্গ যদি তোরে— পরশে, ব্যথিত করে,
ত্বরায় মিলনে
কাছে ডাকি লও আশে, পাঠাইনু স্বর্গোদ্দেশে
বিলাপ রোদনে।

তারা

* * *

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর,
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে,
পরাণ পীরিত লাগি থির নাহি বাঁধে।"

(১)

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে দুর্ব্বিসহ অনন্ত গভীর অনিশ্চিত অন্ধকার, তাহা অতিক্রম করিয়া হতভাগ্য আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে অমর-তোমার সুগঠিত দিব্যকান্তি প্রতিভাদীপ্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি প্রতিভাত হইতেছে না জন্য শোকাশ্রুতে নয়ন একেবারে দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি-অণু-পরমাণুতে যে তুমি বিদ্যমান, সেই আরাধ্য তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া বিশ্বসংসারে দাঁড়াইবার শক্তিহীনতায় চিরদিনের মতন যেন নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি। যেন এই অসীম জগতে বান্ধবশূন্য গৃহহীন ভ্রান্ত পথিকদ্বয়, জীবন সাহারার দুঃখের তপ্ত বালুকায় ভ্রমণ করিয়া করিয়া পরিশ্রান্ত ; ক্ষণকালের নিমিত্ত দাঁড়াইবার পান্থশালা পর্য্যন্ত নাই ; একের অভাবে এখন সবই অচল।

দিনের আলোকে, কার্য্যক্ষেত্রের কোলাহলে, জীব-জগতের চাঞ্চল্যে, এবং প্রকৃতির মুখরিত সজীবতায়, তোমার ব্যবধানে হৃদয় আরো কাতর, পার্থিব হস্তে তোমাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি না। চঞ্চল ক্রীড়াশীল তোমার বালসৌন্দর্য্য চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিবিম্বে শতসহস্র হইয়া যায়, কেবল শোকসন্তপ্ত আমাদেরই চক্ষের সম্মুখে স্থির ভাব ধারণ করে না। জীবনে আর সুপ্রভাত নাই, সবই গাঢ়তর রাত্রি, চির-অমাবস্যা ! রজনীর এই সূচিভেদ্য জমাট অন্ধকারে কেবল তোমাকেই ধ্যান করি, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতে করিতে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যাই। তোমার স্বরূপ জীবনপ্রদ, কল্পনাস্পর্শ দগ্ধপ্রাণ শীতল-কর, সুকুমার অঙ্গের সৌরভ ঘ্রাণে প্রতি অঙ্গে প্রাণ বায়ু বহিতে থাকে ; অনুভব মোহে এমন করিয়া আর কত দিন, কত রাত্রি, পরলোকের পথে এইরূপ শ্রান্ত পথিক আমরা বসিয়া বসিয়া দিন গণিব ? যাইবার পথ খুঁজিয়া যে পাই না। যে দিন আবার দয়া করিয়া কাছে ডাকিয়া লইবে সেই দিন এই শোকজ্বালা, এই নিরন্তর রোদনধ্বনি, পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতপদে তোমার স্নেহাশ্রয়ে সম্মিলিত হইব। স্বর্গে

ও মর্ত্ত্যে যে বিচ্ছেদ তাহা তিরোহিত করিয়া নিকটে ডাকিয়া লও, তোমার কাছে এখন এই মাত্র প্রার্থনা।

* * *

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল,
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল,
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে,
লছমি চাহিতে দরিদ্র বেড়ল মাণিক হারানু হেলে।"

(২)

জীবন মরুভূমি স্নেহনীরে সিক্ত করিয়া তোমার জন্য প্রীতির যে অপূর্ব্ব সৌধ রচনা করিয়াছিলাম, কত যত্নে, কত আদরে, সেই হৃদয়-গৃহে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনব্যাপী ভালবাসায় নিত্য আরাধনা করিব এই আশায় বুক বাঁধিয়া যেই দাঁড়াইলাম অমনি চারিদিক্ শূন্য হইয়া গেল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমার অধিষ্ঠানে যে হৃদয়-মন্দির অমর শোভায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সুখের বসন্ত সমাগমে নবীন পত্র পুষ্পে কোকিলের কুহুতানে যাহাকে শোভার নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছিলে, স্নেহের ঐক্যতানে সরস্বতীর বীণাবাদ্যে এবং বালক অতিথির আগমনে যাহাকে মিলন সুখের পূর্ণতায় এক অভিনব রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলে তাহা এক দিনের শোকাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল, সে শান্তিরাজ্যের গৃহ-প্রাচীর ভগ্ন, পুষ্পকানন কন্টক বৃক্ষে সমাকীর্ণ, স্নিগ্ধ জলাশয় বিশুষ্ক, এবং গৃহসজ্জা অর্দ্ধদগ্ধ ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। সে শোকাবহ জীবন্ত দৃশ্য কল্পনা করিতেও পারা যায় না। পার্থিব ভস্মরাশি, গৃহীর তৈজস পত্র, সব ভবসাগরের জলে ভাসাইয়া দগ্ধপ্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য আর কিছুই নাই, নৈরাশ্যের ক্রন্দন হাহাকারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে জীবন সৈকতের কূল কিনারা দেখিতে পাই না, সবই—অতল জল।

চির হতভাগ্য-দরিদ্র আমরা, তোমার মতন অমূল্য রত্ন বক্ষে, কণ্ঠে ধারণ করিয়া অসীম অনন্ত মায়ায় জড়ীভূত হইয়া অনিশ্চিত অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। উজ্জ্বল সেই দুর্ল্লভ রত্নকণা আরো উজ্জ্বলতর করিতে দুরাশায় যেই কণ্ঠচ্যুত করিলাম অমনি প্রাণের সর্ব্বস্বধন অপার্থিব মাণিক্য অন্ধকারে হারাইয়া গেল। এখন বৈতরণীর পারের কড়িও নাই, খেয়াঘাটের জলা ভূমিতে প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, যদি বিশ্বরাজ্যের পাটনী দয়া করিয়া বিনাসম্বলে পরপারে লইয়া যায় এই আশা।

"রজনী প্রভাত হলো জাগিল জীব সকল,
এ গৃহে আর জাগিবে না তব মুখ নিরমল।"

(৩)

গভীর দুঃখের তমিস্রা রাত্রির আঁধাররাশি যেই অশ্রুজলে কাটিয়া যায়, প্রভাতের সূর্য্যকিরণ যখন আবার পূর্ব্বদিকে প্রকাশ পায়, এবং জীবজগতের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া চারিদিকে যেই নবজীবনের সঞ্চার হয়, তখনি তোমার বিরহবেদনায় প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠে, জীবন গৃহের বন্ধ দুয়ারে বৈতালিক শিশু তুমি, সুধাকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া শোকমগ্ন চিত্তকে জাগাইয়া দেও না, সব নিস্তব্ধ-নীরব, যে শূন্যতা সেই শূন্যতা, রাত্রি, দিন, প্রভাত এবং সন্ধ্যা সমান, কোন পরিবর্ত্তন নাই। কার্য্যক্ষেত্র মরুভূমি, চিন্তা, ভাবনা, ভয় অন্তর্হিত। তোমারই কার্য্য, তোমারই চিন্তা, তোমারই প্রতীক্ষায় যে জীবন পরিপূর্ণ ছিল, তাহার অস্তিত্ব আজ কোথায়? এক মাত্র আশ্রয় কল্পতরু, যাহার স্নেহছায়াতলে বসিয়া এক যুগ অতিবাহিত করিয়াছি, আজ তাহার স্মৃতি লইয়া বাঁচিয়া

থাকিবার ক্ষমতা কৈ ? এ জীবন এখন ব্যর্থ। যে জীবনের চিন্তা, কার্য্য ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সে কি জীবন ? যে তোমাকে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের অন্তরাল করিবার সামর্থ্য ছিল না, সতত চক্ষে চক্ষে রাখিয়া ভয় ভাবনা ঘুচিত না, সেই তোমাকে কোন সাহসে দুরাশায় বুক বাঁধিয়া দূর প্রবাসে আচার্য্য গৃহে রাখিতে যাইয়া একেবারে চিরদিনের মতন হারাইয়া ফেলিয়াছি। অজ্ঞাত এক পক্ষের যবনিকার অন্তরালে যে ভীষণ করাল কাল লুক্কাইত ছিল তাহার ভবিষ্যৎ ছায়াও কল্পনায় কি স্বপ্নে দেখিতে পাই নাই। শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া তোমাকে উচ্চ শিক্ষার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরে যেই প্রতিষ্ঠিত করিলাম, অমনি তোমার গুণ-গরিমা-মুগ্ধ সহপাঠীরা এবং আচার্য্যগণ তোমাকে উচ্চতর আসন দান করিয়া তোমার কীর্ত্তিমান শিরে খ্যাতির জয় মাল্য বাঁধিয়া দিলেন ও তাহা দেখিয়া ক্ষণিক-বিচ্ছেদ-ভয়-কাতর-চিত্তে বল সংগ্রহ করিবার যেই প্রয়াস পাইলাম, তখনি অমনি শুভযাত্রা চির অমঙ্গলের নিবিড় ছায়াপাতে অন্ধকার হইয়া গেল, পৃথিবীর সর্ব্বস্বসার, জীবনের মূলাধার এবং মুক্তি পথের সোপান, সমুদায় হারাইয়া এক্ষণে বজ্রাহত দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় বৃথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।

* * *

"ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপ দগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।"

(৪)

শৈশব জীবনের উচ্চ আশা, অদম্য উৎসাহ ও কৈশোরের অর্দ্ধ বিকশিত প্রেমফুল্ল সুখাভিলাষ, যৌবন বসন্তের প্রথম উন্মেষনেই নৈরাশ্যের শূন্যতায় ঝরিয়া গিয়াছে। সে শূন্যতা সে খালি খালি ভাব আর কাহারো স্নেহে পরিপূর্ণ করে নাই, সবই ছিল আবার অপূর্ণতায় হৃদয়ে স্নেহ মমতার, কোন ভাবেরই বিকাশ ছিল না।

বহু বর্ষ পরে সহসা কোন মায়ারাজ্য হইতে শিশুরূপী তুমি আসিয়া সেই বিশুষ্ক হৃদয়ে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলে, তোমার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নবীন রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, ভালবাসায় চিত্ত ভরিয়া গেল, বালকণ্ঠের মধুর কাকলী ধ্বনিতে চারিদিক জাগ্রত হইয়া শব্দ শোভায় এবং স্পর্শে দিক্ মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল, শাপগ্রস্ত জীবন, স্নেহ মন্দাকিনীর পুণ্য সলিলে বিধৌত করিয়া আত্মত্যাগ শিখাইলে। আত্মহারা হইয়া তোমাকে প্রাণের নিভৃত দেশে অনন্ত অসীম স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার উচ্ছ্বাসে তোমাকেই মূর্ত্তিমান দেবতা করিয়া একেবারে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলাম ! এ জগত দুর্ল্লভ ভালবাসার সর্ব্বত্যাগী পূজার কি ত্রুটি হইল, যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ খালি করিয়া জীবনের সুখ, শান্তি, আশা, ভরসা, হর্ষ, বিষাদ, যাহা লইয়া একখানি ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব মিলনরাজ্য চিত্র করিয়াছিলাম তাহা অকালে ও অসময়ে ঘোরতর শোকের হাহাকারে আচ্ছন্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিলে ! চক্ষের পলকে নিমিষ মধ্যে নিদারুণ শোক, প্রলয়ের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যাবৎ কাল বৈশাখীর মতন আসিয়া সব কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল ! বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম কেবল আমরা,—

আজ, "গৃহহীন পান্থশালে
কাটে দিন গোলমালে
বিভবের শূন্য গরিমায়,
অশ্রুভরা হাসি মুখে

যন্ত্রণা অনল বুকে
ক্লান্ত নিতি মুক্তি ভাবনায়।"

"ধ্রুব-তারা, বন্দ্যো তারা
সবাকার বন্ধু তারা,
অন্ধকারে পথহারা
একতারা বিনে।"

(৫)

জীবন মহাসিন্ধুর পরপারে যাইবার জন্য যে ধ্রুব নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী আশায় উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সুখের তরণীখানি ভব সাগরে ভাসাইয়াছিলাম তাহা কূলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ কোথায় হইতে শোক-নৈরাশ্যের গাঢ় কাল মেঘ আসিয়া ভাগ্য-গগনের সেই সমুজ্জ্বল দীপ্তিময় ধ্রুবতারা গ্রাস করিয়া ফেলিল ও দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনতরী অদ্য ঘাটে ঘাটে ফিরিতেছে। চিরকৃষ্ণপক্ষের নৈশ অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তীরভূমি খুঁজিয়া পায় না। এ অকূলের কূল কিনারা আর ইহজীবনে নাই।

* * *

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে,
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি।"

(৬)

দীন হীন আমরা, সেই মহাতীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার ক্ষমতা নাই, শোক তাপে জর্জ্জরিত মন, রোগজ্বালায় ভগ্নশরীর এবং সর্ব্বার্থসার শূন্য কি করিয়া অজানিত মুক্তিপথ খুঁজিয়া পাইব ? ধনীর সঙ্গ ধরিয়া গরিব যেমন দূর দূরান্তরে তীর্থ দর্শনে পদব্রজেই চলিয়া যায়, জন্ম জন্মান্তরের দুষ্কৃতি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ইহলোকের দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া পরলোকে মোক্ষলাভ করিবে এই বিশ্বাসে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে, তেমনি হে স্নেহরাজ্যের রাজ-রাজেশ্বর তুমি, শোকাতুর আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া চির মুক্তির নির্ব্বাণতীর্থে লইয়া যাও। যেখানে আমাদের, বিশেষতঃ আমারই আগে যাইবার কথা ও যেখানে পূর্ব্বে যাইয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব, হৃদয়বীণা ললিত ভৈরবী রাগিণীতে প্রভাত সঙ্গীত গাইয়া সুখনিদ্রামগ্ন প্রাণে নূতন দিবস সঞ্চারিত করিবে, প্রদোষের পূরব তানে সান্ধ্য সঙ্গীতের মধুরিমায় দশ দিক্ গোধূলি রাগে রঞ্জিত হইয়া যাইবে।

আনন্দ উচ্ছ্বাসে সম্মিলন কামনায় যুগ যুগান্তর অতিবাহিত করিয়া এই প্রাণভরা অসীম ভালবাসা অমরতা প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মা পরম মোক্ষলাভ করিবে। এ দুর্দ্দিন জীবনে কেন আসিল, এ অবিচার কে করিল ? ইহ জীবনের মূলাধার, মুক্তির পথ প্রদর্শক, আজ আত্মহারা আমরা, তোমার কোমল ক্ষুদ্র পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে সংসার মরুক্ষেত্রের মধ্যপথে বসিয়া পড়িয়াছি, দিক্‌ভ্রান্ত পথিকদ্বয়কে—তোমার "বরাভয়প্রদ" দৃঢ় হস্ত প্রসারিত করিয়া শান্তির অমর ধাম দেখাইয়া দেও।

* * *

"ডাকিছেন মাতা "নিমাই, নিমাই,"
প্রতিধ্বনি বলে নাই আর নাই।"

(৭)

শোকমগ্ন নির্জ্জন প্রাণের নিভৃতদেশ হইতে রাত্রিদিন কেবল মর্ম্মভেদী "নাই নাই" ধ্বনি অবিশ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া হৃদয়ের চতুর্দ্দিকে দাবানল জ্বালিয়া দিয়াছে, আজ নহে কাল নহে দীর্ঘবৎসর জ্বলিয়া পুড়িয়াও এ অগ্নির নির্ব্বাণ এ জীবনে আর সম্ভবে না, শ্মশান সৈকতে জাহ্নবী সলিলে যদি কখন জুড়াইয়া দেয়, এখন ত এমনি পুড়িব। শূন্যময় সংসারে শোকবিহ্বল প্রাণে ডাকিয়া ডাকিয়া সুধুই কেবল শুনিব "নাই, নাই," বেদনা কাতর দিনের মধ্যে একবারও "আছি" উত্তরে এ হুতাশন নিবিয়া যাইবে না! কি অপরাধে এ শাপ ভগবান?

অনাদি কাল হইতে যে সত্য অবলম্বন করিয়া মনুষ্য ভগবৎ দর্শনেরও অধিকারী, সেই একমাত্র সার সত্যের অভাবে, "শস্য শ্যামলা" ধরিত্রী মাতার অস্তিত্বও নাই, সচৈতন্য জীবরাজ্য চক্ষের সম্মুখে "নাই" হইয়া গিয়াছে, "আছি" মিছা হতভাগ্য আমরা!

* * *

কিমাশ্চর্য্য মত পরং।
"কি আশ্চর্য্য হায়।"

(৮)

আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি যে পৃথিবীতে সাতটি ("Wonder") অতি আশ্চর্য্যজনক সামগ্রী আছে এবং যাহার বর্ণনা ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় চিরকাল এইরূপ রহিয়া যাইবে। তুমি আমি যাহা পড়িয়াছি তাহাই আবার আমাদিগের পরবর্ত্তী বংশধরগণও পড়িবে, কিন্তু আমাদের এই জীবন ইতিহাসের দারুণ শোকাবহ ঘটনার এক বর্ণও ভাবীকালের কেহ জানিয়া মর্ম্মাহত হইবে না। আজি যাহারা এ অভাবনীয় দুর্ঘটনার জীবন্ত শোকের দৃশ্যে ব্যথিত, তাহারাও ভবিষ্যতে সকল বিস্মৃত হইয়া যাইবে, দৈনিক জীবনের সঙ্গে এ দুর্দ্দিনের স্মৃতি বহন করিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাতও করিবে না। সেই সুকুমার হাস্যদীপ্ত বাঞ্ছিত মুখশোভা কাল স্রোতে ভাসাইয়া দিবে, স্মরণ করিয়া রাখিবার কেহ থাকিবে না। এই বুক-ভরা অসীম দুঃখভার শূন্য মনে বহন করিয়া আমরাই কেবল শাস্তি স্বরূপ জীবিত থাকিব।

মৃত্যুর করাল কুটিল ছায়াপাতে জীবন যখন একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল তখন কেন মরিলাম না, এখনও কেন বাঁচিয়া রহিলাম? এ জীবন রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি নাই! নররূপী ভগবান, শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যাও মোক্ষলাভ করিয়াছে, আর কি অভিসম্পাতে পরিত্যক্ত আমরা এই গুরুতর শোকের শাস্তি ভোগ করিবার জন্য তোমার পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলাম?

* * *

"সাধনায় সিদ্ধ নাই
মানব অদৃষ্টে তাই
আমরণ বাসনা নিষ্ফল।"

(৯)

দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নর নারী আরোগ্য কামনায় দেবতার দুয়ারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, রাত্রি নাই, দিন নাই, অনাহার অনিদ্রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে, তখনই দেবাদেশ প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাইয়া অভীষ্ট মনোরথ হইয়া আবার গৃহপ্রত্যাগত হয়। আমরাও তেমনি,

হে দেবাদিদেব! তোমার বিশ্বদ্বারে বর্ষার বৃষ্টিধারা—হেমন্তের শিশিরপাত—উপেক্ষা করিয়া অশ্রুসিক্ত আর্দ্রবস্ত্রে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছি। কৈ, এ পর্য্যন্ত কোন আদেশ ত শুনিতে পাইলাম না? দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ দিন এক ভাবেই কাটিয়া গেল, দুঃখ বার্দ্ধক্যের জরা আসিয়া ধরিল, তথাপি তোমার শান্তিমন্দিরের দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে তাহার মধ্যে ডাকিয়া লইলে না? জীবন এক্ষণে উপায়হীন। যুগ যুগান্তর ধরিয়া কেমন করিয়া এমনি হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিব? পার্থিব ধরণীর সুখ সম্পদ ধন ধান্য কিছুরই আর প্রার্থী নহি, কেবলমাত্র তোমার মুক্তি আজ্ঞার প্রতীক্ষায় ঊর্দ্ধ মুখে যুক্ত করে বসিয়া আছি।

*　　*　　*

"শত শত নরনারী দাঁড়াইয়া সারি সারি
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখ খানি?
হেরে হারানিধি পায়
না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি?"

(১০)

প্রতিদিন অসংখ্য জনস্রোতের ভিতর দিয়া কত শত নরনারীর সরল সুন্দর মুখচ্ছবি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে কে তাহা গণনা করিয়া স্মরণ রাখে? জীবনে সেই একখানি আরাধ্য মুখ ভিন্ন দুইখানির চিহ্ন দেখিতে পাই না। স্মৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে সেই কোমল সুকুমার প্রতিভাময় মুখখানি অঙ্কিত রহিয়াছে, যাহার তুলনা এ সংসারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"ওরে প্রিয় ফুল তুলনা ত নাই,
কি তুলনা দিব, মিছা কি বলিব,
অতুলনা তুমি বলেছে সবাই।"

প্রাণের অনুভব শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর সুখ দুঃখে হৃদয় চৈতন্যহীন, এই বিশাল ধরণীর বক্ষ খালি করিয়া কবে কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে তাহা একবার মনেও হয় না, অন্যের দুঃখে এ শোকের তিলমাত্র ব্যতিক্রম করে না। সেই তপ্ত অশ্রু, সেই শূন্যতা, সেই নীরব হাহাকার, সমান ভাবে রহিয়া যায়, আত্মবিস্মৃতি সম্ভবে না!

*　　*　　*

'লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া জুড়াব না গেল,
প্রাণ জুড়াইতে লাখে লাখে
না মিলিল এক।"

(১১)

জীবনের এ মহাশূন্যতা পূর্ণ করিতে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য জনপদরাশি, প্রকৃতির শোভার অক্ষয় ভাণ্ডার, তাহাতে যদি ভরিয়া দেই এই সর্ব্বগ্রাসী শোকে সব গ্রাস করিয়া ফেলিবে, সেখানে কিছুই আর তিষ্ঠিতে পারে না। শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, সবই অসীম শূন্যে মিশাইয়া আবার যে শোকের হায়, হায়, নৈরাশ্যের ক্রন্দনধ্বনি সেই প্রকারই রহিয়া যাইবে, কোন পরিবর্ত্তন আসিবে না। জীবনের খেলাঘরে ধূলি-কর্দ্দম-লিপ্ত হৃতসর্ব্বস্ব আমাদের কিন্তু এইরূপ দীর্ঘ দিবস

বৃথায় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিলেও এ খালি বক্ষের মহাশূন্যতা ইহকালে কাহাতেও আর পরিপূর্ণ হইবে না।

* * *

"মন আমার হরি বল্ হরি বল্
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল্।"

(১২)

জীবনাকাশের সুখ সৌভাগ্যের গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, আলোক ও অন্ধকার সহ সব ছায়াপথে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সমুদয় স্তম্ভিত নিস্তব্ধতা ও অভেদ্য গাঢ়তর অন্ধকার। হৃদয় নির্ব্বাক, বেদনা প্রকাশের ভাষাহীন। কথা ফুরাইয়াছে অশ্রু শুকাইয়াছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল গত স্মৃতি ও অদ্যকার শোকাচ্ছন্ন নীরব শূন্যতা। প্রাণের সেই গৃহ-দেবতার অদর্শনে ব্রহ্মাণ্ড দেবের নামও যেন ভুলিয়া যাইতেছি ; ইহলোকে এ দুঃখের শেষ ও পরিত্রাণের উপায় নাই। আবার লোকান্তরে এক হইবার জন্য হে মোহভ্রান্ত মন, নূতন করিয়া নাম সাধনা করো, এ দুর্দ্দিন ঘুচিয়া যাইবে, এ আমি রহিব না, সেই তুমিত্বে সম্মিলিত হইয়া এ শোক জ্বালা, দুঃখ দৈন্য ভুলিয়া অবিচ্ছেদ, আনন্দে "হরি হরি" বলিব।

(১)

জগতে প্রথম আমি হইনু জননী,
তোমারে লইয়া কোলে ওরে তারামণি,
স্নেহনীরে ভিজে গেল সমগ্র হৃদয়,
শুষ্ক বক্ষ শতধারে স্তন্য দুগ্ধময়,
জীবনের ভাল বাঁসা মুক্ত করি হিয়া
সর্ব্বস্ব দিয়াছি তোরে কিছু না রাখিয়া,
আজি সেই মুগ্ধ মায়া আধার বিহনে
ফিরিছে বিশ্বের দ্বারে করুণ ক্রন্দনে,
অনন্ত স্নেহের সুধা পান করাইয়া
পারিনি রাখিতে তোরে সসীমে ধরিয়া,
তোমা-হারা ব্রহ্মাণ্ডের সব অন্ধকার
ধরণীর মানচিত্রে প্রাণ নাহি আর।

(২)

প্রভাত অরুণরাগে মঙ্গল বারতা
বহিয়া আনিল লিপি, জীবনের কথা
পূর্ণ করি হস্তাক্ষরে নিকটে দোঁহার,
প্রদোষে সহসা প্রাণে শোক হাহাকার
উঠিল ক্রন্দন রোলে, দিগন্ত ছাইয়া
পড়িল মৃত্যুর ছায়া সর্ব্বস্ব গ্রাসিয়া,
জীবন আছাড়ি প'ল মরণের পায়
আত্মপ্রাণ বিনিময়ে ফিরাতে তোমায়,

বিশ্বনাথ যাচকের ভিক্ষা পূর্ণ করি
দিল না জীবন দান, সব নিল হরি,
দুঃখ দৈন্যে ভরি দিয়া ভিখারী-হৃদয়
চিরতরে সর্ব্বস্বান্ত করি দু'জনায়।

(৩)

তুমিই দিয়াছ সুখ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া,
তুমি বাসিয়াছ ভাল আশা পূরাইয়া,
তুমি দেখাইলে বিশ্ব অপূর্ব্ব লীলায়,
তুমি বিভাসিলে চিত্ত জ্ঞানগরিমায়,
তুমি অন্ধকার প্রাণে তারকা উজ্জ্বল,
তুমি জীবনের চির শান্তি সুমঙ্গল,
তুমি আনন্দের উৎস হাস্যমধুরিমা,
তুমি ধরণীর অঙ্গে বাড়ালে সুষমা,
এক তুমি বহুরূপে নিত্যই নূতন,
এক পুত্রে শত পুত্র জীবন ভূষণ,
অনন্ত মহান্ তুমি, বিচিত্র আকারে
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ অসীম মাঝারে।

(৪)

জগতের যাহা কিছু সকলি তোমার,
পরিপূর্ণ করি দিয়া হৃদয় ভাণ্ডার,
হেলায় খেলায় পুনঃ সব কাড়ি নিয়া
প্রতিদানে শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে দিয়া,
তুলিয়া রোদন ধ্বনি শোক হাহাকার
অতীত সুখের চিত্র রাখিলে না আর,
অকস্মাৎ মায়াপুরী ভাঙ্গিয়া পড়িল
পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন কিছু না রহিল.
ধূলায় মিশিয়া গেল ধূলির সংসার
বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ করি একাকার,
জীবনের সুধাসার করিয়া শোষণ
মৃত্যুঞ্জয় হয়ে বিশ্বে রহিনু এখন।

(৫)

স্নেহ প্রীতি ভালবাসা অসীম অপার
বরষ বরষ ধরি হৃদয় মাঝার
কৃপণের ধন সম অতি সঙ্গোপনে
রাখিয়াছিলাম সুধু পরম যতনে,
এক বিন্দু তার তরে নাহি করি ব্যয়,
কেবল তোমার লাগি করিয়া সঞ্চয়,

সুকুমার দুইখানি শিশু হস্ত ভরে,
ঢালিয়া দিয়াছি নিত্য সব খালি করে,
তোমার সুখের চিন্তা কল্যাণ কামনা,
নিখিলের সর্ব্বময় চির আরাধনা,
দ্বাদশ বরষ ব্যাপী কঠোর সাধনে,
পরিতুষ্ট করিবারে মায়ার বাঁধনে।

(৬)

মূর্ত্তিমান গৃহদেব, হৃদি রাজ্যেশ্বর,
তরুণ প্রতিভা দীপ্ত সুঠাম সুন্দর,
স্থাপিয়া মঙ্গল ঘট প্রাণের দুয়ারে—
প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমা আশার মন্দিরে,
ধূপ দীপ গন্ধমাল্য প্রেম-অনুরাগ,
হৃদয়ের হৃদয়েতে মমতা সোহাগ,
যা ছিল সকলি দিয়া তোমার পূজায়,
সমাহিত করি চিত্ত ধ্যান ধারণায়,
ভুলিয়া ঈশ্বর নাম, তোমাকেই সার
করিয়াছিলাম, তাই জীবন আমার
বিফল হইয়া গেল বিয়োগ আঁধারে,
তুমিও ভাসায়ে দিলে অশ্রু পারাবারে।

(৭)

সখা বন্ধু, প্রিয়তম, প্রাণাধিক সুত,
একাধারে, তব স্পর্শে হইয়াছে পূত—
এ ছার মানব জন্ম, আত্মপরজ্ঞান
তিরোহিত করিয়াছ, শিক্ষক মহান্
হৃদয় আছিল লুপ্ত অন্তর-বাহিনী,
শতধারে খুলি দিলে প্রেম মন্দাকিনী,
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে স্নেহের জোয়ার,
ছুটিল তোমারি পানে, বেগ অনিবার,
জগতের পরিত্যক্ত অনাথ আতুরে
তুমি শিখাইলে, স্নেহ ভাগিরথী নীরে
শীতল করিতে, আর্জি করুণায় হিয়া
পবিত্র করিলে, প্রেম-জাহ্নবী আনিয়া।

(৮)

ভুলিতে পারি না কভু, চাহি না ভুলিতে,
জীবনের সুখ দুঃখ সব যাহা হতে,
তাহাকে ভুলিতে বলে নিষ্ঠুর সংসার ?
এ পাপ সান্ত্বনা, কর্ণে শুনিব না আর,

জপিব তাহারি নাম ইষ্টমন্ত্র সম,
অতীত সুখের স্মৃতি জাগাইবে মম
মর্ম্মে মর্ম্মে সেই নাম, যে নামের সনে
পরিপূর্ণ সুখ শান্তি, উৎসব মিলনে,
আদি হীন, অন্ত হীন, ভাষা হীন, বাণী
সে সুখের স্মৃতি, মেঘমল্লার রাগিণী,
ঝঙ্কারিবে নিরন্তর বিরহ-কাতরে
হৃদয় প্লাবিত করি অশ্রুবারি ধারে।

(৯)

একটী পরব দিন আছিল জীবনে,
আশা পথ তাকাইয়া তাহারি কারণে
থাকিতাম, বর্ষ অন্তে আসিত যখন,
বিবাহ উৎসবে তারে করিয়া বরণ
লইতাম, নব বস্ত্র, নব অলঙ্কারে,
বরবেশে সুসজ্জিত করিয়া তাহারে
আবাহন করিয়াছি, চির অভিনব—
ছিল সুখ-পর্ব্ব এক, জন্মদিন তব,
ব্রতকথা উপন্যাস সেদিন এখন,
ফুরাইছে ইহ জন্মে সুখের-বোধন।
বরষ বয়ষ পরে আসিবে না আর
আশ্বিনী "জনম তিথি" গৃহেতে আমার।

(১০)

খেয়াঘাটে বসে আছি, জন কোলাহল
থামিয়া গিয়াছে, নাহি পথের সম্বল—
পরপারে যাইবার, জীবন-তরণী
অসময়ে খুলি গেছে, কেমনে না জানি,
ঘনাইয়া আসিয়াছে সন্ধ্যার আঁধার,
এ দুঃখ সাগরে আর নাহি পারাপার,
গর্জ্জিতেছে শিরপরে শোকের অশনি,
প্রলয়ের কালো মেঘে আচ্ছন্ন ধরণী,
বিপন্ন পথিক, আঁখি পথের ধূলায়
দৃষ্টিহীন হইয়াছে, মহা শূন্যতায়
হারায়ে গিয়াছি বিশ্ব, কোন দিক্ দিয়া
পারে চলে যাব পথ পাই না খুঁজিয়া।

(১১)

এত স্নেহ ভালবাসা, শেষ নাহি যার
সে কি শুধু ক্ষণতরে, দু'দিনে আবার

ফুরাইবে ইহলোকে, লোকান্তর নাই ?
এ ভুল হৃদয়ে কভু নাহি দিব ঠাঁই,
ভালবাসা অবিনাশী আত্মার মতন
বিচ্ছেদ মুছিতে তারে পারে না কখন,
দূরতায় বাড়ি যাবে অন্তরের টান,
রাখিতে নারিবে এই দীর্ঘ ব্যবধান,
বিয়োগে সংযোগ পুনঃ আনিবে আপনি,
অফুরন্ত বিলাপের রোদন কাহিনী
ব্যথিত করিবে তোমা, অচিরে তখন
ডাকিয়া লইবে কাছে, চির সম্মিলন।

(১২)

নাহি ভূত ভবিষ্যত, নাহি বর্ত্তমান,
নাহি সুখ, নাহি দুঃখ, ব্রহ্মাণ্ড নির্ব্বাণ,
নাহি প্রতীক্ষার দিবা, মিলনের রাতি,
নাহি হৃদয়ের প্রান্তে জীবনের ভাতি,
নাহি তন্দ্রা, নাহি সুপ্তি, নাহি জাগরণ,
নাহি বিশ্ব-জনপদে ক্ষণিক সান্ত্বন,
নাহি বলিবার কথা সমাপিত সব
নাহি শুনিবার কেহ, নিরাকার ভব,
নাহি বিধাতার সেই অপার্থিব দান,
নাহি আমি, নাহি তুমি, সার ভগবান,
রহিবে না এ দুর্দ্দিন, বিধানে তাঁহার,
স্বর্গ-মর্ত্ত্যে আলিঙ্গন হইবে আবার।

* * *

পরিশিষ্ট 'খ'

স্মরণিকা

প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যুর পর সমকালীন পত্রপত্রিকায় তাঁর স্মরণে কিছু লেখা প্রকাশ করা হয়। তেমনই দুটি লেখা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

Srimati Priyambada Devi

Srimati Priyambada Devi, the Bengali poetess, who died last month in Calcutta at the age of 63, was a niece of the late Sir Ashutosh Chaudhuri. Her mother is still alive. Srimati Priyambada Devi was a contributor to the leading Bengali monthlies and was connected with some women's organizations. She was the author of a book of poems named *Dhara* and of *Anath*, a novel.

The Modern Review, March 1935, p. 390.

প্রিয়ম্বদা দেবী

পরিণত বয়সে কবি প্রিয়ম্বদা দেবী পরলোকগতা হইয়াছেন। ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখন বাঙ্গালায় নূতন পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি পরলোকগত সার আশুতোষ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী এবং সাহিত্য-সেবার জন্য সুপরিচিত শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী প্রসন্নময়ী পিতার যত্নে শিক্ষালাভ করেন ও তাঁহার কবিতা-সংগ্রহ 'বনলতা' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালী মহিলার সেইরূপ রচনা দুর্লভ ছিল। প্রিয়ম্বদার পিতার নাম কৃষ্ণকমল বাগচী। তিনি জ্ঞানার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পাবনা জিলার গুণাইগাছা গ্রামে প্রিয়ম্বদার জন্ম হয় এবং তিনি কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে থাকিয়া স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয় হইতে শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় বেথুন কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারজীবি তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র তারাকুমারের জন্ম হয় এবং পর বৎসর তারাদাসের মৃত্যু হয়। প্রিয়ম্বদা তখন পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় মাতার নিকটে ফিরিয়া আইসেন এবং মাতাপুত্রী তারাকুমারকে স্নেহের অবলম্বন করিয়া তাহাকে লালনপালন করিতে থাকেন। তারাকুমারকে বিদ্যালাভার্থ বারাণসী হিন্দু বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে

সহসা তাহার মৃত্যু হয়। সংসারে প্রিয়ম্বদার বন্ধন ছিন্ন হইবার পর তিনি সাহিত্য-সেবায় ও জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর কাষ আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন সোৎসাহে সেই কাষ করিয়া শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাহা ত্যাগ করেন। তাহার পর, সুস্থ হইয়া, তিনি কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল নামক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া উহার উন্নতি সাধন করেন। শেষে তিনি হিরন্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত বিধবা শিল্পাশ্রমের সম্পাদিকা হইয়া তাহার নানারূপ উন্নতিসাধন করেন ও অভাগিনীদের জন্য শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরীর যত্নে "গোবিন্দকুমার হোম" প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী "সাতুবাবুর" পাণিহাটিস্থ উদ্যানগৃহ গোপালদাস বাবুর হস্তগত হইয়াছিল। তিনি উহা ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করিয়াছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীর রচিত পুস্তকগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) কবিতা— 'রেণু', 'পত্রলেখা', 'অংশু' ; (২) শিশুপাঠ্য— 'অনাথ', 'পঞ্চুলাল', 'কথা উপকথা' ; (৩) ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়— 'ভক্তবাণী'।

তাঁহার রচনায় সংযত ও পবিত্র ভাবের বিকাশ সপ্রকাশ, নানা মাসিক-পত্রে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত।

শোকে প্রিয়ম্বদার চিত্ত নির্ম্মল ও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তিনি আপনাকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কয় বৎসর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল এবং তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এত দিনে মৃত্যু তাঁহাকে সকল শোক হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছে।

ব্যর্থ জীবনে মাতাপুত্রীর সম্বন্ধ যেরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহাতে কন্যার মৃত্যু যে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা জননী—শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর পক্ষে দুর্ব্বিষহ দুঃখের কারণ তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার এই শোক যে সান্ত্বনার অতীত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪১, পৃ ৬৩৮-৩৯